রামায়ণের রাজনীতি ও সমাজবীক্ষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
চন্দনা রাণী বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০

সেপ্টেম্বর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

রামায়ণের রাজনীতি ও সমাজবীক্ষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
চন্দনা রাণী বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০

সেপ্টেম্বর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, চন্দনা রাণী বিশ্বাস আমার তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে। তার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম রামায়ণের রাজনীতি ও সমাজবীক্ষণ। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে তার সুগভীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোনো অভিসন্দর্ভ প্রকাশিত হয়নি। অভিসন্দর্ভটি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাঙ্গনে একটি মুল্যবান সংযোজন হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়নকালে চন্দনাকে আমি ছাত্রী হিসেবে পেয়েছি, পরবর্তিকালে সহকর্মী। এখন আমার তত্ত্বাবধানে তার পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন হলো। এটা আমার জন্য আনন্দদায়ক। আমি চন্দনার কল্যাণ কামনা করি।

অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস
তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, অধ্যাপক ড. নারয়ণচন্দ্র বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে আমি আমার পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম রামায়ণের রাজনীতি ও সমাজবীক্ষণ। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোনো অভিসন্দর্ভ প্রকাশিত হয়নি । অভিসন্দর্ভটির কোনো অংশ আমি কোথাও প্রকাশ করিনি। আমি আমার বিচার-বুদ্ধি অনুসারে গবেষণকর্ম সম্পন্ন করেছি।

চন্দনা রাণী বিশ্বাস
গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমার গবেষণাকর্ম আরম্ভ করেছিলাম তার পূর্ণতাসাধন করতে পেরে আমি আনন্দিত। এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি আমার অভিসন্দর্ভের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে প্রথমে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাসের প্রতি। তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে আমি আমার পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ সম্পাদন করতে পেরেছি। তিনি আমার পিতৃতুল্য। তাঁর পিতৃসুলভ আচরণ ও সস্নেহ সান্নিধ্য আমার জীবনের মহান সম্পদ। পিতা-পুত্রীর সম্পর্কটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে আবদ্ধ নয়। আমি আমার আচার্যদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি– নমামি আচার্যদেবং নারায়ণচন্দ্রবিশ্বাসং বিদ্যালঙ্কারোপাধিধারিণম্। আমার আর একজন আচার্য অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিককে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। তিনিই প্রথম আমাকে রামায়ণ নিয়ে গবেষণা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর সতত আশীর্বাদ ও পরামর্শে আমি ঋদ্ধ হয়েছি। প্রণমামি তং মহান্তং ভারতীনন্দনম্। আমি সকৃতজ্ঞ স্মরণ করছি আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফয়েজুন্নেছা বেগম, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. মাধবী রাণী চন্দ ও অধ্যাপক ড. মালবিকা বিশ্বাসকে। অধ্যাপক ড. অসীম সরকারসহ আমার প্রত্যেক সহকর্মীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড.কানাইলাল রায়কে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমি উপকৃত হয়েছি। আমার নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক অগ্রজাতুল্যা ড. কল্পনা ভৌমিককে। তিনি অত্যধিক স্নেহ ও সযত্ন প্রয়াসে আমার গবেষণা কর্মে বিভিন্ন সময় সাহায্য করেছেন।

আমার মা শ্রীমতী লালমতি বিশ্বাস শৈশবে রামায়ণের গল্প শুনিয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতেন। তাঁর মুখে শোনা কাহিনি যেমন– তাড়কাবধ, রাবণের সীতাহরণ, সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি আমার শিশুমনে দৃশ্যমান হয়ে ধরা দিত। রামায়ণ নিয়ে গবেষণা করছি বলে তাঁর অশেষ আনন্দ। আমার অভিসন্দর্ভ এবং পিএইচ.ডি. দেখার প্রবল আগ্রহ তাঁর। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। তাঁর চরণযুগলে আমার প্রণাম। আমার বাবা স্বর্গত ভক্তদাস বিশ্বাস, তাঁরও প্রবল আগ্রহ ছিল আমার অভিসন্দর্ভ দেখার। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তিনি না দেখেই চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। রামায়ণের প্রতি তাঁর এত ভালোবাসা ছিল যে, তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে রামায়ণ গানের শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানাতেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা আসতেন। আমরা সবাই মিলে রামায়ণ গান শুনতাম। আমার গবেষণা কর্মের মধ্য দিয়ে আজ আমি আমার পিতৃদেবের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমার মাথার ওপর তাঁর কল্যাণ হাতের স্পর্শ সতত অনুভব করি। আমার স্বর্গতা অগ্রজা কল্যাণময়ী অনিতাদেবী, তিনি তাঁর সুললিত কণ্ঠে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তেন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তা শুনতাম। আজ তাঁকে আমি অনুভব করছি আমার সত্তায়। তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। আমার বড়দি শ্রীমতী রেণুকা বিশ্বাস এবং মেজদি শ্রীমতী কণিকা বালা বিশ্বাস আমাকে সব সময় উৎসাহিত করেছেন। মেজদি কণিকা প্রায়শ মুঠোফোনে তাঁর মধুর কণ্ঠে আমাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করে শোনান। আমার দিদি চন্দ্রিকা বিশ্বাস ও দাদা পিন্টু বিশ্বাস সব সময় আমার পাশে থেকে আমাকে উৎসাহ ও সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। এঁরা দুজনই কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। এঁদের কারণে আমি আমার অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটারে কম্পোজ করতে কখনও সমস্যায় পড়িনি। এঁদেরকে আমার প্রণাম জানাই।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুব্রত বিশ্বাস, তার স্ত্রী শ্রীমতী রিঙ্কু বিশ্বাস এবং তাদের পুত্র অনন্য সব সময় আমার গবেষণার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ওদের আমি আশীর্বাদ করি। আমার ভাগনে তাপস, নিত্যানন্দ ও মিল্টন এবং ভাগনী লাবণীর কাছ থেকে আমি উৎসাহ পেয়েছি। ওরা আমার স্নেহভাজন আশীর্ভাজন। আমার তিন ভাগনেবৌ কল্যাণীয়া পুতুল, রুমা ও বিচিত্রাকে স্মরণ করি তাদের আন্তরিকতার জন্য। আমার অনুজতুল্য বেণীমাধব মিস্ত্রী সব সময় আমার গবেষণাকর্মের কথা জানতে চেয়েছে। আমার এই ভাইকে আমি অনেক আশীর্বাদ করি। আমি বিশেষভাবে স্মরণ করি আমার ভাগনী শ্রাবন্তীকে। ও আমার প্রাণ। ও একাধারে আমার মা এবং মেয়ে দুই-ই। ও কাছে থাকলে আমার কোনো চিন্তা থাকে না। ওর সেবা ও সার্বিক সহযোগিতার কারণে আমার গবেষণাকর্ম অনেক সুগম হয়েছে। আমি ওকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করি। আমার ভাইঝি সেঁজুতি ও জামাতা হীরামনের কাছ থেকে অনেক সহায়তা পেয়েছি। এরা আমার গবেষণাকর্মে অনেক উৎসাহ দেখিয়েছে। ওদের দুজনকে আশীর্বাদ করি। আমার অতি আপন জন প্রিয়ভাজন শিক্ষকদম্পতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাখলু দাতুল আকমাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব এটিএম সামছুজ্জোহা আমাকে অনেক উৎসাহ দিয়েছে। আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে এই দম্পতির শুভ কামনা করি ।

আমার ভগিনীতুল্যা দুজন সহকর্মী টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের গোপা বিশ্বাস সীজার এবং মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের গৌরী মণ্ডলের কাছ থেকে অনেক অনুপ্রেরণা পেয়েছি। ওদের প্রতি আমার অশেষ ভালোবাসা রইল। আর একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি ডাক্তার চন্দ্রশেখর বালা। আমার শরীরটাকে সুস্থ রাখার পেছনে তাঁর অনেক অবদান। ডাক্তার হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু এখন তিনি আমার আপনজন হয়ে উঠেছেন। তিনি সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী। মানুষ হিসেবেও তিনি অসাধারণ। তাঁর মতো ভালো মানুষ আমি কম দেখেছি। আমার গবেষণাকর্মে তাঁর অনেক সাহায্য পেয়েছি। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত বিভাগের সেমিনার আমি বহু ব্যবহার করেছি। গ্রন্থাগার ও সেমিনারের সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে আমার অফিস সহকারীদের সহযোগিতাও আমি স্মরণ করি। জীবিত ও মৃত সকল গ্রন্থকর্তা, যাঁদের কাছে আমি অশেষ ঋণী, সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের ঋণ স্বীকার করি। অলমতিবিস্তরেণ।

চন্দনা রাণী বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়নপত্র	ii
ঘোষণাপত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv-v
ভূমিকা	১- ৬
প্রথমঅধ্যায় বাল্মীকির কাল ও পরচিতি	৭-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায় আদি মহাকাব্য রামায়ণ, প্রথম মানবিক কাব্য মহাকাব্যের সংজ্ঞা মহাকাব্য হিসেবে রামায়ণ অন্যান্য মহাকাব্য ও রামায়ণ রামায়ণ-মহাভারতের পৌর্বাপর্ব	১৪-৪১
তৃতীয় অধ্যায় রামায়ণের রাজনীতি	৪২-৯৫
চতুর্থ অধ্যায় রামায়ণের সমাজবীক্ষণ	৯৬-২২৯
উপসংহার	২৩০-২৪৩
গ্রন্থপঞ্জি	২৪৪-২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

রামায়ণ এক চিরন্তন এবং নন্দিত মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের ব্যাপ্তি আসমুদ্রহিমাচল। সমুদ্র পার হয়েও 'দেশে দেশে দিশে দিশে'ও ছড়িয়ে পড়েছে রামায়ণের অমর কথা। ভারতবর্ষের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষায় একাধিক অনুবাদ হয়েছে রামায়ণের। ভারতের বাইরে ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড), মালয়েশিয়া, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়াসহ ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পৌঁছে গেছে রামায়ণী কথা, বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে রামায়ণ। একটা সময় বৃহত্তর ভারতে গরিবের পর্ণকুটির থেকে ধনীর অট্টালিকায়, মুদির দোকান থেকে পণ্ডিতের ঘরে, টিনের ভাঙা তোরঙ্গ থেকে সুদৃশ্য রত্নখচিত আধারে, প্রান্তিক বর্গের ঘর থেকে দেবগৃহে সর্বত্র রক্ষিত হতো রামায়ণ। সর্বত্র এই অবস্থান থেকে বলা যায়, রামায়ণ পেয়েছে এক অশেষ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা। রামায়ণের এই উচ্চতা অন্য কোনো গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারে নি। এখানেই রামায়ণের শ্রেষ্ঠতা। রামায়ণকাহিনির এই আন্তরশক্তি, চিরন্তনতা, বহুমান্যতার কোনো তুলনা নেই।

বাংলাভাষায় যত রামায়ণ অনুবাদ হয়েছে তার মধ্যে কৃত্তিবাস অনূদিত রামায়ণ সর্বাগ্রগণ্য। এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে নিত্য পঠিত হতো রামায়ণ। দেবালয়ে, চণ্ডীমণ্ডপে, নাটমন্দিরে, বৃক্ষতলে, অলস অপরাহ্নে মহিলাদের আসরে রামায়ণ পঠিত হতো। ধর্মীয় কারণে, নৈতিকতাচর্চায়, চরিত্রগঠনে, উপদেশগ্রহণে, এমনকি চিত্তবিনোদনের জন্যও রামায়ণ পাঠ ছিল স্বাভাবিক এবং অবশ্যকৃত্য। গ্রামে গ্রামে হতো রামযাত্রা এবং শ্রাদ্ধবাসরে অথবা গ্রাম্যপূজাক্ষেত্রে হতো রামায়ণ গান। রামায়ণগান হতে এখনও দেখা যায়। রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে গায়ক চামর দুলিয়ে গান করেন। তাঁর সঙ্গে থাকেন কয়েকজন জুড়িদার ও বাদক। এক একটি ঘটনা বা কাহিনি নিয়ে প্রস্তুত ঐ গীতাংশ 'পালা' নামে অভিহিত। যেমন: রামের বিবাহ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ শক্তিশেল, রাবণবধ, মহিরাবণ বধ, পিতা-পুত্রের যুদ্ধ ইত্যাদি।

রামায়ণের কাহিনি মূলত পারিবারিক কাহিনি। একটি পরিবারের কাহিনিই ছড়িয়ে পড়েছে বৃহৎ পরিসরে। ফলে পরিবারের আদর্শ হিসেবে সমাজে এ কাহিনি বেশি চর্চিত ও আলোচিত হয়েছে এবং

এ কাহিনি পেয়েছে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা। পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি, বৌদি-দেবর, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি সম্পর্ক কেমন হবে তার আদর্শ রামায়ণ। একটি হিন্দু পরিবারে শৈশব-কৈশোরের মানসভুবন তৈরি হয় রামায়ণকাহিনি শুনে শুনে। রামায়ণের কথা শুনে একটি বালিকার পরবর্তী জীবনে সংসারচর্যার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়। বর্ষীয়সী কনীয়সীর মনে মস্তিষ্কে জাগ্রত করিয়ে দেন রামের মতো স্বামী, কৌসল্যার মতো শাশুড়ি, দশরথের মতো শ্বশুর এবং লক্ষ্মণের মতো দেবর প্রাপ্তির বাসনা। এবং সার্বিকভাবে শিখতে হয় রামের মতো আদর্শবান হতে হবে, কখনও রাবণের মতো দুষ্কৃতিকারী নয়।

শৈশবে মা-বাবার কোলে বসে রামায়ণের কথা শুনেছি। আমার মা রামায়ণের গল্প করে আমাকে ঘুম পাড়াতেন। আমাদের বাড়িতে রামায়ণ গানের আসর বসত। গ্রামে রামযাত্রাও দেখেছি। হনুমানের অসাধারণ শক্তি, যেমন লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হওয়া কিংবা গন্ধমাদন পর্বত তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা জেনেছি। বিশেষত রামকে জেনেছি অবতার পুরুষ ও ভগবান হিসেবে। সেই সময়ে কোনো কিছু অবাস্তব বা অবিশ্বাস্য মনে হয় নি। শিশুমনে রামায়ণকথা নিয়ে কল্পনা-বাস্তবের দোলাচলে তৈরি হয়েছে এক অপূর্ব ভুবন। ধীরে ধীরে বড় হলাম। কলেজে বাংলা পাঠ্য হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের কিয়দংশ পড়লাম। প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে পড়লাম মেঘনাদবধ কাব্যের সম্পূর্ণাংশ। রামায়ণগায়ক এবং তার জুড়িদারদের কাছ থেকে বহুশ্রুত কর্ণপ্রবিষ্ট 'রাম জয় রাম জয় হে' ধ্বনিটি একটু ভিন্নভাবে আলোড়ন তুলল। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' পড়ে শূর্পণখার দিকে অন্যভাবে তাকালাম। এরপর ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে। পাঠ্যবই হিসেবে পড়লাম ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্'। একজন অসীম শক্তিমান, সর্বোত্তম মানুষ, দেবোপম ভগবত্তুল্য মানবের কর্তব্যের সংঘাতে অসহায়ত্ব অনুভব করে বেদনায় দীর্ণ হলাম। শ্রেণিকক্ষে আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাসের রামায়ণ নিয়ে আলোচনা শুনলাম। বহুদিনের, সেই শৈশব থেকে ভাবনায় রামায়ণবোধে এক নতুন দিকের উন্মোচন হলো। রামায়ণ যে একটি মানবিক কাহিনি, রামের দৈবীসত্তা থেকে মানবিক সত্তা যে অধিকতর তা বিশেষভাবে অনুভব করলাম। আরও বহুবিধ নব ভাবনার সঞ্চারণ হলো। তারপর একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সার্থক হলো আমার স্বপ্ন কল্পনা। এক সময়ে সংস্কৃতের

সিলেবাসের সঙ্গে সংযুক্ত রামায়ণের পাঠদানের সুযোগ পেলাম। চতুর্থ বর্ষ বি.এ সম্মান শ্রেণির সপ্তম সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের পাঠকক্ষে পাঠদান শুরু করলাম। মূল রামায়ণ পড়তে এবং পড়াতে গিয়ে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জ্ঞাত হলাম। প্রয়োজনে, সঙ্গত কারণে অনেক মহাজনের রামায়ণসংশ্লিষ্ট আলোচনা-সমালোচনামূলক গ্রন্থের সম্মুখীন হলাম। রামায়ণের ঘটনাবলি, চরিতাবলি, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে নব নব ভাবনার উদ্রেক হলো। রামায়ণ আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করল। রামায়ণের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক আমাকে রামায়ণ নিয়ে গবেষণা করার পরামর্শ দেন। রামায়ণকে গ্রহণ করলাম আমার পিএইচ.ডি গবেষণার বিষয় হিসেবে। আমি জানি, রামায়ণ সম্পর্কে অনেক মহাজন অনেক কথা বলেছেন, ভবিষ্যতেও অনেকে অনেক কথা বলবেন। রামায়ণ যেহেতু মানবিক কাব্য এবং মহাকবি বাল্মীকির অমর সৃষ্টি, সে কারণে এখানে জিজ্ঞাসু সৃষ্টিশীল গবেষকের নব ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা অবশ্য কাম্য। এখানেই নবীন গবেষকের সাহসী এবং বিনম্র প্রয়াস।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক অনুপম সৃষ্টি। ঐতিহ্যে, পরম্পরায় রামায়ণ ভারতবর্ষের আদিকাব্য। বাল্মীকি এর প্রণেতা। সমগ্র বিশ্বের স্বীকৃত মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণ অন্যতম। রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবর্ষের একটি সময়ের রাজনীতি, সমাজ, সভ্যতা, জীবন ও দর্শনের প্রতিচ্ছবি। কালান্তরেও এর আবেদন ক্ষুণ্ন হয়নি। একালের দর্পণেও দেখা যায় সেকালের প্রতিচ্ছবি। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানা রূপে-রূপান্তরে এর প্রসার ঘটেছে। রামায়ণ নিয়ে বিবিধ আলোচনা, সমালোচনা, গবেষণা হয়েছে। তবুও একটি মানবিক কাব্য হিসেবে একজন গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তার নব নব রূপের উন্মেষ এবং নতুন ভাবনার সঞ্চার ঘটা খুবই স্বাভাবিক। বাল্মীকি নিজেই তাঁর এই কাব্যের চিরস্থায়িত্ব নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। ব্রহ্মামুখে বিবৃত হয়েছে – যতকাল পৃথিবীতে পর্বতমালা থাকবে, প্রবাহিত হবে নদীধারা, ততকাল মানবসমাজে প্রচারিত থাকবে রামায়ণকথা। (যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥ আদিকাণ্ড, ২/৩৫-৩৬)। সাত কাণ্ডে বিভাজিত এই রামায়ণে দৃষ্ট যুগগত জীবন, রাজনীতি ও সমাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই কালজয়ী গ্রন্থ রামায়ণের রাজনীতি ও সমাজের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার

উদ্দেশ্যে আমি আমার গবেষণাকর্মটি নির্ধারণ করেছি। 'রামায়ণের রাজনীতি ও সমাজবীক্ষণ' আমার পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম।

মানবজীবনের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষযুক্ত সার্বিক দিক রামায়ণে আলোচিত হয়েছে। রামায়ণের জীবনাদর্শ, আদর্শ রাষ্ট্রনীতি, তৎকালীন সমাজের বিবিধ চিত্র ভারতের শাশ্বত জীবনকে করেছে মহিমান্বিত। বহু গবেষক রামায়ণের গঠনপ্রকৃতি, জীবনদর্শন, চরিত্রবিশ্লেষণ করে অনুধাবন করেছেন তার বহুপ্রসারী দিকসমূহ। আমি আমার গবেষণায় রামায়ণের যুগে রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছি এবং প্রাসঙ্গিকভাবে প্রয়োজনে এ যুগের তুল্যমান বিচার করার চেষ্টা করেছি।

সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের জন্য আমি আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, মহর্ষি বাল্মীকিকৃত রামায়ণম্ [(২ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, নিউলাইট, কলকাতা, প্রথম খণ্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, দ্বিতীয় খণ্ড, জানুয়ারি ১৯৯৭] গ্রহণ করেছি। এছাড়া পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, রামায়ণম্: বাল্মীকি বিরচিতম্, (সংস্কৃত ও মূল অনুবাদ সমেত, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৫)-এর সহায়তা নিয়েছি।

আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র অভিসন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতিরেকে চারটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়: বাল্মীকির কাল ও পরিচিতি, দ্বিতীয় অধ্যায়: আদি মহাকাব্য রামায়ণ, তৃতীয় অধ্যায়: রামায়ণের রাজনীতি এবং চতুর্থ অধ্যায়: রামায়ণের সমাজবীক্ষণ।

'বাল্মীকির কাল ও পরিচিতি' নামের প্রথম অধ্যায়ে বাল্মীকির কাল নির্ধারণ ও তাঁর পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কবি কৃত্তিবাস, অধ্যাত্মরামায়ণ, রামচরিতমানস অনুযায়ী বাল্মীকি মুনি রত্নাকর দস্যুর রূপান্তর। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে, মহাভারতের বনপর্বে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে বাল্মীকিকে প্রচেতার পুত্র বলা হয়েছে। বাল্মীকির কাল সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন খ্যাতিমান পণ্ডিতের মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল প্রাপ্ত যুক্তি-তর্ক শেষে বৌদ্ধ-পূর্ববর্তী কালে আনুমানিক খ্রি.পূ. এক হাজার অব্দে রামায়ণ রচিত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

'আদি মহাকাব্য রামায়ণ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে রামায়ণকে আদিকাব্য ও প্রথম মানবিক কাব্য হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অগ্নিপুরাণ, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, ভামহের কাব্যালংকার, ভোজদেবের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণের আলোকে মহাকাব্যের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের পাশাপাশি পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাবনাগুলির আলোকপাত করা হয়েছে। রামায়ণ ভারতবর্ষের চিরকালীন ইতিহাস ও এক মহান মহাকাব্য, এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্য আরেকটি মহান মহাকাব্য মহাভারতসহ পাশ্চাত্য দুই বিখ্যাত মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসির সঙ্গে রামায়ণের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আরও আলোচিত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের পৌর্বাপর্ব। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং অবশেষে মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের প্রাচীনত্বকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

রামায়ণের রাজনীতি নামক তৃতীয় অধ্যায়ে আদর্শ রাষ্ট্রনীতি, আদর্শ রাজার গুণাবলি, চরিত্রগঠনে রাজার দায়িত্ব, কর্মচারী নিয়োগে নিপুণতা, বিদ্বান ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বে নিয়োগ, দক্ষ কর্মচারীর বেতনাদি বৃদ্ধি, রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থা, অধার্মিক রাজার রাজ্যে দুর্গতি, পণ্ডিত ও গুণীর সমাদর, রাজসভায় জ্ঞানিজনের সমাগম, রামরাজ্য (রামচন্দ্রকর্তৃক রাজধর্ম পালনের পূর্ণ বিবরণ), আর্য-অনার্য সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

রামায়ণের সমাজবীক্ষণ নামক চতুর্থ অধ্যায়ে বিবাহ, নারীর অবস্থান, চাতুর্বর্ণ্য, চতুরাশ্রম, শিক্ষা, বৃত্তিব্যবস্থা, কৃষি, পশুপালন, গো-সেবা, বাণিজ্য, শিল্প, আহার ও আহার্য, পরিচ্ছদ ও প্রসাধন, সদাচার, মাতা-পিতা ও গুরুজনের প্রতি কর্তব্য, পারিবারিক বিবিধ সম্পর্ক, অতিথিসেবা ও শরণাগত রক্ষণ, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি তৎকালীন সমাজের বিচিত্র বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

রামায়ণে সাতটি কাণ্ড– আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধা, সুন্দর, যুদ্ধ ও উত্তরকাণ্ড। পাদটীকায় বা তথ্যসূত্রতে তথ্যপঞ্জি প্রমাণের উদ্ধৃতিতে কাণ্ডের পূর্ণনাম গৃহীত হয়েছে। সর্গ ও শ্লোকসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– আদিকাণ্ডের প্রথমসর্গের দশম শ্লোক – আদিকাণ্ড, ১/১০। এখানে কাণ্ডের পূর্ণনাম আদিকাণ্ড এবং প্রথম সর্গ ও দশম শ্লোককে সংখ্যায় লেখা হয়েছে।

উপসংহারে অভিসন্দর্ভের কার্যশেষের কথা, সামগ্রিক আলোচনার সারাৎসার এবং গবেষকের নিজস্ব মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাল্মীকির কাল ও পরিচিতি

মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্যের প্রণেতা। ঐতিহ্য-পরম্পরায়, বিশ্বাসে বাল্মীকি আদিকবি এবং রামায়ণ আদিকাব্যরূপে স্বীকৃত। কিন্তু বাল্মীকির জীবন-যৌবনের সমাচার আমাদের কাছে সুবিদিত নয়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতা-শপথের সময় বাল্মীকি নিজেকে প্রচেতার দশম পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি এবং লব-কুশকে রামের পুত্র বলে অভিহিত করেন।[১] রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রারম্ভে দেবর্ষি নারদের কাছে তিনি সাম্প্রতিক সময়ে কে সর্বোত্তম মানুষ তা জানতে চেয়েছিলেন। নারদ তাঁকে অযোধ্যার রামচন্দ্রের কথা বলে সংক্ষেপে তাঁর জীবনচরিত বর্ণনা করেন। এরপর বাল্মীকি তমসাতীরে ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে শোকার্ত হয়ে হন্তা ব্যাধকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপ বাণী অলৌকিক ছন্দ হয়ে প্রকাশ পায়।[২] বাল্মীকির শোক থেকে উৎসারিত ঐ ছন্দ (অনুষ্টুভ্ ছন্দ) শ্লোক নামে খ্যাত হয়।[৩] এরপর স্বয়ং ব্রহ্মা বাল্মীকির কাছে এসে নারদের কাছ থেকে শ্রুত রামকথা অনুষ্টুভ্ ছন্দে লিখতে বলেন। ব্রহ্মা আরও বলেন যে রামের যা কিছু অবিদিত সবই বাল্মীকির কাছে বিদিত হবে এবং তাঁর রচনায় কোনোও কিছু মিথ্যা হবে না।[৪] এরপর তিনি রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। লঙ্কাযুদ্ধশেষে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর রামচন্দ্র যখন সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন তখন সীতা বাল্মীকির তপোবনে আশ্রয় পান। এই তপোবনেই রাম-সীতার যমজ সন্তান লব-কুশের জন্ম হয়। বাল্মীকির স্নেহে যত্নে শিক্ষায় লব-কুশ বর্ধিত হয়। বাল্মীকি তাদের রামায়ণ গান শিক্ষা দেন। উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্রের যজ্ঞসভায় বাল্মীকি সীতা ও লব-কুশসহ উপস্থিত হন। সেখানে বাল্মীকি রামকে তাঁর পুত্ররূপে লব-কুশের পরিচয় করিয়ে দেন। সে সঙ্গে সীতাকেও পতিব্রতা, অপাপবিদ্ধা বলে রামের কাছে সাক্ষ্য দেন। মূল রামায়ণ থেকে বাল্মীকির পরিচিতি হিসেবে এটুকুই পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কাব্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাল্মীকির কিছু পরিচিতি পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র বাল্মীকিকে জানার জন্য তা যথেষ্ট নয়। তবুও এখানে সে সকল তথ্য সন্নিবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছি। মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয় মুনি 'রামোপাখ্যান' বর্ণনা করেছেন। বনপর্বের মোট আঠারোটি

অধ্যায়ে (২৭৩-২৯০) রামের জন্ম, বনগমন, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রায় সকল ঘটনার বর্ণনা আছে। কিন্তু সেখানে বাল্মীকির নাম উল্লিখিত হয়নি। তবে দ্রোণপর্বে 'মা নিষাদ' শ্লোকের প্রসঙ্গে এবং শান্তিপর্বে (ভার্গব গীত ৫৩/৫৪) বাল্মীকি ও রামায়ণকথার উল্লেখ আছে।[৫] কিন্তু বাল্মীকি সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। হরিবংশ, পরাশর সংহিতা, বিষ্ণু, অগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গরুড়, ব্রহ্ম, বায়ু, ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণে সবিস্তার অথবা সংক্ষেপে রামায়ণকাহিনি বর্ণিত হয়েছে।[৬] বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে বাল্মীকিকে 'ভার্গব' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভৃগুর বংশধর হিসেবে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির কথা বলেছেন। তিনি কবি বাল্মীকিকে 'প্রাচেতস্' বিশেষণে অভিহিত করেছেন।[৭] অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যেও বাল্মীকির নাম উল্লিখিত।[৮] কিন্তু কোথাও সন্তোষজনক তথ্য পাওয়া যায় না।

কৃত্তিবাসবিরচিত বাংলা রামায়ণে বাল্মীকি সম্পর্কে অধিকতর বিবরণ পাওয়া যায়। সে বিবরণ অনুযায়ী বাল্মীকির পিতা-মাতা ও পুত্রাদির কথা জানা যায়। কাহিনি অনুযায়ী বাল্মীকি প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন। তাঁর নাম ছিল রত্নাকর। রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা অর্জন করতেন। তিনি বনমধ্যে থেকে পথিকদের অত্যাচার করে কিংবা হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করতেন। একবার ঐ বনপথে দেবর্ষি নারদ যাচ্ছিলেন। রত্নাকর নারদকে আক্রমণ করেন। তখন নারদ রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করেন, তার এই পাপকার্যের অংশ কেউ গ্রহণ করবে কি না। রত্নাকর বললেন, অবশ্যই গ্রহণ করবে। তিনি দস্যুবৃত্তির দ্বারা যাদের ভরণপোষণ করেন তারা পাপকার্যের অংশ গ্রহণ করবে। নারদ তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজনদের কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে আসতে বলেন। তখন রত্নাকর নারদকে বনমধ্যে রেখে পরিবারের কাছে চলে যান এবং তাদের তার পাপের অংশভাগী হতে বলেন। কিন্তু পরিবারের কেউ এই পাপের অংশী হতে সম্মত হলেন না। কারণ পরিবারের ভরণপোষণ করা রত্নাকরের দায়িত্ব। এরপর রত্নাকর নারদের কাছে এসে তাঁর অসহায়ত্বের কথা বললেন। তখন নারদ তাঁকে 'রাম' নাম নিতে বললেন। এতে তার পাপ ক্ষালন হবে। রত্নাকর একভাবে বসে ষাট হাজার বছর রামনাম জপ করেন। ধীরে ধীরে রত্নাকর উইপোকার ঢিপির দ্বারা আবৃত হয়ে যান এবং এক সময়ে পাপমুক্ত হয়ে তার থেকে বেরিয়ে আসেন। উইয়ের ঢিপির এক নাম বল্মীক। এই বল্মীক থেকে রত্নাকরের নাম হলো বাল্মীকি। নারদের আশীর্বাদে তিনি সুস্থ দেহপ্রাপ্ত হন। নারদ তাঁর কাছে রামের কথা বলেন। বাল্মীকি

'অনুষ্টুভ্' নামে নতুন ছন্দ লাভ করেন এবং ব্রহ্মার নির্দেশে তিনি রামায়ণ রচনা করেন। রত্নাকর থেকে বাল্মীকিতে রূপান্তরের কাহিনি বহুল প্রচারিত এবং এটা কৃত্তিবাসের কীর্তি। কৃত্তিবাস তাঁর রচিত বাংলা রামায়ণে বহু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, যা মূল রামায়ণে নেই। তবে বল্মীক থেকে বাল্মীকি হওয়ার ধারণাটি কৃত্তিবাস অন্য কোনো শ্রুত কাহিনি থেকে গ্রহণ করতে পারেন।

ঋগ্বেদের দুটি সূক্তে একজন চ্যবন ঋষির নাম আছে। এই ঋষিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জরা থেকে মুক্ত করে যুবা করে দিয়েছিলেন।[৯] ঋগ্বেদের এ কাহিনিটি শতপথব্রাহ্মণেও[১০] বিবৃত হয়েছে। পরে মহাভারতেও এর বিস্তার হয়েছে।[১১] কাহিনিতে আছে, একদিন রাজা শর্যাতি তাঁর কন্যা সুকন্যা এবং অনুচরদের নিয়ে বনভ্রমণ করছিলেন। সে সময় চ্যবন নামের এক ঋষি উইঢিপিতে আচ্ছাদিত হয়ে তপস্যারত ছিলেন। তাঁর দুটি চোখ কেবল দেখা যাচ্ছিল। সুকন্যা কৌতূহলী হয়ে অজ্ঞাতসারে ঋষির দুচোখ কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করেন। মুনি তাকে অভিশাপ দেন। পরে বৃদ্ধ চ্যবন তাকে বিয়ে করে অভিশাপ-মুক্ত করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুগ্রহে চ্যবন রূপযৌবন ফিরে পান। অনুমিত যে ঋগ্বেদের উদ্ধৃতিটি পল্লবিত হয়ে মহাভারতে সজীব বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এই লোকশ্রুতি কৃত্তিবাসের রত্নাকর বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হতে পারেন। উল্লেখ্য যে ঋগ্বেদের চ্যবান মহাভারতে হয়েছেন চ্যবন। বাল্মীকিকে অনেক স্থানে ভার্গব বলা হয়েছে। ভৃগুর পুত্র চ্যবন এবং চ্যবনের পুত্র বাল্মীকি। এসব অনুমান কিংবা কিংবদন্তী ব্যতিরেকে বাল্মীকির অন্য কোনো সমাচার মূল রামায়ণ থেকে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

এবার বাল্মীকির কালের সন্ধান করা যাক। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যাদের পরিচয়, তাদের কাছে সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপার কবি-সাহিত্যিকদের কাল নির্ণয়। আদিকবি হিসেবে বাল্মীকির স্বীকৃতি এবং আদিকাব্য হিসেবে রামায়ণের স্বীকৃতি বেশ দৃঢ়। এটা বলা যায় যে বেদ-পরবর্তী প্রথম মানবিক কাব্য রামায়ণ। রামায়ণের কাল আর বাল্মীকির কাল একই হবে। কারণ বাল্মীকি কেবল রামায়ণের রচয়িতা নন, তিনি রামায়ণের একটি চরিত্রও। নির্বাসিতা সীতা বাল্মীকির আশ্রমেই স্থান পেয়েছিলেন। এখানেই জন্ম হয়েছিল লব-কুশের। লব-কুশকে শিক্ষা দিয়েছিলেন বাল্মীকি এবং লব-কুশসহ সীতাকে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে নিয়ে গিয়েছিলেন বাল্মীকিই। অতএব রামায়ণের কাল আর বাল্মীকির কাল একই। গৌতমবুদ্ধের ঐতিহাসিকতা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। রামায়ণ বুদ্ধদেবের পূর্বে রচিত হয়েছে বলে

বিবেচিত। যদিও একটি প্রবল মত আছে যে রামায়ণ বুদ্ধপরবর্তী রচনা। এই মতের পক্ষে একটি যুক্তি হলো, রামায়ণে বুদ্ধের কথা আছে। একটি শ্লোকে রামচন্দ্র তথাগত বুদ্ধকে চোর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি তাঁর জ্ঞানী প্রজাদের নাস্তিক বুদ্ধের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।[১২] এ বক্তব্যটিকে অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত বলতে হবে। কারণ রামায়ণের চব্বিশ হাজার শ্লোকের মধ্যে মাত্র একটি শ্লোকে বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধের কথা থাকবে তা যুক্তিসিদ্ধ নয়। রামায়ণ বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্বে রচিত, এ সম্পর্কে অনেক খ্যাতিমান পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ওয়েবার, ম্যাকডোনেল প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের যুক্তি হলো– রামায়ণ রচনাকালে কোশলের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। কিন্তু বৌদ্ধযুগে, জৈনযুগে ও গ্রীক রাজত্বকালে এবং মহর্ষি পতঞ্জলির সময়ে কোশলের রাজধানীর নাম ছিল 'সাকেত'। উত্তরকাণ্ডে উল্লিখিত আছে, শ্রাবস্তী নগরে রামচন্দ্রের পুত্র লব রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু অন্য ছয় কাণ্ডে শ্রাবস্তী নগরের কোনো উল্লেখ নেই। গৌতম বুদ্ধের সময়ে প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী নগরে রাজত্ব করতেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডে মিথিলা ও বিশালা আলাদা দুটি নগর হিসেবে উল্লিখিত। কিন্তু বৌদ্ধযুগে মিথিলা ও বিশালা মিলে একটি নগরের পরিচয় পাওয়া যায়– তা হলো 'বৈশালী'। এতে প্রমাণিত হয়, বাল্মীকি বুদ্ধের পূর্ববর্তী।

মেগাস্থেনিসের সময় মগধ তথা ভারতের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল। কিন্তু রামায়ণে এই পাটলিপুত্র নামে কোনো নগরীর পরিচয় পাওয়া যায় না। রামায়ণে মগধের রাজধানী গিরিব্রজ। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পূর্বপুরুষ রাজা বসু এই গিরিব্রজ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।[১৩] এই নগরীর অপর নাম বসুমতী।[১৪] এ থেকে অনুমান করা যায়, পাটলীপুত্র নগরী প্রতিষ্ঠার পূর্বে অর্থাৎ খ্রি.পূ. চতুর্থ শতকের অনেক আগেই রামায়ণ রচিত হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন, আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের (৩২৬-৩২৭ খ্রি.পূ.) পর রামায়ণ রচিত হয়। যুক্তি হিসেবে তাঁরা দেখান যে রামায়ণে 'যবন' শব্দটির উল্লেখ আছে।[১৫] কিন্তু এ যুক্তি খুব দৃঢ় নয়। কেননা যবন শব্দটি রামায়ণে মাত্র দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য য়াকোবি প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন, রামায়ণের এই অংশটুকু পরবর্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। আবার যবন শব্দটিতে শুধু গ্রীকদের বোঝাত না, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে যেসব আক্রমণকারী ভারতে আসত তাদের

সকলকেই বোঝাত। বেদবহিষ্কৃত ক্ষত্রিয়দেরকেও যবন বলা হতো। জার্মান পণ্ডিত ওয়েবারের মতে, হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি দ্বারা রামায়ণ প্রভাবিত। তাঁর মতে ইলিয়ড ও ওডিসি কাব্যে বর্ণিত হেলেনের অপহরণ এবং গ্রীক সৈন্যদের দ্বারা ট্রয়নগরী অবরোধের কাহিনি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবি বাল্মীকি রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণ এবং রামচন্দ্র কর্তৃক লঙ্কা নগরী অবরোধের কাহিনি লিখেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষে আগমনের পর রামায়ণ রচিত হয়েছে। এ সকল যুক্তি দুর্বল, গ্রহণযোগ্য নয়।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে রামায়ণ রচিত হয়েছিল। এর বড় প্রমাণ হলো, বৌদ্ধ জাতক কাহিনিগুলি। বৌদ্ধ দশরথজাতকে রামায়ণের মূল আখ্যায়িকা আছে। কিন্তু অনেকটা বিকৃত। দশরথজাতকে রাম-সীতা আপন ভাই- বোন। এতে বাল্মীকিবর্ণিত কাহিনি সম্পূর্ণ অনুসৃত না হলেও অনেকটা প্রভাব রয়েছে।

রামায়ণ প্রাচীন উপনিষদগুলির পরে রচিত। রামায়ণের সংস্কৃত পাণিনির (খ্রি.পূ.৫ম–৬ষ্ঠ শতক) ব্যাকরণের দ্বারা প্রভাবিত নয়। খ্রি.পূ. প্রথম শতকের কবি অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যে মহাকবি বাল্মীকিকে আদিকবি বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৬] তাঁর রচনারীতি রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত।[১৭] এতে প্রমাণিত হয়– মহাকবি বাল্মীকি অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী। অশ্বঘোষের প্রায় সমসাময়িক কুমারলাতের 'কল্পনামণ্ডিতিকা' গ্রন্থে রামায়ণের উল্লেখ আছে। খ্রি. প্রথম শতাব্দীতে রচিত জৈন বিমলসূরির 'পউমচরিঅ' কাব্যে রামচন্দ্রের কাহিনির উল্লেখ আছে। সুতরাং এসব গ্রন্থে রামায়ণের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে রামায়ণ খ্রি. প্রথম শতাব্দীর অনেক পূর্বে রচিত হয়েছিল এবং বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

সকল প্রাপ্ত যুক্তিতর্কে এটা অনুমিত ও গ্রহণযোগ্য যে রামায়ণ বুদ্ধপূর্ববর্তী যুগে রচিত এবং এ কালটি খ্রি.পূ. এক হাজার অব্দ হতে পারে। আর এ কালটি বাল্মীকির কালও।

তথ্যসূত্র :

১. প্রাচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥ উত্তরকাণ্ড, ৯৬/১৯

২. মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ আদিকাণ্ড, ২/১৫

৩. পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥ আদিকাণ্ড, ২/১৮

৪. তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥ আদিকাণ্ড, ২/৩৫

৫. দ্রোণপর্ব (৫৯ অধ্যায়), শান্তিপর্ব (ভার্গব গীত ৫৩/৫৪)

৬. বিষ্ণুপুরাণে (১ম ভাগ চতুর্থ অংশের চতুর্থ অধ্যায়) সূর্যবংশের বিশদ বর্ণনা আছে। গরুড়পুরাণে (১৪৭ অধ্যায়) রামায়ণ কথার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মপুরাণে (১৫৪-১৫৭ অধ্যায়) ও স্কন্দপুরাণে (তৃতীয় খণ্ড) রামচরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অগ্নিপুরাণে (১৭ অধ্যায়) সূর্যবংশের বর্ণনা ও (২৩৮-২৪২ অধ্যায়) রামচন্দ্রের শাসননীতির বর্ণনা আছে। বায়ুপুরাণে (৮৮ অধ্যায়) ইক্ষ্বাকু বংশের কথা বর্ণিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (১৪ অধ্যায়), দেবীভাগবতপুরাণে (তৃতীয় স্কন্ধ ২৮-৩০ এবং প্রথম অধ্যায়) সূর্যবংশের কথা উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ড) বিভিন্ন অধ্যায়ে রামায়ণী কথার প্রসঙ্গ আছে। পরাশর সংহিতায় (দ্বাদশ অধ্যায়) নল কর্তৃক সেতুবন্ধনের উল্লেখ আছে।

৭. রঘুবংশ (১৪/৭০; ১৪/৭৯; ১৫/৩৭; ১৫/৬৪; ১৫/৬৯-৭০)

৮. বুদ্ধচরিত ১/৪৩, সৌন্দরনন্দ ১/২৬

৯. যুবং চ্যবানং জরসোঽমুমুক্তং নি পেদব ঊহথুরাশুমশ্বম্ ।
নিরংহসস্তমসঃ স্পর্তমত্রিং নি জাহুষং শিথিরে ধাতমন্তঃ ॥ ঋগ্বেদ, ৭/৭১/৫
যুবং চ্যবানং সনয়ং যথা রথং পুনর্যুবানং চরথায় তক্ষথুঃ।
নিষ্টৌগ্রমূহথুরদ্ভাস্পরি বিশ্বেত্তা বাং সবনেষু প্রবাচ্যা ॥ ঋগ্বেদ, ১০/৩৯/৪

১০. শতপথব্রাহ্মণ (৪.১.৫)

১১. মহাভারত (বনপর্ব)

১২. যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং স নাস্তিকো নাভিমুখে বুধঃ স্যাৎ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/৩৪

১৩. অসূর্তরজসো নাম ধর্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুনাম গিরিব্রজম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৩২/৭

১৪. এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৩২/৮

১৫. ভূয় এবাসৃজদ্ ঘোরাঞ্ছকান্ যবনমিশ্রিতান্ ।
তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৫৪/২১

১৬ . বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।
চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ পশ্চাত্তদাত্রেয় ঋষির্জগাদ ॥ বুদ্ধচরিত, ১/৪৩
সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যে অশ্বঘোষ বলেছেন:
স তেষাং গৌতমশ্চক্রে সবংশসদৃশীঃ ক্রিয়াঃ।
মুনিরূর্দ্ধ্বং কুমারস্য সগরস্যেব সাগরঃ॥
কণ্বঃ শকুন্তলস্যেব ভরতস্য তপস্বিনঃ।
বাল্মীকিরিব ধীমতোর্মৈথিলেয়য়োঃ ॥ সৌন্দরনন্দ, ১/২৫-২৬

১৭. কবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে রামায়ণের প্রভাব লক্ষণীয়। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে লঙ্কাপুরীর ঘুমন্ত নারীদের বর্ণনার সাথে বুদ্ধচরিতের পঞ্চম সর্গে (অভিনিষ্ক্রমণ) প্রসুপ্ত কামিনীগণের বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। বুদ্ধচরিত রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত হলেও দুই কবির উদ্দেশ্য ভিন্ন। অশ্বঘোষ বলেছেন 'হ্রিয়া বিযুক্তা' (বুদ্ধচরিত, ৫/৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

আদি মহাকাব্য রামায়ণ, প্রথম মানবিক কাব্য

পৃথিবীর সকল ভাষা-সাহিত্যের প্রথম দৃশ্যরূপ কবিতা। কবিতা অদৃশ্য রূপও। মুখে মুখে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সে রূপ আমাদের কাছে অজ্ঞাত। কারণ তা কোনো হস্তলিপি বা যন্ত্রে ধৃত হয়নি। লেখ্য রূপ না পাওয়ায় অদৃশ্য। সাহিত্যপ্রজাতিতে কবিতা প্রথম প্রসূন হওয়ার একটা স্বাভাবিক কারণ আছে। কবিতা ছন্দোবদ্ধ হওয়ায় শ্রুতিতে আনন্দবর্ধক আর স্মৃতিতেও দীর্ঘস্থায়ী।

সকল সাহিত্যের মতো প্রাচীন ভারতের সাহিত্যেও কবিতার সৃষ্টি প্রথম। এই কবিতা প্রথম দৃষ্ট ঋগ্বেদে (আনু. খ্রি.পূ. ২৫০০-৩০০০ অব্দ)। সে কবিতা ছিল বিস্ময়-বিমুগ্ধ এক অপূর্ব আনন্দের প্রকাশ। ঋগ্বেদের কবিরা ঋষি নামে অভিহিত। ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা আর বেদের কবিতার নাম মন্ত্র। এজন্য তাঁদের বলা হয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। কোনো বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় প্রকৃতির এক একটা সত্তা তাঁদের অনুভূতিতে, ধ্যানে এসেছে। এই ধ্যানলব্ধ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মন্ত্র বা কবিতা। এই কবিতা কখনও অগ্নি, কখনও বরুণ, কখনও উষা দেবতা, কখনও বা অরণ্যানী, রাত্রি প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। ঋষিরা বলেছেন, তাঁরা এ কবিতার রূপের স্রষ্টা নন, তাঁরা দ্রষ্টা। এ কবিতা ঐশী কবিতা। ঋগ্বেদের কবিতা সুসংবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ। এক সময়ে এ কবিতায় সুরসংযোগ হয়ে হলো সংগীত। সামবেদের সঙ্গে এর সম্পর্ক। ধীরে ধীরে কবিতা বা মন্ত্রগুলি যুক্ত হলো যাগযজ্ঞের সঙ্গে। যাগযজ্ঞের বিস্তৃত রূপ পাওয়া যায় যজুর্বেদে। কবিতার মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং ঐশীভাব থাকলেও যাগযজ্ঞের মধ্যে এসে গেল কিছু কৃত্রিমতা। যাগযজ্ঞের অনেক বিস্তারও ঘটল। যাগযজ্ঞ হলো একমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সে যুগের মানুষের কাম্য ছিল স্বর্গ, অভীষ্ট, ঈশ্বরপ্রাপ্তি। যজ্ঞরূপ ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ড ছিল সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। ফলে তাদের জন্য কাম্য স্বর্গ বা ইষ্টলাভ ছিল অসম্ভব। বেদের কবিতা এবং যাগযজ্ঞ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত হলো পশুবলি। এক একটা যজ্ঞে বইতে লাগল বহু পশুর রক্তস্রোত। এই রক্তস্রোত দেখে সমাজের বিজ্ঞ এবং হৃদয়বান মানুষের মন দ্রবীভূত হলো। তাঁরা মনে করলেন, প্রাণিহত্যার মধ্য দিয়ে, রক্ত উৎসর্গের মধ্য দিয়ে অন্তরে প্রশান্তি আসতে পারে না। যজ্ঞের মধ্য দিয়ে কোনো পুণ্য অর্জন হলেও তা ক্ষণস্থায়ী। চিরকালীন কল্যাণ এবং মুক্তি যজ্ঞ বা প্রাণিহত্যার মধ্য দিয়ে

প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ ধরণের উন্নত চিন্তার ফসল হিসেবে সৃষ্টি হলো নতুন কবিতা। এ কবিতার গ্রন্থের নাম উপনিষদ। অবশ্য কোনো কোনো উপনিষদ গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত, আবার কোনো উপনিষদ শুধু গদ্যেও লিখিত। উপনিষদ ভারতীয় মনীষার চরমোৎকর্ষ। মানুষের চিন্তা কত মহৎ হতে পারে, কত কল্যাণময় ও বিশ্বজনীন হতে পারে তার নিদর্শন উপনিষদ। প্রাকৃতিক দৈবীসত্তা, যাগযজ্ঞের স্থানে উপনিষদের বিষয় হলো নিরাকার ব্রহ্ম, আত্মা, চিরমুক্তি, মোক্ষ। উপনিষদের কবি সকল বস্তু, জড় অথবা অজড় সর্বত্র একই ব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করলেন। এই উপলব্ধিতে কোনো হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, ঈর্ষা নেই। উপনিষদের এই বাতাবরণে এক শ্রেণির মানুষের চিন্তা মহৎ থেকে মহত্তর হলো, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হলো। কিন্তু সমাজের বৃহৎ শ্রেণি চিন্তার, জ্ঞানের এই ভুবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এই বিচ্ছিন্নতা আগেই দেখা দিয়েছিল, আরও বৃদ্ধি পেল। উপনিষদ বোঝার জন্য যে চিন্তন, মনন ও অনুশীলনের প্রয়োজন তা বৃহৎ জনসমাজের ছিল না। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অতি দূরের কোনো দেবতা বা নিরাকার ব্রহ্মকে অনুধাবন করা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। তাই তাদের মনের গভীরে জমা হচ্ছিল কোনো প্রবল ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা সীমাহীন গুণে গুণান্বিত, অনন্ত মহিমাযুক্ত দেবতা না হয়েও সকল দৈবী বৈভবে বিভূষিত কোনো একজন, যাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। যিনি রক্ত-মাংসের মানুষ, তাদেরই মতো দেখতে, কিন্তু অনন্য। এটা মনে হয় সকল জাতির এবং সমগ্র দেশেরও অভীপ্সা ছিল। এই ইচ্ছা এবং প্রবল বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে রামচন্দ্রের মধ্য দিয়ে রামায়ণে। রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্যে-কাব্যে নব জাগরণের সূচক। দেবতা নয়, ঈশ্বর নয়, ব্রহ্মও নয়, রামায়ণে সূচিত হয়েছে মানুষের জয়গান। এ কারণে রামায়ণ আদিকাব্য, প্রথম মানবিক কাব্য।

রামায়ণের প্রারম্ভে বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সাম্প্রতিক সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের কথা। সেই মানুষ যিনি একাধারে গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যভাষী, দৃঢ়ব্রত, চরিত্রবান, সর্বভূতের হিতকারক, বিদ্বান, শক্তিমান, প্রিয়দর্শন, আত্মবান, ক্রোধজয়ী, দ্যুতিমান, অসূয়াহীন এবং যিনি যুদ্ধকালে ক্রুদ্ধ হলে দেবতারাও ভীত হন।[১] সব শুনে নারদ বললেন, এরূপ গুণাবলি সত্যিই দুর্লভ। তবে এরূপ একজন গুণান্বিত মানুষ আছেন যিনি জনসমাজে 'রাম' নামে পরিচিত। ইক্ষ্বাকুবংশে তাঁর জন্ম।[২]

এ প্রসঙ্গে বাল্মীকির জিজ্ঞাসা আর নারদের উত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় (কাহিনী কাব্য) অনুপম শব্দাবলিতে বর্ণনা করেছেন। –

ভগবন, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে।
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম–
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে, রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম, –
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তার পুণ্যনাম।
নারদ কহিলা ধীরে, " অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

তারপর স্নানার্থে তমসানদীতীরে গিয়ে বাল্মীকি সুখনিরত এক ক্রৌঞ্চদম্পতিকে দেখতে পেলেন। অপূর্ব তাদের লীলাভঙ্গিমা। বাল্মীকি মুগ্ধনেত্রে তা উপভোগ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সমক্ষে হঠাৎ ঘটল এক করুণ ঘটনা। এক ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে একটি ক্রৌঞ্চকে তিনি ভূতলে পতিত হতে দেখলেন। শোণিতাক্ত তার কলেবর। এই নিষ্ঠুরতায় শোকে বেদনাবিদ্ধ হলো মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয়। শোকার্ত বাল্মীকি তখন ব্যাধকে অভিশাপ দিলেন । ব্যাধকে অভিশাপ দিতে গিয়ে বাল্মীকির মুখ থেকে সহসা উচ্চারিত বাণী নূতন ছন্দরূপে আবির্ভূত হলো[৩], যা বেদ থেকে ভিন্ন। আর এই নূতন অনুষ্টুভ্ ছন্দে লিখিত হলো প্রথম মানবিক কাব্য রামায়ণ। ভবভূতির সৃষ্ট বনদেবতা বাসন্তী এ প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেছেন– চিত্রমাম্নায়াদন্যো নূতনশ্ছন্দসামবতারঃ।... হন্ত তর্হি মণ্ডিতঃ সংসারঃ ।[৪] আমরাও এসঙ্গে বলি, সত্যই রামায়ণে 'মণ্ডিতঃ সংসারঃ'।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১. কোঽন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্ ।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ ॥
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে ॥ আদিকাণ্ড, ১/২-৪

২. বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ।
মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্যা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশবী ॥ আদিকাণ্ড, ১/৭-৮

৩. মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ আদিকাণ্ড, ২/১৫

৪. উত্তররামচরিতম্, ২য় অঙ্ক (৫ম শ্লোকের পর)।

Dhaka University Institutional Repository

মহাকাব্যের সংজ্ঞা

বেদসংহিতার দেবত্ব, উপনিষদের অধ্যাত্ম্য বা নির্গুণ ব্রহ্মত্ব অতিক্রম করে প্রথম মানবিক সত্তা মানবিক বিজয়বার্তা বিঘোষিত রামায়ণে। একারণে রামায়ণ আদিকাব্য এবং প্রথম মানবিক কাব্য। পরবর্তী সময়ে রামায়ণ আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে মহাকাব্য হিসেবে গৃহীত। এবার, মহাকাব্যের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা যাক।

মহাকাব্য সর্গবন্ধ। অর্থাৎ সমষ্টিগত শ্লোকবদ্ধ পদ্যকাব্যই মহাকাব্য। মহাকাব্য তন্ময় কাব্য। এটি ব্যক্তিনিষ্ঠ নয়, বস্তুনিষ্ঠ। এতে কবির অন্তর অনুভূতির প্রকাশ প্রাধান্য পায় না, বস্তুপ্রধান ঘটনা বিন্যাসের অভিব্যক্তি এতে বিদ্যমান। কবির আত্মবাণী অপেক্ষা বিষয়বাণী ও বিষয় বিন্যাসই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। আলঙ্কারিক দণ্ডী, আলঙ্কারিক ভামহ, ভোজদেব, হেমচন্দ্র এবং সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অগ্নিপুরাণেও মহাকাব্যের লক্ষণ বিবৃত হয়েছে। মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে পুরাণকার বলেছেন:

সর্গবন্ধো মহাকাব্যমারব্ধং সংস্কৃতেন যৎ॥
তাদাত্ম্যমজহৎ তত্র তৎসমং নাতিদুষ্যতি।
ইতিহাসকথোদ্ভুতমিতরাদ্বা সদাশ্রয়ম্ ॥
মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনিয়তং নাতিবিস্তরম্ ।
শক্কর্য্যাতিজগত্যাতিশক্কর্য্যা ত্রিষ্টুভা তথা ॥
পুষ্পিতাগ্রাদিভির্বক্ত্রাভির্জনৈশ্চারুভিঃ সমৈঃ।
মুক্তা তু ভিন্নবৃত্তান্তা নাতিসংক্ষিপ্তসর্গকম্ ॥
অতিশক্করিকাষ্টিভ্যামেকসংকীর্ণকৈঃ পরঃ ।
মাত্রয়াপ্যপরঃ সর্গঃ প্রাশস্ত্যেষু চ পশ্চিমঃ ॥
কল্পোঽতিনিন্দিতস্তস্মিন্ বিশেষানাদরঃ সতাম্ ।
নগরার্ণবশৈলর্ত্তু-চন্দ্রার্কাশ্রমপাদপৈঃ ॥

উদ্যানসলিলক্রীড়ামধুপানরতোৎসবৈঃ।

দূতীবচনবিন্যাসৈরসতীচরিতাদ্ভুতৈঃ ॥

তমসা মরুতাপ্যন্যৈর্বিভাবৈরতিনির্ভরৈঃ ।

সর্ববৃত্তিপ্রবৃত্তঞ্চ সর্বভাবপ্রভাবিতম্ ॥

সর্বরীতিরসৈর্জুষ্টং পুষ্টং গুণবিভূষণৈঃ।

অতএব মহাকাব্যং তৎকর্তা চ মহাকবিঃ ॥

বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্ ।

পৃথক্‌প্রযত্ননির্বর্ত্ত্যং বাগ্‌বক্রিম্নিবসাদ্‌বপুঃ ॥

চতুর্বর্গফলং বিস্বগ্ ব্যাখ্যাতং নায়কাখ্যয়া।

সমানবৃত্তিনির্ব্যূঢ়কৌশিকীবৃত্তিকোমলঃ ॥

কলাপোঽত্র প্রবাসঃ প্রাগনুরাগাহ্বয়ো রসঃ।

সবিশেষকং প্রাপ্ত্যাদি সংস্কৃতেনেতরেণ চ ॥ অগ্নিপুরাণ(৩৩৭/২৪-৩৫,বঙ্গবাসী সংস্করণ)

অর্থাৎ মহাকাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং সর্গে বিভক্ত। তবে এতে তৎসম ভাষা থাকলে দোষের হবে না। ইতিহাস বা কোনো সদ্‌বিষয় নিয়ে মহাকাব্য রচিত হবে। মন্ত্রণা, দৌত্য, অভিযান ও যুদ্ধবিষয়ক বর্ণনা থাকবে কিন্তু অতি বিস্তারিত নয়। শক্করী, অতিজগতী, অতিশক্করী, ত্রিষ্টুভ্, পুষ্পিতাগ্রা, বক্ত্র প্রভৃতি ছন্দে ও সুন্দর সমবৃত্ত ছন্দে মহাকাব্য রচিত হবে। সর্গগুলি হবে অপ্রাসঙ্গিক কাহিনিবর্জিত, তবে অতি সংক্ষিপ্ত নয়। অতিশক্করী ও অষ্টি একটি সর্গ নিবদ্ধ হবে। অন্য সর্গ মাত্রাছন্দে রচিত হতে পারে। শেষ সর্গ প্রশস্ত ছন্দে গ্রথিত হবে। মহাকাব্যে নগর, সমুদ্র, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, আশ্রম, বৃক্ষ, উদ্যান, জলক্রীড়া, মদ্যপান, রতি উৎসব, দূতীবাক্য বিন্যাস, অসতীর চরিত্র, অদ্ভুতবিষয়, অন্ধকার, বায়ু এবং রতিসম্বন্ধীয় অন্য বিভাব প্রভৃতি বর্ণিত হবে। সব ধরণের বৃত্তি প্রবর্তনা থাকবে এবং সব রকম ভাবে প্রভাবিত হবে। সব ধরণের রীতি ও রসে পরিপুষ্ট ও সর্বপ্রকার গুণযুক্ত হবে। এজন্যই এর নাম মহাকাব্য এবং এর রচয়িতাকে মহাকবি বলা হয়। মহাকাব্য পাঠ করলে চতুর্বর্গফল লাভ করা যায়। নায়কের নামের সঙ্গে বৃত্তির সামঞ্জস্য রাখতে হবে। কৌশিকীবৃত্তি কোমলতাব্যঞ্জক। একে কলাপ বলা হয়। এতে প্রবাস থাকবে এবং এর রস হলো পূর্বরাগ। এতে প্রাপ্তি প্রভৃতি বিশেষভাবে বর্ণিত থাকবে।

অগ্নিপুরাণের এই মহাকাব্যলক্ষণের সঙ্গে দণ্ডীবর্ণিত মহাকাব্যলক্ষণের অনেক সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন:

সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্ ।
আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দেশো বাপি তন্মুখম্ ॥
ইতিহাসকথোদ্ভূতমিতরাদ্বা সদাশ্রয়ম্ ।
চতুর্বর্গফলোপেতং চতুরোদাত্তনায়কম্ ॥
নগরার্ণব-শৈলর্ত্তু-চন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ ।
উদ্যানসলিল-ক্রীড়ামধুপানরতোৎসবৈঃ ॥
বিপ্রলম্ভৈর্বিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণনৈঃ।
মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনায়কাভ্যুদয়ৈরপি ॥
অলংকৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরম্ ।
সর্গৈরনতিবিস্তীর্ণৈঃ শ্রব্যবৃত্তৈঃ সুসন্ধিভিঃ ॥
সর্বত্র ভিন্নবৃত্তান্তৈরুপেতং লোকরঞ্জকম্ ।
কাব্যং কল্পান্তরস্থায়ি জায়েত সদলংকৃতি ॥ কাব্যাদর্শ, ১/১৪-১৯

– সর্গের দ্বারা নিবদ্ধ কাব্য মহাকাব্য। এর আরম্ভে আশীর্বাদ, নমস্কার বা কথাবস্তুর উল্লেখ থাকে। এর কাহিনি ইতিহাস আশ্রিত। অথবা সৎ বা সত্যভূত বৃত্তান্ত এর আশ্রয়। এটি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলবিশিষ্ট। এর নায়ক চতুর ও উদাত্ত। অর্থাৎ ধীরোদাত্ত। এতে নগর, সমুদ্র, পর্বত, ঋতু, চন্দ্র ও সূর্যের উদয়, উদ্যানক্রীড়া, সলিলক্রীড়া, মধুপান ও সম্ভোগ শৃঙ্গারের বর্ণনা থাকবে। বিভিন্ন প্রকার বিপ্রলম্ভ, বিভিন্ন প্রকার বিবাহ, রাজপুত্রের জন্মের বর্ণনা, মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ ও নায়কের অভ্যুদয়ের বর্ণনার দ্বারা শোভিত হবে। এটি সংক্ষিপ্ত হবে না। অবিচ্ছিন্ন রস ও ভাবের দ্বারা এটি সমুজ্জ্বল হবে। এটি একাধিক সর্গবিশিষ্ট। সর্গগুলি অতি বিস্তৃত হবে না। এর কাহিনি শ্রুতিসুখকর হবে। কাহিনিগুলি পরস্পর সুষ্ঠুভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হবে। সর্গগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তান্ত নিবেশিত হবে

অথবা সকল সর্গের অন্তে ভিন্ন ছন্দ ব্যবহৃত হবে। মহাকাব্য হবে সদলংকৃত। বস্তুত দণ্ডী 'সদলংকৃতি' পদটির দ্বারা মহাকাব্যে সুষ্ঠু বা সার্থক অলংকারের প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। মহাকাব্য লোকরঞ্জক এবং যুগান্তরব্যাপী।

আচার্য ভামহ তাঁর 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে মহাকাব্যের লক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন:

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং মহতাঞ্চ মহচ্চ তৎ।
অগ্রাম্যশব্দমর্থ্যঞ্চ সালংকারং সদাশ্রয়ম্ ॥
মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনায়কাভ্যুদয়ৈশ্চ যৎ ।
পঞ্চভিঃ সন্ধিভির্যুক্তং নাতিব্যাখ্যেয়মৃদ্ধিমৎ ॥
চতুর্বর্গাভিধান্বেপি ভূয়সার্থোপদেশকৃৎ ।
যুক্তং লোকস্বভাবেন রসৈশ্চ সকলৈঃ পৃথক্ ॥
নায়কং প্রাগুপন্যস্য বংশবীর্যশ্রুতাদিভিঃ।
ন তস্যৈব বধং ব্রূয়াদন্যোৎকর্ষাভিধিৎসয়া ॥ কাব্যালংকার, ১/১৯-২২

হেমচন্দ্রের মহাকাব্যলক্ষণ অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি বলেছেন–"পদ্যং প্রায়ঃ সংস্কৃতপ্রাকৃতাপভ্রংশ-গ্রাম্যভাষানিবদ্ধভিন্নান্ত্যবৃত্তসর্গাশ্বাস-সন্ধ্যবস্কন্ধকবন্ধং সৎসন্ধিশব্দার্থবৈচিত্র্যোপেতং মহাকাব্যম্ ।" (কাব্যানুশাসন, ৮/৬)

আলঙ্কারিক ভোজদেব ' সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'-এ মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন:

মুখং প্রতিমুখং গর্ভোবমর্ষশ্চ মনীষিভিঃ।
স্মৃতা নির্বহণং চেতি প্রবন্ধে পঞ্চ সন্ধয়ঃ ॥
অতিবিস্তৃতমসংক্ষিপ্তং শ্রব্যবৃত্তং সুগন্ধি চ ।
ভিন্নসর্গান্তবৃত্তং চ কাব্যং লোকেভিনন্দতি ॥

পরোপবনরাষ্ট্রাদিসমুদ্রাশ্রমবর্ণনৈঃ ।

দেশসম্পৎ প্রবন্ধস্য রসোৎকর্ষায় কল্পতে ॥

ঋতুরাত্রিন্দিবার্কেন্দূদয়াস্তময়কীর্তনৈঃ ।

কালঃ কাব্যেষু সম্পন্নো রসপুষ্টিং নিযচ্ছতি ॥

রাজকন্যা-কুমার-স্ত্রীসেনাসেনাঙ্গভঙ্গিভিঃ ।

পাত্রাণাং বর্ণনং কাব্যে রসস্রোতেঽধিতিষ্ঠতি ॥

উদ্যানসলিলক্রীড়ামধুপানরতোৎসবাঃ ।

বিপ্রলম্ভা বিবাহাশ্চ চেষ্টাঃ কাব্যে রসাবহাঃ ॥

মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনায়কাভ্যুদয়াদিভিঃ।

পুষ্টিঃ পুরুষকারস্য রসং কাব্যেষু বর্ষতি ॥

নাবর্ণনং নগর্য্যাদের্দোষায় বিদুষাং মতম্ ।

যদি শৈলর্ত্তুরাজ্যাদের্বর্ণনেনৈব তুষ্যতি ॥

গুণতঃ প্রাগুপন্যস্য নায়কং তেন বিদ্বিষাম্ ।

নিরাকরণমিত্যেষ মার্গঃ প্রকৃতিসুন্দরঃ ॥

বংশবীর্যশ্রুতাদীনি বর্ণয়িত্বা রিপোরপি।

তজ্জয়ান্নায়কোৎকর্ষকথনং চ ধিনোতি নঃ ॥ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫/১২৮-১৩৭

বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর ‘সাহিত্যদর্পণ’ নামক গ্রন্থে মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন:

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।

সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ ॥

একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবেঽপি বা।

শৃঙ্গার-বীর-শান্তানামেকেঽঙ্গী রস ইষ্যতে ॥

অঙ্গানি সর্বেঽপি রসাঃ সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ।

ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্ ॥

চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকং চ ফলং ভবেৎ।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা ॥
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাং চ গুণকীর্ত্তনম্ ।
একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ ॥
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
নানা বৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে ॥
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ।
সন্ধ্যা-সূর্য্যেন্দু-রজনীপ্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ ॥
প্রাতর্মধ্যাহ্ন-মৃগয়াশৈলর্ত্তুবনসাগরাঃ ।
সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ ॥
রণপ্রয়াণোপযমমন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ।
বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ ॥
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু ॥ সাহিত্যদর্পণ, ৬/৩১৫-৩২৪

অর্থাৎ সর্গবন্ধ পদ্যময় কাব্যই মহাকাব্য। এর নায়ক হবেন দেবতা, সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয় ধীরোদাত্তগুণসম্পন্ন কিংবা একই কুলে জাত, কুলীন বহু রাজাও নায়ক হতে পারেন। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের মধ্যে এর যে-কোনো একটি হবে অঙ্গীরস। অন্য সকল রস হবে অঙ্গরস। এতে থাকবে সকল নাট্যসন্ধিসমূহ। কোনো ঐতিহাসিক কিংবা সৎ ব্যক্তিকে অবলম্বন করে এর কাহিনি রচিত হবে। এতে চারিবর্গের কথা থাকবে এবং একটি বর্গ মুখ্যফলরূপে বর্ণিত হবে। এর প্রথমে নমস্কার, আশীর্বাদ বা বস্তুনির্দেশ থাকবে। কখনও বা খল ব্যক্তির নিন্দা এবং সৎ ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন থাকবে। একই ছন্দে প্রত্যেক সর্গ রচিত হবে, কেবল সর্গান্তে অন্য ছন্দের ব্যবহার হবে। এতে নাতিহ্রস্ব ও নাতিদীর্ঘ অষ্টাধিক সর্গ থাকবে। কোনো কোনো মহাকাব্যে নানা ছন্দে রচিত একটি সর্গ দেখা যায়। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়বস্তুর সূচনা থাকবে। সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রাত্রি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, প্রভাতকাল, মধ্যাহ্নকাল, মৃগয়া, পর্বত, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ,

যুদ্ধযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্রণা, পুত্রজন্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ যথাসম্ভব সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে বর্ণিত হবে। কবি, বিষয়বস্তু, নায়ক বা অন্য কারও নামে এর নামকরণ হবে। সর্গের বিষয়বস্তু অনুসারে সর্গের নামকরণ হবে।

এখানে উল্লেখ্য, মহাকাব্যের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে যে-সকল অলঙ্কারগ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, সেগুলি রামায়ণের অনেক পরে রচিত। এটা মনে করা যেতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক যে রামায়ণ-মহাভারতকে সামনে রেখেই আলঙ্কারিকেরা তাঁদের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করেছেন। ফলে এগুলির সঙ্গে রামায়ণের সাদৃশ্য থাকার সম্ভাবনাই বেশি। না-থাকলেও ক্ষতি নেই। মহাকাব্য হিসেবে রামায়ণের ব্যাপ্তি আরও বৃহৎ।

সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর 'সরল বাঙলা অভিধান' গ্রন্থে মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:

"যে কাব্যে কোন দেবতা বা অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের কিংবা এক বংশোদ্ভব বহু নৃপতির সবিস্তার বিবরণ লিখিত হয়, তাহার নাম মহাকাব্য। মহাকাব্যে প্রাকৃতিক বিবিধ দৃশ্য ও পরিবর্তন বর্ণিত থাকে এবং তাহাতে আটটির অধিক সর্গ থাকে।" (সুবলচন্দ্র, ১৯৮৪: ৩৬৭)

'সংসদ বাঙলা অভিধান'-এ মহাকাব্যের সংজ্ঞা প্রায় অনুরূপভাবে লিখিত: "মহাকাব্য হচ্ছে দেবতা বা দেবতুল্য নায়কের বৃত্তান্ত লইয়া অষ্টাধিক সর্গে রচিত পৌরাণিক কাব্য।" (শৈলেন্দ্র, ১৯৮৪: ৫৬৫)

পাশ্চাত্যে প্রকাশিত ইংরেজি অভিধানসমূহেও মহাকাব্যের এরূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে। যেমন: Websters's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language-এ বলা হয়েছে: Epic is noting or pertaining to a long poetic composition usually centered upon a hero, in which a series of great achievements or events is narrated in elevated style. (Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary, 1996:652)

Chambers 21st Century Dictionary গ্রন্থে মহাকাব্যের সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে এভাবে:

"An Epic is a long narrative poem telling of heroic acts, the brith and death of nations, etc." (Robinson, 2004:441)

মহাকাব্যের উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলির বৈশিষ্ট্য অনেকটা একই রকম এবং প্রায় সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রসম্মত।

W.H Hudson Epic বা মহাকাব্যের আলোচনায় মহাকাব্যকে 'primitive epic' এবং 'later epic'- এই দুই ভাগে ভাগ করে প্রথমোক্ত ভাগকে 'epic of growth' এবং দ্বিতীয় ভাগকে 'epic of art' নামে অভিহিত করেন। উক্ত দুই শ্রেণির আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

For purposes of historical study this again has to be sub-divided into primitive epic and later epic. The former of these has also been called the 'epic of growth', to mark the fact that unlike the 'epic of art', with which it is thus contrasted, it is not in its entirety the work of a single author, but to some extent the result of a process of evolution and consolidation, and that a large amount of pre-existing material, in the shape of floating legends and earliers folk-poems and sagas, is gathered up into its composition. An epic of this kind may, therefore, be regarded as the final product of a long series of accretions and syntheses; scattered ballads gradually clustering together about a common character into ballad-cycles (like the English Robin Hood cycle) and these at length being reduced to approximate unity by the intervention of conscious art. (Hudson, 1971:138)

মহাকাব্য হিসেবে রামায়ণ

মহাকাব্য হিসেবে রামায়ণ কতটা সার্থক তা এখন আলোচনা করা যাক। রামায়ণ সর্গবন্ধ। এটি সপ্তকাণ্ড বিশিষ্ট। এর কাণ্ডগুলি হলো: আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। এর আদিকাণ্ডে ৭৭টি সর্গ, অযোধ্যাকাণ্ডে ১১৯টি সর্গ, অরণ্যকাণ্ডে ৭৫টি সর্গ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ৬৭টি সর্গ, সুন্দরকাণ্ডে ৬৮টি সর্গ, যুদ্ধকাণ্ডে ১২৮টি সর্গ এবং উত্তরকাণ্ডে রয়েছে ১১১টি সর্গ । অর্থাৎ মোট ৬৪৫টি সর্গ রামায়ণে রয়েছে। মহাকাব্যের প্রারম্ভে থাকে আশীর্বাদ, ইষ্টদেবতার উদ্দেশে নমস্কার, অথবা বস্তুনির্দেশক শ্লোক। স্বয়ং ব্রহ্মা রামায়ণের যশ কামনা করে মহর্ষি বাল্মীকিকে আশীর্বাদ করেছেন: পুণ্যময় ও মনোরম রামকথা শ্লোকবদ্ধভাবে তুমি রচনা করো। পৃথিবীতে যতকাল

থাকবে পর্বতরাজি, যতকাল নদীসমূহ হবে বহমান, ততকাল প্রচারিত হবে তোমার রচিত রামায়ণীকথা।[১]

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হবে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। রামায়ণ অযোধ্যার বিখ্যাত রঘুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের জীবনালেখ্য। এর নায়ক রামচন্দ্র ছিলেন ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন। ঋষিকবি বাল্মীকি আদিকাণ্ডে রামচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন করেছেন এভাবে: মানব সমাজে তিনি রাম নামে পরিচিত। ইক্ষ্বাকুরাজার বংশে তাঁর জন্ম। তিনি সংযত অথচ বীর্যবান এবং ধৈর্যশীল। তিনি ইন্দ্রিয়গণকে সদা বশীভূত রাখেন। তিনি মহাত্মা, বুদ্ধিমান, নীতিনিষ্ঠ, বাগ্মী, শ্রীমান এবং শত্রুবিজয়ী। বিশাল তাঁর স্কন্ধদেশ। বাহুও তাঁর বিপুল। শঙ্খতুল্য উন্নত তাঁর গ্রীবা। সুপুষ্ট তাঁর হনু, বিশাল তাঁর বক্ষোদেশ। ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, প্রজাবর্গের কল্যাণে ধৃতব্রত, খ্যাতিসম্পন্ন, জ্ঞানী, পবিত্র, বশীভূতেন্দ্রিয় এবং যোগ সমাধিসম্পন্ন তিনি। প্রজাপতিতুল্য তিনি প্রজাবর্গকে সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। তিনি ঐশ্বর্যসম্পন্ন, সর্বজনের রক্ষক, শত্রুমর্দনকারী, সকল জীব-জগতের এবং ধর্মের সংরক্ষক।[২]

মহাকাব্যের গভীরতা, গাম্ভীর্য ও ঐশ্বর্য রামায়ণে বিদ্যমান। মহাকাব্যিক বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রাত্রি, দিবস, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, নগর, নদ-নদী, সমুদ্র, পর্বত, তপোবন, ঋতু, উদ্যানক্রীড়া, পুত্রজন্ম, বিবাহ, মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ, যুদ্ধাভিযান, যুদ্ধ, মধুপান, রতিউৎসব ইত্যাদি ঐশ্বর্যপ্রধান বর্ণনা রামায়ণে রয়েছে। আদিকাণ্ডের ৫ম সর্গে অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা, যুদ্ধকাণ্ডে রয়েছে রমণীয় লঙ্কার বর্ণনা ও কিষ্কিন্ধার বর্ণনা রয়েছে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে। অযোধ্যাকাণ্ডের ৯৪তম সর্গে চিত্রকূট পর্বতের মনোরম বর্ণনা, অরণ্যকাণ্ডের ১৫শ সর্গে পুষ্পশোভিত পঞ্চবটী বনের বর্ণনা রয়েছে। পম্পা সরোবরের তীরে শবরীর রমণীয় আশ্রমের বর্ণনা রয়েছে অরণ্যকাণ্ডের ৭৪ এবং ৭৫তম সর্গে। প্রাচীন ভারতবর্ষের নানা নদ-নদী তমসা, সরযূ, গঙ্গা, কৌশিকী, ইক্ষুমতী, বেদশ্রুতি, স্যন্দিকা, গোমতী, যমুনা, মন্দাকিনী, শরদণ্ডা, বিপাশা, শাল্মলী, সুদামা, হ্লাদিনী, শতদ্রু, কুলিঙ্গ, মাগধী, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি অপরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে রামায়ণে। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ২৮শ সর্গে বর্ষা, ৩০শ সর্গে নির্মল শরৎ এবং ১ম সর্গে কুসুমিত বসন্ত ঋতু আর অরণ্যকাণ্ডের ১৬শ সর্গে মনোরম হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা রয়েছে। আদিকাণ্ডের ৩৪শ সর্গে ও অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৯তম সর্গে নিস্তব্ধ নিশীথের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে।

আদিকাণ্ডের ১৮শ সর্গে রয়েছে অযোধ্যার নৃপতি দশরথের যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে পুত্রলাভের বর্ণনা। আদিকাণ্ডের ৭০-৭৩তম সর্গে রয়েছে অযোধ্যার রাজপুত্রদের সঙ্গে মিথিলার রাজকন্যাদের বিবাহের বর্ণনা। যুদ্ধকাণ্ডে রয়েছে যুদ্ধের বর্ণনা, যুদ্ধে রাবণের পরাজয় ও সবংশে মৃত্যুবরণ, রামের সীতা উদ্ধার, বিভীষণের লঙ্কার সিংহাসনে অভিষেক এবং রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন। উত্তরকাণ্ডে রয়েছে প্রজামনোরঞ্জনে রামকর্তৃক সীতাকে বনবাসে প্রেরণ, মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশের জন্ম, রাম-সীতার পুনর্মিলন, সীতার পাতাল প্রবেশ, সরযূনদীতে রামের আত্মবিসর্জন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, পিতৃসত্যপালনে সন্তানের একনিষ্ঠতা, প্রজানুরঞ্জনে রাজার ঐকান্তিকতা,দাম্পত্যপ্রেম, অনন্য ভ্রাতৃভক্তি প্রভৃতি নৈতিক শিক্ষার উজ্জ্বল নিদর্শন এই রামায়ণ। ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও মনোহারিত্বে, চিত্ররূপকল্প নির্মাণে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি বাল্মীকির অসীমশক্তি রামায়ণে বিধৃত।

রামায়ণ ধর্ম, অর্থ, কাম,ও মোক্ষের আধার। এ গ্রন্থ বহু রত্নপূর্ণ মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও শ্রুতিমনোহর।[৩] শুধু মহাকাব্য হিসেবে নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণ-মহাভারতকে ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস বলে স্বীকার করেছেন। এ দুটি মহাকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।" (রবীন্দ্রসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৪১৭:৭১২)।

মহাকাব্য হিসেবে রামায়ণ-মহাভারত কতটা সার্থক– সে সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'মহাকাব্যের লক্ষণ' প্রবন্ধে বলেন: "ইংরাজি এপিক্ শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই

রাখেন নাই। ... রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্বদা সম্মত হন না। প্রথমত এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব করা হয়। ... রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,– হয়ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই। রামায়ণ মহাভারতের কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেননা, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব কিরাতার্জ্জুনীয়কে আপাতত মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।" (রামেন্দ্রসুন্দর, ২০১৩:২৮৭)।

সার্বিকভাবে মহাকাব্যের বিভিন্ন সংজ্ঞার্থ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরিশেষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে বলা যায়, রামায়ণ এক মহান মহাকাব্য।

তথ্যসূত্র:

১. কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্ ।
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ॥
তাবদ্ রামায়ণীকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি ॥ আদিকাণ্ড, ২/৩৬-৩৭

২. ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশবী ॥
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্ ॥
প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা ॥ আদিকাণ্ড, ১/৮-৯,১২-১৩

৩. কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৩/৮

অন্যান্য মহাকাব্য ও রামায়ণ

রামায়ণ ও মহাভারত শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও এই দুই মহাকাব্যের স্থান অতি উচ্চে। রামায়ণে রামচরিত এবং মহাভারতে বিধৃত হয়েছে কৃষ্ণচরিত। উভয় মহাকাব্যের মধ্যে আদর্শগত অনেক সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও অনেক রয়েছে।

মহাভারতের ব্যাপ্তি অনেক বেশি। রামায়ণ সাত কাণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। মহাভারতে রয়েছে আঠারোটি পর্ব। আয়তনে মহাভারত রামায়ণের চার গুণ। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণিত। যার প্রধান কারণ রাবণকর্তৃক সীতাহরণ। রাবণ অযোধ্যার রাজপরিবারের কোনো আত্মীয় নন। তিনি দূরদেশবাসী লঙ্কার নৃপতি, রামচন্দ্রের অনাত্মীয়। রাবণ অধর্মের প্রতীক। মূলত রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধারের পাশাপাশি ধর্মকে সংস্থাপনের জন্য রাবণকে বধ করেছেন। পক্ষান্তরে মহাভারতে কুরুবংশের দুই পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে রাজ্যের অধিকার নিয়ে।

বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পরিবর্তে ভরতের রাজ্যাভিষেক হয়েছে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসী হয়েছেন। ভরত তাদের ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার জন্য তাঁর সিদ্ধান্তে অটুট রয়েছেন। সানন্দে বরণ করেছেন বনবাসের জীবন।

মহাভারতের যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশত্রুর চক্রান্তে কপট পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে ভাইদের ও স্ত্রী দ্রৌপদীকে নিয়ে বারো বছরের জন্য বনবাসী ও একবছরের জন্য অজ্ঞাতবাসী হয়েছেন। এখানে লক্ষণীয়, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির উভয়েই রাজ্যত্যাগ করে বনবাসী হয়েছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বনগমনে যতটা গৌরব রয়েছে, যুধিষ্ঠিরের ততটা নয়। কেননা রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের উদ্দেশ্যে বনবাসী হয়েছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের দুর্ভাগ্যের কারণ দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তি। শকুনির জুয়াখেলা যে জুয়াচুরি একথা জেনেও তিনি জুয়া খেলেছেন ।

সীতা ছিলেন বীর্যশুল্কা। জনকের রাজসভায় হরধনু ভঙ্গ করে রামচন্দ্র সীতার পাণিগ্রহণ করেন। সীতার মতো দ্রৌপদীও ছিলেন বীর্যশুল্কা। অর্জুন দ্রুপদরাজার সভায় লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে স্বয়ংবর সভায়

দ্রৌপদীকে জয় করেন। কিন্তু মায়ের আদেশে পঞ্চপাণ্ডব একসঙ্গে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র একপত্নীব্রত পালন করেছেন। কিন্তু অর্জুন শৌর্য-বীর্য-কৌশলে একাধিক পত্নীকে গ্রহণ করেছেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেবেরও দ্রৌপদী ভিন্ন অন্য পত্নীর উল্লেখ আছে।

সীতা মৃত্তিকাকন্যা। মাতা বসুন্ধরার মতো তাঁর ধৈর্য। তিনি কারুণ্যের প্রতিমা। আপন সতীত্বের প্রভায় চিরস্নিগ্ধ-পবিত্র-সাধ্বী নারী। তিনি স্বামীর বনবাস জীবনকে বিনাবিচারে সানন্দে নিজের ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে বনবাসী হয়েছেন। শান্তমূর্তি সীতার চরিত্রে আবার দীপ্ত তেজেরও স্ফুরণ ঘটেছে। বনগমনের সময় রামচন্দ্র যখন দুর্বিষহ বনবাস জীবনের ভয় দেখিয়ে সীতাকে বনগমনে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন, তখন সীতা বলেছেন: মূলত আপনি নারীরূপী পুরুষদেহ ধারণকারী। আপনাকে অনন্য ভেবে মিথিলারাজ আমার পিতা আপনাকে জামাতারূপে কেন যে বরণ করেছিলেন ! আপনি যদি আমায় বনে নিয়ে না যান, তাহলে লোকে মিথ্যা কথা রটাবে যে, সূর্যের মতো দীপ্ত হলেও মূলত রামচন্দ্রের মধ্যে কোনো তেজ নেই।[১] সীতাদেবীর নারীত্বের বহ্নিশিখা জেগে উঠেছিল পরিব্রাজকবেশী রাবণের প্রতি অগ্নিময়ী বাক্যজ্বালা বর্ষণ করার মধ্য দিয়ে। দুর্মতি রাবণ সীতাদেবীকে তার ভার্যা হওয়ার প্রস্তাব দিলে সীতা রাগান্বিত হয়ে রাবণকে অবজ্ঞা করে বলেন: তুমি সামান্য শৃগাল হয়ে আমার মতো সিংহীকে কামনা করছ ? আমি সূর্যকিরণতুল্য। আমাকে তুমি স্পর্শও করতে পারবে না। ওরে হতভাগা রাক্ষস, রামের প্রেয়সী ভার্যাকে তুমি আকাঙ্ক্ষা করছ ? তুমি কি সোনার গাছ দেখেছ ?[২]

দ্রৌপদীকে বলা যায় অগ্নিকন্যা। যজ্ঞ থেকে জন্ম বলে তাঁর নাম যাজ্ঞসেনী। তিনি সীতার চেয়ে বেশি প্রতিবাদী। পাণ্ডবদের অপমানে তিনি ক্ষুব্ধ। রাজসভায় অপমানিত হয়ে তিনি বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য প্রমুখ গুরুজনদের কটাক্ষ করেছেন। পাণ্ডবদের বনবাস জীবনকে তিনি নিয়তি হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। যদিও সীতার মতো তিনি স্বামীদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছেন। বনবাসী স্বামীদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। দ্রৌপদী কীচকের দ্বারা উৎপীড়িতা হয়েছেন। পাণ্ডবেরা নির্দ্বিধায় তাঁকে গ্রহণ করেছেন, তাঁর চরিত্র নিয়ে কোনো কটূক্তি করেন নি। কিন্তু রামচন্দ্র রাবণকর্তৃক অপহৃতা সীতাদেবীকে যথেষ্ট কটূক্তি করেছেন, লোকনিন্দার ভয়ে ত্যাগ করেছেন।

মহাভারতের মূলকথা ধর্ম – 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। মহাভারতের এই শিক্ষা ধর্মদর্শিনী গান্ধারী ও বিদুরের মুখে বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। রামায়ণের মূলকথা হলো সত্য। রামচন্দ্র বলেছেন: সত্যই ঈশ্বর। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। সবকিছুর মূলে সত্য।[৩] সত্যরক্ষা মানে ধর্মরক্ষা। সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া মানে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া। রামচন্দ্রের হাতে যে রাজদণ্ড তা প্রকৃতপক্ষে সত্যের মানদণ্ড। সত্যের এই মানদণ্ডের আলোকে রামচন্দ্র তাঁর জীবনে সমস্ত নীতি অনুসরণ করেছেন। সত্যরক্ষার জন্য রামচন্দ্র শোকার্ত বৃদ্ধ পিতার আর্তনাদ শোনেননি। কৈকেয়ীর দাবির পিছনে ন্যায় কি অন্যায়ের বিচার করেননি। সত্যরক্ষার জন্য রামচন্দ্র বালীবধ, প্রাণপ্রিয় সীতাকে ত্যাগ এবং লক্ষ্মণ-বর্জনের মতো কঠিন কর্ম করেছেন। নিজের শোকার্ত হৃদয়কে শাসন করে নিজেই বলেছেন– সত্যরক্ষায় আমি বজ্রের মতো কঠিন।

রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির দুজনের সত্যের আদর্শ অনেকটা এক হলেও শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই সত্য অন্যরূপ। তিনি কাম্যকবনে গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুধিষ্ঠিরকে প্রথমেই বলেছেন: আমি সেদিন দ্যূতসভায় উপস্থিত থাকলে ধর্মের নামে এমন অধর্ম হতে দিতাম না। তারা না শুনলে বলপূর্বক তাদের নিগ্রহ করতাম। আপনার জন্যই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক ও ধৃতরাষ্ট্রকে আনিয়ে দ্যূতক্রীড়ার বহু দোষ দেখিয়ে এভাবে দ্যূতক্রীড়া বারণ করে বলতাম, দ্যূতক্রীড়ার প্রয়োজন নেই।[৪]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা ভিন্ন। রামচন্দ্রের মতে যেভাবেই হোক সত্যরক্ষা অবশ্য করণীয়। শ্রীকৃষ্ণের মতে সত্যরক্ষা করতে গিয়ে যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে সেটা অধর্ম। সে সত্য মিথ্যা হয়ে যায়।[৫]

রামায়ণ-মহাভারতের সামগ্রিক পর্যালোচনায় ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এ বক্তব্য প্রদান করেছেন।

"মহাভারতের ভাষা বাল্মীকির ভাষা অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ ও কাব্যগুণান্বিত। অধিকাংশ শ্লোকই অনুষ্টুপ্ ছন্দে নিবদ্ধ, উপজাতি ইত্যাদি ছন্দেরও প্রয়োগ আছে। শ্লোকের মধ্যে ক্বচিৎ সরল গদ্যের মিশ্রণ ঘটেছে, তবে গদ্যাংশগুলি মূল রচনার অন্তর্গত ছিল কি না তৎসম্পর্কে দ্বিমত আছে। ক্ষুদ্র ও

বৃহদাকার কথোপকথন-সমন্বিত যেসব কাহিনী পাওয়া যায়, তাদের ভাষা নাট্যগুণসমন্বিত, ওজস্বী। পরপর কয়েকটি পর্বে যুদ্ধবর্ণনা এবং যুদ্ধশেষে বিধ্বস্ত রণভূমির বর্ণনায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মেলে। রামায়ণের তুলনায় প্রকৃতিবর্ণনা অপেক্ষাকৃত কম, বিপরীতভাবে ছোটবড় আখ্যান-আখ্যায়িকা অনেক বেশি। চরিত্রচিত্রণে মহাভারতকার বাল্মীকি অপেক্ষা অধিকতর সফল। ভীম ব্যতীত পাণ্ডবেরা ধীর, বিচক্ষণ ও ধর্মানুরাগী, ভীম কিঞ্চিৎ উদ্ধত ও অসংযত; কৌরবেরা অধার্মিক, হঠকারী ও অমর্ষপরায়ণ। বিদুর ও ভীষ্ম ধর্ম ও ন্যায়ের প্রতীক, অর্জুন ক্ষত্রিয় বীরের আদর্শ, কৃষ্ণ একদিকে মহামানব, ধর্মাত্মা, অবতার পুরুষ, উদারচেতা ও লোকহিতৈষী, অন্যদিকে কুটিলমতি, দুরভিসন্ধিপরায়ণ। অবশ্য সামগ্রিকভাবে রামায়ণ-মহাভারতের দুই নায়কচরিত্র রাম ও কৃষ্ণের মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।"

সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের মতো গ্রিক সাহিত্যে ইলিয়াড-অডিসি বিখ্যাত মহাকাব্য। হোমাররচিত এ দুটি মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যে স্থান অধিকার করে আছে। অডিসি রামায়ণের ন্যায় পারিবারিক ঘটনায় পরিকল্পিত। এ মহাকাব্যে তৎকালীন গ্রীক সমাজের নানা চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। নায়ক অডিসিউস প্রকৃতির হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। জীবনে নানা বাস্তব-অবাস্তব সংকটের বিরুদ্ধে তাকে নিরন্তর যুদ্ধ করতে হয়েছে। বিনা কারণেই তাঁর স্ত্রী হয়েছেন বিপদগ্রস্ত। তাঁর তরুণপুত্র টেলিমেকস একা সেই বিপদকে দূর করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি অসমর্থ। ট্রয়ের যুদ্ধশেষে নিজ রাজ্য ইথাকায় পৌঁছানো ছিল অডিসিউসের জীবনে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। দেবী কেলিপসো তাঁকে দেবত্ব ও অমরত্ব দান করতে চেয়েছিলেন ইথাকায় না যাওয়ার শর্তে। কেননা সমুদ্রযাত্রায় অনেক বিপদ অপেক্ষা করেছিল অডিসিউসের জন্য। তিনি বীরপুরুষ ও মহান মানব। তাই অতি সহজেই তিনি দেবী কেলিপসোর প্রলোভনমূলক প্রস্তাবকে অস্বীকার করে গেয়েছেন মানবতার জয়গান। তিনি বলেন– আমি মানুষ হয়ে থাকতে চাই, ইথাকা আমার জন্মভূমি, আমার কাঙ্ক্ষিত স্থান আর সেটাই আমার গন্তব্য। তাই দেবতার অমরত্ব আমার কাম্য নয়। অডিসিউস জানতেন, কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। তবুও বিপৎসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে তিনি পৌঁছেছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত মাতৃভূমিতে। কিন্তু দীর্ঘ নয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অডিসিউসের অনুপস্থিতির কারণে শত্রুদের দ্বারা তাঁর স্ত্রী-পুত্র বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁর তরুণপুত্র টেলিমেকস একা সেই বিপদকে দূর করার চেষ্টা

করেছেন। কিন্তু তিনি অসমর্থ। অডিসিউস সুকৌশলে যুদ্ধ করেছেন স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার জন্য। জীবনে দুঃখকে বরণ করার মধ্য দিয়ে অডিসিউস হয়ে উঠেছেন মহাকাব্যের মহানায়ক। রামায়ণের রামচন্দ্রও মহামানব, দেবতা নন। মহর্ষি নারদ কবি বাল্মীকির জিজ্ঞাসায় তাঁকে মহামানব রামচন্দ্রের জীবনকথা লিখতে বলেছিলেন। রামচন্দ্র শুধু সীতা উদ্ধারের জন্য নয়, ধর্মকে প্রতিষ্ঠার জন্যও রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। রামচন্দ্র সত্যরক্ষার জন্য বনবাসী হয়ে জীবনের দুঃখময় সুদীর্ঘ পথ চলার ক্লেশ সহ্য করেছেন।

ইলিয়ড মহাকবি হোমারের অনন্য সৃষ্টি। এর ঘটনা জটিল, সংগ্রাম কঠিনতর। মেনেলাওসের স্ত্রী হেলেন ট্রয়ের রাজকুমারকে ভালোবাসেন। হেলেনের সম্মতিতেই ট্রয়ের রাজকুমার তাঁকে হরণ করেন। হেলেনকে উদ্ধারের জন্য দুঃসহ দুঃখের পথ পাড়ি দিয়েছে মেনেলাওস। ট্রয়ের সিন্ধুতটে যুদ্ধশিবির। আগামেমনন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তার সঙ্গে রয়েছে বহুসংখ্যক নৌবাহিনী ও অনুগত সৈন্যদল। কিন্তু আকিলিস তুচ্ছ কারণে নিজের দলের প্রতি করলেন বিশ্বাসঘাতকতা। ট্রয়ের সমবেত যোদ্ধাদের তিনি যুদ্ধে নিরুৎসাহিত করলেন। আকিলিসের এমন যুদ্ধবিমুখতায় এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হলো। যুদ্ধ শুরু হলো। লোকক্ষয় হলো প্রচুর। ট্রোজানদের হাতে আকিলিসের প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু হলো। তখন বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য আকিলিস অস্ত্রধারণ করলেন। প্রবল যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ জয় করে হেলেনকে নিয়ে গ্রিকরা ফিরলেন স্বদেশে। দীর্ঘ নয় বছর ধরে যুদ্ধের ফলে ট্রয়ের বৃদ্ধরা একজন নারীর জন্য এই সর্বনাশা যুদ্ধটাকে ঠিক হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। কিন্তু যে মুহূর্তে রূপসী হেলেনকে তাঁরা দেখলেন, তখন তাঁরা যুদ্ধটাকে প্রাণশক্তির নিষ্ফল অপচয় বলে মনে করেননি।

Lean’d on the walls and bask’d before the sun

****

These, when the *Spartan* Queen apporoached the tow’r,
In secret own’d resistless Beauty’s Pow’r,
They cri’d, “No wonder, such Celestial Charms
For nine long Years have set the World in Arms;”

সেদিন সেই বৃদ্ধরা রূপসী হেলেনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন –

" She moves a Goddess, and she looks like a Queen."

Pope (1967), Iliad, Book III, pp. 200-201

রামায়ণে হনুমান সাগর উত্তীর্ণ হয়ে রাক্ষসপুরী তন্ন তন্ন করে খুঁজে অশোক বনে সীতাকে প্রথম দেখে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে বলে উঠেছিলেন: এই মহীয়সী সীতার জন্য রাম যদি সসাগরা পৃথিবী এবং এবং সমগ্র বিশ্ব পর্যুদস্ত করতেন, আমার বিবেচনায় তাও উপযুক্ত হতো। ত্রিজগতের রাজ্য এবং জনকদুহিতা সীতার মধ্যে যদি তুলনা করা যায়, তাহলে ত্রিলোকের সমগ্ররাজ্য সীতার ষোলো ভাগের একভাগেরও সমান হবে না।[৬]

রামায়ণ ও ইলিয়ডের উল্লিখিত দুটি ঘটনার পরিস্থিতির পার্থক্য আছে। দৃষ্টিভঙ্গীরও পার্থক্য আছে। কিন্তু মহাবিস্ময়ে সকল বিতর্কের অবসান এখানে উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবেই ঘটেছে। রামায়ণে রাবণ সীতাকে জোর করে হরণ করেছেন। সীতাহরণকালে সীতার কান্নায়, তাঁর আর্তচীৎকারে সমস্ত প্রকৃতি কেঁদে উঠেছে। সীতার কান্নায় সবাই কেঁদেছে। কিন্তু ইলিয়ডের হেলেন স্বেচ্ছায় ট্রয়ের রাজকুমারদ্বারা অপহৃত হয়েছেন। যে হেলেন স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছেন, তাঁকে উদ্ধারের জন্য অগণ্য গ্রিকসৈন্য অকারণে জীবন দিয়েছে। রক্তস্নাত হয়েছে ট্রয় নগরী। রামায়ণের সীতাদেবী পবিত্র, সতী-সাধ্বী তিনি। তাঁকে উদ্ধারের জন্য রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অজস্র বানরসৈন্য। অধর্মের প্রতীক রাবণ নিহত হয়েছেন রামচন্দ্রের হাতে। শুধু সীতা উদ্ধারের জন্য নয়, ধর্মকে সংস্থাপনের জন্য রাম-রাবণের যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। তাই রাবণবধের পর দেবতাদের মনে অধর্ম পতনের ও ধর্মসংস্থাপনের স্বস্তি এসেছে।

রামায়ণে বীরত্বপ্রকাশে উপমা-উৎপ্রেক্ষা, বিভিন্ন অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন কবি বাল্মীকি। তিনি মানুষের বীরধর্মের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন অরণ্যের হিংস্র পশু সিংহ-ব্যাঘ্রের মধ্যে। যুদ্ধক্ষেত্রে রাম-রাবণ যেন পরস্পর মুখোমুখি দৃপ্ত সিংহ–"পরস্পরাভিমুখয়োর্দৃপ্তয়োরিব সিংহয়োঃ"। (যুদ্ধকাণ্ড, ১০৬/১৯)। সিংহের বিক্রম হোমারের কবি-মানসকেও আকৃষ্ট করেছে। তাই ইলিয়ডে বীর ইনিসের তুলনা করা হয়েছে সিংহের সাথে। একীয় সৈন্যগণ প্যান্ডোরাসের মৃতদেহ থেকে তাকে বঞ্চিত করে,

এই ভয়ে ইনিস ঢাল বর্শাসহ শকট থেকে লাফিয়ে পড়েন। তখন তিনি শক্তিমত্ত সিংহের মতো ভীষণ হুঙ্কার ছেড়ে মৃতদেহ আগলে রইলেন যে-কোনো আগন্তুককে বাধা দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে:

To guard his slaughter'd friend Eneas lies,
His spear extending where the carcass lies;
Watchful he wheels, protects it every way,
As the grim lion stalks around his prey. - lliad

ইলিয়ডে ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস পরস্ত্রীহরণ করেছেন সত্য, কিন্তু সেখানে পরস্ত্রী হেলেনের সম্মতি ছিল। যুদ্ধে এসে বীরের পক্ষে অস্ত্রসংবরণ করা অন্যায়, এটা বীরের ধর্ম নয়। কিন্তু বীর আকিলিস তাঁর বীরধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন। যাকে বলা যেতে পারে বিশ্বাসঘাতকতা। এভাবে ইলিয়ডের মূল কাহিনির সূত্রগুলি যথেষ্ট জটিল রূপ ধারণ করেছে। যদিও সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিচিত্র সংঘাতে পূর্ণ এ মহাকাব্য, তবুও সহজ সমাধান এতে বর্ণিত হয় নি। কিন্তু গ্রিকদের মধ্যে নানা জটিল প্রতিযোগিতা, ট্রোজানদের ধর্ম-বিপর্যয়ের অবস্থা, মৃত্যুকালেও বিভিন্ন বীরের বীরধর্ম সম্পর্কে নানা সচেতনতা, নানা মানবিক মূল্যবোধে এ মহাকাব্যটি বিশ্বসাহিত্যে অসাধারণ স্থান দখল করেছে।

ইলিয়ডের মতো রামায়ণেও বীরধর্মের জয়গান করা হয়েছে। রামায়ণে উল্লেখ আছে, যুদ্ধকালে বীরধর্ম পরিত্যাগ করে পালানো অকীর্তিকর। অঙ্গদ বানরসেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে আশ্বাসদান করতে গিয়ে বলেছেন: ভীরুরাই ধিক্কারের জীবন যাপন করে। তাই সৎপুরুষদের দ্বারা অনুসরণীয় বীরপন্থা গ্রহণ করো। ভয় ত্যাগ করো। পৃথিবীতে অল্পকাল জীবিত থেকে যুদ্ধে নিহত হলে আমাদের ব্রহ্মলোকে গতি হবে। কিন্তু কাপুরুষেরা কখনও ব্রহ্মলোক লাভ করতে পারে না।[৭]

রামায়ণের মতো মহাভারতেও বীরধর্মের প্রশংসা করা হয়েছে। মহাভারতের কর্ণপর্বে উল্লেখ আছে, যুদ্ধরত অবস্থায় সম্মুখমৃত্যু সুখজনক এবং এটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।[৮] শান্তিপর্বে বীরধর্মের প্রশংসা করে বলা হয়েছে– যুদ্ধে বিপক্ষমধ্যে মহামারি ঘটিয়ে, জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত থেকে, বিপক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে আহত হয়ে, মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের ধর্ম। বীরপুরুষ যেখানে যেখানে শত্রুগণে পরিবেষ্টিত হয়ে অকাতরে নিহত হন, সেস্থান থেকেই তিনি স্বর্গলাভ করেন।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১. কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্ ॥
অনৃতং বত লোকেঽয়মজ্ঞানাদ্ যদি বক্ষ্যতি।
তেজো নাস্তি পরং রামে তপতীব দিবাকরে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০/৩-৪

২. ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্ ।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥
পাদপান্ কাঞ্চনান্নুনং বহূন্ পশ্যসি মন্দভাক্ ।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যাং যস্তুমিচ্ছসি রাক্ষস ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৭/৩৭-৩৮)।

৩. সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১৩।

৪. বারয়েয়মহং দ্যূতং বহূন্ দোষান্ প্রদর্শয়ন্ ।
ভীষ্মদ্রোণৌ সমানায্য কৃপং বাহ্লীকমেব চ ॥
বৈচিত্রবীর্য্যং রাজানমলং দ্যূতেন কৌরব।
পুত্রাণাং তব রাজেন্দ্র ! ত্বন্নিমিত্তমিতি প্রভো ॥ বনপর্ব, ১২/৩-৪

৫. ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ কর্ণপর্ব, ৫১/৩১

৬. যদি রামঃ সমুদ্রান্তাং মেদিনীং পরিবর্তয়েৎ।
অস্যাঃ কৃতে জগচ্চাপি যুক্তমিত্যেব মে মতিঃ ॥
রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু সীতা বা জনকাত্মজা।
ত্রৈলোক্যরাজ্যং সকলং সীতায়া নাপ্নুয়াৎ কলাম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১৬/১৩-১৪

৭. ভীরোঃ প্রবাদাঃ শ্রূয়ন্তে যস্তু জীবতি ধিক্কৃতঃ।
মার্গঃ সৎপুরুষৈর্জুষ্টঃ সেব্যতাং ত্যজ্যতাং ভয়ম্ ॥
শয়ামহে বা নিহতাঃ পৃথিব্যামল্পজীবিতাঃ।
প্রাপ্নুয়ামো ব্রহ্মলোকং দুষ্প্রাপঞ্চ কুযোধিভিঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৬/২৩-২৪

৮. বিপ্রযাতাংস্তু নো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতকিল্বিষান্।
অনুসৃত্য বধিষ্যন্তি শ্রেয়ান্ নঃ সমরে বধঃ ॥
সুখঃ সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ যুধ্যতাম্ ।
মৃতো দুঃখং ন জানীতে প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে ॥ কর্ণপর্ব, ৬৭/৬৯-৭০

৯. রণেষু কদনং কৃত্বা জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
তীক্ষ্ণৈঃ শস্ত্রৈরভিক্লিষ্টঃ ক্ষত্রিয়ো মৃত্যুমর্হতি ॥
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবারিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি দৈন্যং ন সেবতে ॥ শান্তিপর্ব, ৯৪/২৮,৩২

Dhaka University Institutional Repository

রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্ব

রামায়ণ ও মহাভারত শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও অন্যতম দুই মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্যের পৌর্বাপর্ব নির্ণয়ে অনেক বিতর্ক আছে। পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর মনে করেন, কেউ আবার মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলে মনে করেন। মহাভারতের কাহিনিকে যাঁরা রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর মনে করেন, তাঁদের যুক্তি হলো:

ক. ঋগ্বেদে উল্লিখিত দিবা ও নিশা সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চ' – এখানে কৃষ্ণ ও অর্জুন দুটি বর্ণের পরিচায়ক হলেও মহাভারতের বিখ্যাত চরিত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও অর্জুনের উল্লেখ মহাভারতের প্রাচীনত্বকে নির্দেশ করে।

খ. অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের কোনো কোনো চরিত্র বা বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে ভারত নামে রণপ্রিয় জাতির উল্লেখ আছে। কৌরব-পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ 'ভরত' মহাভারতের একটি চরিত্র। অথর্ববেদে পরীক্ষিতের রাজ্য কুরুদেশের সমৃদ্ধির কথা আছে। কাঠক-সংহিতায় ধৃতরাষ্ট্র, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ব্যাস পারাশর্য ও বৈশম্পায়ন এবং সামবিধান ব্রাহ্মণে ব্যাস পারাশর্য নামগুলির উল্লেখ আছে। আশ্বলায়ন ও শাঙ্খ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে মহাভারত নামটি উক্ত। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রে মহাভারতের শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

গ. পাণিনির ব্যাকরণে 'বাসুদেব' ও 'অর্জুন' নাম পাওয়া যায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কুরু-পাণ্ডবের' উল্লেখ আছে। কিন্তু অষ্টাধ্যায়ী কিংবা মহাভাষ্যে রামায়ণের কিছু উল্লেখ নেই।

ঘ. বৌদ্ধদের জাতক কাহিনিতে (দশরথজাতক, ঘটজাতক প্রভৃতি), অশ্বঘোষের (খ্রি.পূ.১ম শতাব্দী) রচনায়, কুমারলাতের (খ্রি.পূ. ২য় শতাব্দী) 'কল্পনা-মণ্ডিতিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে রামায়ণের উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থগুলি পাণিনি ও পতঞ্জলির গ্রন্থের চেয়ে অর্বাচীন। তাই এ থেকে অনুমিত হতে পারে যে রামায়ণের পূর্বে মহাভারত রচিত হয়েছে।

ওয়েবার, য়াকোবি, ম্যাকডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিত মহাভারতকে রামায়ণের পূর্বে রচিত বলে সমর্থন করেন।

কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে রামায়ণের রামচন্দ্র ত্রেতা যুগের অবতার। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগের অবতার। এই যুগ অনুসারে বিচার করলে রামায়ণ মহাভারতের পূর্বে রচিত হয়েছে।

রামায়ণ মহাভারতের পূর্বে রচিত হয়েছে– এর প্রধান প্রমাণ হলো মহাভারতে রামায়ণের কাহিনির উল্লেখ আছে। কিন্তু রামায়ণে কোথাও মহাভারতের কাহিনি উল্লিখিত হয়নি। মহাভারতের বনপর্বে, দ্রোণপর্বে ও শান্তিপর্বে রামায়ণের কাহিনি রয়েছে। মহাভারতে রামায়ণের মূল অংশ হতে একটি শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে। রামায়ণের ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে মহাভারতের বনপর্বে রামোপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। ম্যাক্সমূলার মহাভারতকে রামায়ণের পরবর্তী মহাকাব্য বলেছেন:

" But the original traditions of the Pandavas break through now and then, and we can clearly discern that the races among whom the five principal heroes of the Mahabharata were born and fostered, were by no means completely under the sway of the Brahmanical law. How is it, for instance, that the five Pandava Princes, who are at first represented as receiving so strictly Brahmanical education- who if we are to believe the poet, were versed in all the sacred literature, grammar, Metre, astronomy, and law of the Brahmanas-could afterwards have been married to one wife, this is in plain opposition to the Brahmanic law, where it is said, "there are many wives of one man not many husbands of one wife." Such a contradiction can only be accounted for by the admission, that in this case, epic tradition on the mouth of the people was too strong to allow this essesntial and curious feature in the life of its heroes to be changed. (A History of Ancient Sanskrit Literature, Max Muller. p. 43)

রামায়ণ ও মহাভারতের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে অধ্যাপক উইন্টারনিৎসও মহাভারতে রামোপাখ্যানের ও রামায়ণ রচয়িতা ঋষি বাল্মীকির উল্লেখ থাকার কারণে রামায়ণকে মহাভারতের পূর্ববতী বলে উল্লেখ করেছেন:

" A definite answer could be given, namely that our present Ramayana is older than the Mahabharata in its present form. As regards the second question, we may answer that the

Ramayana being so much shorter, required a shorter time for its gradual growth than the Mahabharata." (A History of Indian Literature, Winternitz, pp. 442-43)

রামায়ণের সমাজের সাথে বৈদিক যুগের আরণ্য সমাজের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আরণ্য সভ্যতা সহজ সরল জীবনধারায় ব্যাপৃত ছিল। রামায়ণে তিনটি সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য সভ্যতা (অযোধ্যাকেন্দ্রিক), বানর সভ্যতা (আরণ্য সভ্যতা) ও রাক্ষস সভ্যতা (দ্রাবিড় সভ্যতা)। রামায়ণে উল্লিখিত সভ্যতা মহাভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন। মহাভারতীয় সভ্যতা যথেষ্ট অর্বাচীন।

মহাভারতীয় রাজনীতি, দর্শন, যুদ্ধনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি রামায়ণ অপেক্ষা জটিল ও বহুমুখী। রামায়ণের যুগে অযোধ্যা হতে দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত কোনো রাজত্ব ছিল না। দক্ষিণাপথে ছিল বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি – যেখানে মাঝে মাঝে শান্ত তপোবনের দর্শন পাওয়া যায়। রামচন্দ্র বনগমনের সময় ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম হতে যথক্রমে চিত্রকূট পর্বত (মাল্যবতী নদীর তীরে অবস্থিত), অত্রি মুনির আশ্রম, শরভঙ্গমুনির আশ্রম, সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রম, দণ্ডকারণ্যে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে অবস্থান করে সেখান থেকে গোদাবরী নদীতীরে পঞ্চবটী বনে কিছুদিন বাস করেন। এই পঞ্চবটী বর্তমানে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায় অবস্থিত। সীতাহরণের পর রাম-লক্ষ্মণ পঞ্চবটী হতে দণ্ডকারণ্যের মধ্যদিয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে আসেন। এই ঋষ্যমূক পর্বতেই বানর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম হতে ঋষ্যমূক– এই বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল পাহাড়, নদী ও অরণ্যে পূর্ণ। এই সুদীর্ঘ পথে কোনো নগর বা রাজত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং এই আরণ্য জীবনে বর্ণিত হয়েছে বহু রাক্ষসের উপদ্রব এবং ভীষণ বন্যজন্তুপূর্ণ ভূভাগের রূপচিত্র।

রাম-রাবণের যুদ্ধশেষে বিজয়ী রামচন্দ্র পুষ্পক রথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথে সীতাদেবীকে যে সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখিয়েছিলেন– সেগুলি হলো লঙ্কা (সর্ব দক্ষিণে), সেতুবন্ধ, কিষ্কিন্ধা, ঋষ্যমূকপর্বত, পম্পাসরোবর, জনস্থানে জটায়ুর নিবাসস্থান, পঞ্চবটী, অগস্ত্যাশ্রম, শরভঙ্গাশ্রম, কুলপতি অত্রির আশ্রম, চিত্রকূট, যমুনা ও ভরদ্বাজাশ্রম। লক্ষণীয়, লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধা ব্যতীত এখানে কোনো নগর বা জনপদের উল্লেখ নেই। এতে এটা অনুমিত হয় যে, রামায়ণের যুগে অযোধ্যা হতে দক্ষিণাপথে

কিষ্কিন্ধা ও সমুদ্রের পরপারে রাক্ষসরাজ্য লঙ্কা ব্যতীত কোনো প্রসিদ্ধ জনপদ গড়ে ওঠেনি। এদিক দিয়ে বৈদিক আরণ্যক সভ্যতার সাথে রামায়ণের আরণ্য জীবনের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু মহাভারতে আর্যাবর্তের বিচিত্র নগর সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের সভ্যতা সমগ্র ভারতের বিশাল অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত। মহাভারতের সামাজিক আদর্শ ও বিচিত্রমুখী রীতিনীতি, ভেদবৈচিত্র্যময় জাতি ও রাষ্ট্রের পরিচয় রামায়ণ অপেক্ষা অর্বাচীন বলেই মনে হয়। এভাবে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে মহাভারত রামায়ণের পরে রচিত হয়েছে বলেই আমাদের অভিমত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রামায়ণের রাজনীতি

কোনো সভ্যসমাজের সুস্থিতির জন্য পরিকল্পিত সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি একটি অবশ্য পালনীয় বিষয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রনীতির কথা জানা যায়। প্রথম প্রাপ্ত সাহিত্য ঋগ্‌বেদ সংহিতায়ও রাষ্ট্রের উল্লেখ পরিদৃষ্ট। মূলত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা, সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানুষের জীবনমান, শান্তি ইত্যাদি। রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সর্বত্র রাষ্ট্রনীতির কথা বিশদ আলোচিত হয়েছে। এ সকল গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রনীতি তথা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভীপ্সা পরিলক্ষিত। 'রামায়ণের রাজনীতি' নামক এই অধ্যায়ে আদর্শ রাজার গুণাবলি, ব্যর্থ রাজার স্বরূপ, অরাজক রাজ্যের দুরবস্থা, আদর্শ রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, রামরাজ্যসহ রামায়ণে উল্লিখিত কতিপয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

আদর্শ রাজার গুণাবলি

'রাজা' শব্দটির ব্যবহার বহু প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০/৩০০০ অব্দে ঋগ্‌বেদে এ শব্দটি দৃষ্ট। মূল শব্দ রাজন্ (পুংলিঙ্গ) রাজ্ + কনিন্ । রঞ্জনার্থ রাজ্ ধাতু হতে রাজা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। রাজা বা রাজন্ শব্দের মধ্যে একটি আদর্শের ব্যাপার রয়েছে। যিনি প্রজারঞ্জন অর্থাৎ প্রজার মনোরঞ্জন করেন তিনিই রাজা। যিনি প্রজাবিরোধী, প্রজাপীড়ক তিনি রাজশব্দবাচ্য নন। রামায়ণ এবং মহাভারতে 'রাজা' শব্দের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিকের যথার্থ রূপ দেখা যায়। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, রাজাকে অবশ্যই আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। একজন আদর্শ রাজাকে আত্মিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রশাসনিক কর্মে পারদর্শী হতে হয়। আদর্শ মানুষ হওয়াই আদর্শ রাজা হওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান কর্তব্য

প্রজাদের মঙ্গলচিন্তায় রাজাকে সর্বদা ব্যপৃত থাকতে হয়। যাঁর শাসনে প্রজাগণ নিরুদ্বেগে ও আনন্দে জীবন-যাপন করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। কেননা প্রজারঞ্জনই রাজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। রাজা

দশরথের মৃত্যুর পর নৃপতিহীন কোশল রাজ্যে দ্রুত অন্য কোনো ইক্ষ্বাকুবংশীয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য মার্কণ্ডেয় প্রমুখ মুনি ঋষি বশিষ্ঠকে অনুরোধ জানান। আলোচনা প্রসঙ্গে তখন তাঁরা বলেন: প্রজাকল্যাণে রাজা সর্বদা আত্মনিয়োগ করবেন। সত্য ও ধর্মের চেতনায় তিনি রাষ্ট্রের কল্যাণে সদা নিবেদিত থাকবেন। রাজাই সত্য ও ধর্মের মূর্তরূপ। তিনি কুলধর্মে সচেতনদের কুল-স্বরূপ। তিনি মাতা-পিতার ন্যায় প্রজাদের কল্যাণকারী। মহৎ কর্মের দ্বারা যম, কুবের, ইন্দ্র এবং বীর্যবান বরুণকেও তিনি অতিক্রম করেন। রাজাই ভালো-মন্দ, সৎ-অসতের বিভাজক।[১] যে রাজা সদা সতর্ক, সর্বজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ, সে রাজাই চিরকাল থাকেন। স্থূলচোখে ঘুমিয়ে থাকলেও নীতিরূপ চোখে যিনি জেগে থাকেন, যাঁর ক্রোধ ও প্রসন্নতা কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেই রাজাই জনগণের দ্বারা পূজিত হন।[২]

সর্বদা প্রজাদের রক্ষা করা রাজকর্তব্য

রাজা জনগণের পরম আশ্রয়। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ থেকে রক্ষা করা রাজার অন্যতম কর্তব্য। বনবাসকালে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে মুনিদের আশ্রমে পৌঁছালে তাঁরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে রাক্ষসদের উৎপাত থেকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করে বলেন: হে রাঘব, আপনি পূজনীয়, মাননীয়। আপনি রাজা এবং গুরু। দুর্জনের জন্য আপনি দণ্ডধারণ করেন। ইন্দ্রের চতুর্থ অংশরূপে আপনি প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন। সেজন্য রাজাকেই সবাই নমস্কার করে। তিনি রমণীয় শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করেন। আপনার রাজ্যে আমরা বাস করি। সেটা বনই হোক বা নগরই হোক। আপনি জনেশ্বর। আমাদের রক্ষা করা আপনারই কাজ।[৩] রাক্ষসদের পীড়ন থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য শরভঙ্গ মুনির আশ্রমের বানপ্রস্থিগণ রামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করে বলেন: হে নাথ, যিনি প্রজাদের কাছ থেকে তাদের উপার্জনের ছয়ভাগের একভাগ কররূপে গ্রহণ করেন, অথচ তাদের পুত্রের মতো রক্ষা করেন না, সেই রাজার অত্যন্ত অধর্ম হয়। হে রাম, যিনি রাজ্যবাসী সকলকে নিজের প্রাণের মতো অথবা প্রাণের চেয়েও অধিকতর প্রিয় পুত্রের মতো অতন্দ্রভাবে সর্বদাই রক্ষা করেন, তিনি বহুবর্ষ বেঁচে থেকে অনন্ত কীর্তিলাভ করেন এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে মহিমান্বিত হন।[৪]

অন্যায়কারীকে দণ্ডবিধান রাজকর্তব্য

রাজা পিতৃস্নেহে তাঁর প্রজাদের পালন করবেন, কিন্তু অন্যায়কারীকে দণ্ডবিধান করা অবশ্যই রাজকর্তব্য। একজনের পাপের দণ্ড যেন অন্যকে স্পর্শ না করে সে সম্পর্কে রাজাকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে।

সীতাহরণের পর সীতাকে না পেয়ে রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন: যদি দেবতারা সীতাকে আমার কাছে ফিরিয়ে না দেন, তাহলে আমি দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, সর্প সমস্ত জগৎকে ধ্বংস করব।[৫] তখন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজকর্তব্য স্মরণ করিয়ে বলেন: একজনের দোষের জন্য বহুলোককে ধ্বংস করা উচিত নয়। রাজা কোমল স্বভাব এবং প্রশান্তচিত্ত হবেন। যোগ্যতা বিচার করেই তাঁরা দণ্ড দেন।[৬]

রামের বাণের আঘাতে মুমূর্ষু বালী রামচন্দ্রকে অন্যায়কারীর দণ্ডবিধান সম্পর্কে বলেন: সাম,দান, ক্ষমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য, পরাক্রম এবং অন্যায়কারীদের প্রতি দণ্ডবিধান– এগুলি রাজার গুণ। নীতি, বিনয়, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ এই রাজধর্মগুলি রাজাকে অসংকোচে পালন করতে হবে। রাজাদের ইচ্ছামতো চলা উচিত নয়।[৭] কোন ধরণের অন্যায়কারীকে বধ করা রাজকর্তব্য– এ সম্পর্কে মুমূর্ষু বালীকে রামচন্দ্র বলেন: যে ব্যক্তি কামের তাড়নায় নিজের কন্যা, ভগ্নী বা ছোট ভাইয়ের পত্নীতে গমন করে তাকে বধ করা শাস্ত্রের নিয়ম, রাজকর্তব্য।[৮]

পাপীদের শাসন না করলে সেই পাপ রাজাকে স্পর্শ করে

একজন আদর্শ রাজা অন্যায়কারীকে অবশ্যই দণ্ডবিধান করবেন। অন্যায়কর্ম, পাপকর্মকে রাজা কোনো ভাবেই প্রশ্রয় দেবেন না। অন্যায়কারী, পাপীকে দণ্ডদান সম্পর্কে মুমূর্ষু বালীকে রামচন্দ্র বলেছেন: মানুষ পাপ করলে রাজা দণ্ডদান করেন। তাতে পুণ্যবান ব্যক্তিদের মতো নির্মল হয়ে তাঁরা স্বর্গে গমন করেন। কিন্তু রাজা যদি শাসন না করেন, সেই পাপ তখন তাঁকেই স্পর্শ করে।[৯]

মিথ্যা অভিযুক্ত ব্যক্তির অশ্রুধারায় রাজার অমঙ্গল

রাজা ন্যায় বিচার করবেন। অভিযুক্ত অপরাধী প্রকৃত অন্যায় করেছে কি না তা রাজাকেই নির্ণয় করতে হবে। এ সম্পর্কে রামচন্দ্র ভরতকে রাজনৈতিক উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন: রাজা যদি যাচাই না করে মিথ্যা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেন, তাহলে তার অশ্রুধারা রাজার পুত্র ও পশুকে ধ্বংস করে।[১০]

ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের যথাকালে সেবা করা রাজকর্তব্য

বানরসৈন্যদের নিয়ে লঙ্কায় যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলেন: ধর্ম, অর্থ ও কাম যথোচিতকালে যিনি সেবা করেন, ঠিকমতো ভাগ করে যিনি ব্যবহার করেন, তিনিই যথার্থ রাজা। যিনি

শত্রুদের বধে এবং মিত্রদের সংগ্রহে নিরত থাকেন– সেই রাজা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের ফল ভোগ করতে পারেন।[১১]

অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি, চতুর্বল এবং চতুর্দশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি রাজকার্যের উপযোগী

সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করার জন্য রাজাকে অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি, চতুর্বল ও চতুর্দশ গুণসমপন্ন হতে হতো। বালীপুত্র যুবরাজ অঙ্গদের এ গুণগুলো ছিল।[১২] অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি হলো– শোনার ইচ্ছা, শোনানো, শুনে সারাংশ গ্রহণ করে তা ধারণ করা, তর্ক-বিতর্ক করা, অর্থ ও তাৎপর্যের প্রকৃত বোধ এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। চতুর্বল হলো– সাম, দান , ভেদ ও দণ্ড। চতুর্দশ গুণ হলো– দেশ ও কালের জ্ঞান, দৃঢ়তা, সমস্ত ক্লেশ সইবার ক্ষমতা, সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা, চতুরতা, উৎসাহ, বল, মন্ত্রণা বিষয়ে গোপন রাখা, পরস্পরবিরোধী বাক্য না বলা, বীরত্ব, নিজের ও শত্রুর সম্বন্ধে জ্ঞান, শরণাগত বাৎসল্য, অমর্ষশীলতা এবং অচঞ্চলতা অর্থাৎ স্থিরতা ও গম্ভীরতা।

বানরসৈন্য নিয়ে রামচন্দ্র লঙ্কায় প্রবেশ করলে রাবণের মাতামহ মাল্যবান শ্রীরামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জন্য রাবণকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: যে রাজা চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে রাজনীতি শাস্ত্র অনুসরণ করেন, তিনি শত্রুদের শাসন করে বশীভূত করতে পারেন। তখন তিনি লাভ করেন চিরন্তন ঐশ্বর্য। তাঁর উচিত কাল বিবেচনা করে শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা। তাতে নিজের পক্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য লাভ করবেন। শত্রুর থেকে নিজে হীনবল হলে সেই শত্রুর সঙ্গে এবং সমান বলশালীর সঙ্গেও রাজার সন্ধি করা উচিত। শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। শত্রুর থেকে নিজে শক্তিতে বড় হলেই শুধু যুদ্ধ করা উচিত।[১৩]

নিদ্রার বশীভূত না হওয়া

রাজাকে অতি নিদ্রা ত্যাগ করতে হয়। যথাসময়ে ঘুম থেকে ওঠা রাজার দায়িত্ব। বনভূমি থেকে ফিরিয়ে আনতে গেলে রামচন্দ্র ভরতকে রাজার দায়িত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে প্রশ্ন করেছেন: তুমি কখনও নিদ্রার বশীভূত হও না তো? যথাসময়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠো তো?[১৪]

শেষ রাত্রিতে অর্থচিন্তন

রাত্রির শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়ে স্থিরচিত্তে অর্থের কথা চিন্তা করা উচিত।[১৫]

অগ্নিহোত্র, দান ও পুরোহিতকে সৎকার

রাজা অগ্নিহোত্র হোমের অনুষ্ঠান দ্বারা নিত্য বেদপাঠ করবেন। ধনদানে পুরোহিতকে সৎকার করবেন। বনভূমি থেকে ফিরিয়ে আনতে গেলে ভরতকে রামচন্দ্র বলেছেন: বিনয়ী, সদ্‌বংশজাত, পণ্ডিত, অসূয়াহীন, তপোধন, সত্যদ্রষ্টা তোমার পুরোহিতকে সৎকার করো তো? তোমার যজ্ঞে অগ্নিহোত্র কর্মে নিযুক্ত, শাস্ত্রবিধি যিনি জানেন, বুদ্ধিমান, সরলচরিত্র পুরোহিত যজ্ঞের পরে এবং পূর্বের করণীয় সম্বন্ধে তোমায় অবহিত করেন তো? [১৬]

যথোচিত কার্যবিভাজন ও দায়িত্ব প্রদান

যোগ্যতা অনুসারে কর্মীদের মধ্যে কার্য বিভাজন রাজার অন্যতম প্রশাসনিক দায়িত্ব। কর্মীর যোগ্যতা বুঝে রাজা তাদের কাজের দায়িত্ব দেবেন। রামচন্দ্র ভরতকে তাই জিজ্ঞাসা করেছেন: বৎস, তুমি বড় কাজে প্রধান কর্মীদের, মধ্যম কাজে মধ্যম কর্মীদের এবং সাধারণ কাজে সাধারণ কর্মীদের নিয়োগ করেছ তো? [১৭]

গুপ্তচর নিয়োগ

গুপ্তচর নিয়োগ রাজার অন্যতম দায়িত্ব। গুপ্তচর নিয়োগে ব্যর্থতা থাকলে এবং গুপ্তচরদের কাছ থেকে যথাসময়ে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা না জানতে পারলে সেই রাজার রাজ্যসঙ্কট অবধারিত। জনস্থানে রামকর্তৃক খর-দূষণসহ রাক্ষসসৈন্য নিধনের কারণ চরনিয়োগে রাবণের অক্ষমতাকে নির্দেশ করেছে শূর্পণখা। শূর্পণখা রাবণকে বলেছে: জয়কামী যে রাজাদের গুপ্তচর, ধনাগম এবং রাষ্ট্রনীতি অপরের নিয়ন্ত্রণে চলে, তারা সাধারণ মানুষের সমান। দূরের সবকিছু গুপ্তচরের দ্বারা রাজারা দেখে থাকেন বলে রাজাদের বলা হয় দীর্ঘচক্ষু। মনে হচ্ছে তুমি গুপ্তচর নিয়োগ করো নি। তোমার নিযুক্ত মন্ত্রীরাও অতি সাধারণ। তাই জনস্থান ধ্বংস হয়েছে। তোমার আত্মীয়েরা নিহত হয়েছে। এসব তুমি জানতেই পারনি।[১৮]

ভৃত্যদের প্রতি আচরণ

ভৃত্যকে নীচ দৃষ্টিতে দেখা নয়, বরং সহযোগীর দৃষ্টিতে দেখা রাজার দায়িত্ব। তাই রামচন্দ্র ভরতকে প্রশ্ন করেছেন: বৎস, তুমি দেবগণ, পিতৃগণ, ভৃত্যবর্গ, গুরুমণ্ডলী, পিতৃসম বৃদ্ধগণ, বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণদের সম্মান করছ তো ? [১৯]

এখানে লক্ষণীয়, গুরুজনের সঙ্গে ভৃত্যদের সম্মানদান রামচন্দ্রের আদর্শ। আবার ভৃত্যদের সঙ্গে রাজসম্পর্ক ও ব্যবহারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। এ সম্পর্কে রামচন্দ্র ভরতকে বলেছেন: কর্মচারীরা সব নিঃশঙ্কভাবে তোমার সামনে আসে না তো ? কেননা মধ্যমপন্থাই অভীষ্টলাভের কারণ।[২০]

দক্ষ সেনাপতি নিয়োগ

একটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ সেনাপতি। রামচন্দ্র দক্ষ সেনাপতি নিয়োগে গুরুত্ব দিয়ে ভরতকে জিজ্ঞাসা করেছেন: বিপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে পরাস্ত করতে সমর্থ, সপ্রতিভ, বিপৎকালে ধৈর্যশালী, বুদ্ধিমান, সৎকুলসম্ভূত, শুদ্ধাচারী ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করেছ তো ? [২১]

বীরযোদ্ধাকে পুরস্কৃত করা

বীরযোদ্ধাকে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কৃত করা হতো। রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করেছেন: বলবান, যুদ্ধবিশারদ, বিক্রমশালী, বীরপুরুষদের কার্যবিচার করে তাঁদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করছ তো? [২২]

যথাসময়ে বেতনাদি প্রদান

রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের যথাসময়ে বেতন প্রদান করা হতো। রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করেছেন: সৈন্যদের প্রদেয় যথোচিত অন্ন এবং বেতন ঠিক সময়ে দাও তো? দেরি করো না তো? যারা প্রভুর অন্ন ও বেতনের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তারা ঠিক সময়ে তা না পেলে প্রভুর ওপর কুপিত হয়। তাঁকেও দোষারোপ করে। এতে ভীষণ বিপত্তি হয়।[২৩]

আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা

আয়-ব্যয়ের মধ্যে নিয়ত সামঞ্জস্য রক্ষা করা রাজদায়িত্ব। রাজার আয় প্রচুর ও ব্যয় অল্প হলে রাজ্যে সমৃদ্ধি আসে। রামচন্দ্র তাই ভরতকে জিজ্ঞাসা করেছেন: তোমার আয় প্রচুর ও ব্যয় অল্প তো? অপাত্রে তোমার ব্যয় হচ্ছে না তো? [২৪]

সুবিচার প্রতিষ্ঠা

রাজার দায়িত্ব রাজ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বিচারপ্রার্থী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করবেন। রাজাকে সঠিকভাবে জানতে হবে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত দোষী কি না ? আবার বিচারপ্রার্থীর প্রতিও রাজাকে সুবিবেচক হতে হবে। রামচন্দ্র ভরতকে

জিজ্ঞাসাচ্ছলে উপদেশ দিয়েছেন: কখনও শুদ্ধাত্মা, শুচি, সজ্জনকে মিথ্যা অপবাদে আনা হলে শাস্ত্রকুশল বিচারকের দ্বারা তাঁর দোষ প্রমাণিত না হলে তাঁকে লোভবশত দণ্ড দাও না তো? আবার ধৃত ব্যক্তি অপরাধী প্রমাণিত হওয়ার পরও তোমার কর্মীরা ঘুষ খেয়ে তাকে আবার ছেড়ে দেয় না তো? [২৫]

রামচন্দ্রের রাজ্যে সবাই সুবিচার পেত। উত্তরকাণ্ডে উল্লেখ আছে (প্রক্ষিপ্ত ১১-১৩), এক বিচারপ্রার্থী কুকুর রামচন্দ্রের কাছে সুবিচার পেয়েছিল। ঘটনাটি এরূপ: ক্ষুধার্থ এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা না পেয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর চলার মধ্যপথে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কুকুরকে প্রহার করেন। তখন কুকুরটি আহত হয়ে রাজা রামচন্দ্রের কাছে এর বিচার চায়। অপরাধী ব্রাহ্মণকে তাঁর অপরাধ অনুসারে কী শাস্তিবিধান করা যেতে পারে, এ সম্পর্কে রামচন্দ্র তাঁর সভাসদ্‌কে জিজ্ঞাসা করেন: এর প্রতি আমার কী কর্তব্য, কী ধরণের শাস্তিবিধান করলে এর উপযুক্ত বিচার হবে, আপনারা বলুন। অপরাধ অনুসারে শাস্তিবিধান করলে প্রজাগণ সুরক্ষিত থাকে।[২৬] কুকুরের ইচ্ছানুযায়ী প্রহারকারী ব্রাহ্মণকে রামচন্দ্র মঠাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এখানে বিচারপ্রার্থী কুকুরের প্রার্থনাকে রামচন্দ্র সম্মান করেছেন। এ কাহিনিটি রামরাজ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রমাণের সাক্ষ্য দেয়।

তথ্যসূত্র:

১. যথা দৃষ্টিঃ শরীরস্য নিত্যমেব প্রবর্ততে।
তথা নরেন্দ্রো রাষ্ট্রস্য প্রভবঃ সত্য-ধর্ময়োঃ ॥
রাজা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্ ।
রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্ ॥
যমো বৈশ্রবণঃ শক্রো বরুণশ্চ মহাবলঃ।
বিশিষ্যন্তে নরেন্দ্রেণ বৃত্তেন মহতা ততঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৭/৩৩-৩৫

২. অপ্রমত্তশ্চ যো রাজা সর্বজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতজ্ঞো ধর্মশীলশ্চ স রাজা তিষ্ঠতে চিরম্ ॥
নয়নাভ্যাং প্রসুপ্তো বা জাগর্তি নয়চক্ষুষা।
ব্যক্তক্রোধপ্রসাদশ্চ স রাজা পূজ্যতে জনৈঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৩৩/২০-২১

৩. পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ।
ইন্দ্রস্যৈব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব ॥
রাজা তস্মাদ্ বরান্ ভোগান্ রম্যান্ ভুঙ্‌ক্তে নমস্কৃতঃ।
তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্বিষয়বাসিনঃ।
নগরস্থো বনস্থো বা ত্বং নো রাজা জনেশ্বরঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১/১৯-২০

৪. অধর্মঃ সুমহান্নাথ ভবেত্তস্য তু ভূপতেঃ।
যো হরেদ্ বলিষড়ভাগং ন চ রক্ষতি পুত্রবৎ ॥
যুঞ্জানঃ স্বানিব প্রাণান্ প্রাণৈরিষ্টান্ সুতানিব।
নিত্যযুক্তঃ সদা রক্ষন্ সর্বান্ বিষয়বাসিনঃ ॥
প্রাপ্নোতি শাশ্বতীং রাম কীর্তিং স বহুবার্ষিকীম্ ।
ব্রহ্মণঃ স্থানমাসাদ্য তত্র চাপি মহীয়তে ॥
যৎকরোতি পরং ধর্মং মুনির্মূলফলাশনঃ।
তত্র রাজ্ঞশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬/১১-১৪

৫. পুরেব মে চারুদতীমনিন্দিতাং বিশন্তি সীতাং যদি নাদ্য মৈথিলীম্ ।
সদেব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-পন্নগং জগৎ সশৈলং পরিমর্দ্দয়াম্যহম্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬৪/৭৭

৬. যুক্তদণ্ডা হি মৃদবঃ প্রশান্তা বসুধাধিপাঃ।
সদা ত্বং সর্বভূতানাং শরণ্যঃ পরমা গতিঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬৫/১০

৭. দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্মো ধৃতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ॥
নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ নিগ্রহানুগ্রহাবপি।
রাজবৃত্তিরসঙ্কীর্ণা ন নৃপাঃ কামবৃত্তয়ঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/১৯, ৩২

৮. ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ ॥
প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮/২২-২৩

৯. রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥
শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮/৩১-৩২

১০. যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রাঘব।
তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৫৯

১১. বিভজ্য সততং বীর স রাজা হরিসত্তম।
হিত্বা ধর্মং তথার্থঞ্চ কামং যস্তু নিষেবতে ॥
ত্রিবর্গফলভোক্তা চ রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে।
উদ্যোগসময়স্ত্বেষ প্রাপ্তঃ শত্রুনিষূদনঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৮/২১, ২৩

১২. বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্বলসমন্বিতম্ ।
চতুর্দশগুণং মেনে হনুমান্ বালিনঃ সুতম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৫৪/২

১৩. বিদ্যাস্বভিবিনীতো যো রাজা রাজন্ নয়ানুগঃ।
স শাস্তি চিরমৈশ্বর্যমরীংশ্চ কুরুতে বশে ॥
সন্দধানো হি কালেন বিগৃহ্যংশ্চারিভিঃ সহ।
স্বপক্ষে বর্ধনং কুর্বন্নহদৈশ্বর্যমশ্নুতে ॥

হীয়মানেন কর্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ।
ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্বীত বিগ্রহম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩৫/৭-৯

১৪. কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষীঃ ক্বচ্চিৎ কাল্হেববুধ্যসে। অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/১৭

১৫. কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থনৈপুণম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড,১০০/১৭

১৬. কচ্চিদ্ বিনয়সম্পন্নং কুলপুত্রৌ বহুশ্রুতঃ।
অনসূয়ুরনুদ্রষ্টা সৎকৃতস্তে পুরোহিতঃ ॥
কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো বিধিজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
হুতঞ্চ হোষ্যমাণঞ্চ কালে বেদয়তে সদা ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/১১-১২

১৭. কচ্চিন্মুখ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ।
জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাস্তে তাত যোজিতাঃ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/২৫

১৮. যেষাং চারাশ্চ কোশশ্চ নয়শ্চ জয়তাং বর।
অস্বাধীনা নরেন্দ্রাণাং প্রাকৃতৈস্তে জনৈঃ সমাঃ ॥
যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান্সর্বানর্থান্নরাধিপাঃ।
চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানো দীর্ঘচক্ষুষঃ ॥
অযুক্তচারং মন্যে ত্বাং প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্যুতঃ।
স্বজনঞ্চ জনস্থানং নিহতং নাববুধ্যসে ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৩৩/৯-১১

১৯. কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/১৩

২০. কচ্চিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কয়া।
সর্বে বা পুনরুৎসৃষ্টা মধ্যমেবাত্র কারণম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৫২

২১. কচ্চিদ্ ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমাঞ্শুচিঃ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৩০

২২. বলবন্তশ্চ কচ্চিৎ তে মুখ্যা যুদ্ধবিশারদাঃ।
দৃষ্টাপদানা বিক্রান্তাস্ত্বয়া সৎকৃত্য মানিতাঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৩১

২৩. কচ্চিদ্ বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্ ।
সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে ॥
কালাতিক্রমণে হ্যেব ভক্ত-বেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্তুঃ কুপ্যন্তি দুষ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৩২-৩৩

২৪. আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদল্পতরো ব্যয়ঃ।
অপাত্রেষু ন তে কচ্চিৎ কোষো গচ্ছতি রাঘব ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৫৪

২৫. কচ্চিদার্যেঽপি শুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চাপকর্মণা।

অদৃষ্টঃ শাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ ॥
গৃহীতশ্চৈব পৃষ্ঠশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো ধনলোভান্নরর্ষভ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৫৬-৫৭

২৬. কিং কার্যমস্য বৈ ব্রূত দণ্ডো বৈ কেঽস্য পাত্যতাম্ ।
সম্যক্প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥ উত্তরকাণ্ড, প্রক্ষিপ্ত ১২/৩২

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ রাজার স্বরূপ

আদর্শ রাজা যেমন দেশের আশীর্বাদস্বরূপ, তেমনি অধার্মিক ও ব্যর্থ রাজা দেশের অভিশাপস্বরূপ। রাজা যদি প্রমাদগ্রস্ত হন, তবে রাজ্যের অমঙ্গল হয়। কী কী কারণে একজন রাজা ব্যর্থ হন, তার বর্ণনা আছে রামায়ণে।

যে রাজা রাজকর্তব্য পালনে ব্যর্থ, তাকে কেউ সমাদর করে না

তুচ্ছ সুখভোগে আসক্ত, কামাচারী, লোভী রাজাকে প্রজারা শ্মশানের আগুনের মতো মনে করে। তাঁকে কেউ সমাদর করে না। যে রাজা যথা সময়ে নিজে কর্তব্য পালন করেন না, তিনি আপন কার্য ও রাজ্যের সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যান। হাতি যেমন দূর থেকেই নদীর পঙ্ক ত্যাগ করে, তেমনি জনসাধারণ রাজকার্যে শিথিল, গোপনচারী, সহজে যার দেখা পাওয়া যায় না, অপরের কথায় যিনি চলেন, সেই রাজাকে ত্যাগ করে থাকে।[১] যে রাজা পৌরগণের কাজ দিনের দিন অর্থাৎ প্রতিদিন সম্পূর্ণ না করেন, তিনি বায়ুচলাচলহীন ঘোরতর নরকে পতিত হন।[২]

যে রাজা অল্প দান করেন, তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রমত্ত, গর্বিত ও প্রবঞ্চক– সেই রাজা বিপদে পড়লে তাঁকে রক্ষার জন্য প্রজাবর্গ ছুটে আসে না। অভিমানী, অপরকে যে গ্রাহ্য করে না, নিজেকে যে খুব বড় মনে করে, ক্রুদ্ধ– এমন রাজাকে আত্মজনেরাও হত্যা করে। যে রাজা কর্তব্য করেন না, ভয়ের কারণ এলেও ভীত হন না, সে রাজা দরিদ্র হয়ে দ্রুতই রাজ্য থেকে বিচ্যুত হন। ইহলোকে তিনি তৃণের মতো তুচ্ছ হয়ে যান। শুকনো মাঠ, লোষ্ট্র এমন কি ধুলো দিয়েও কাজ হয়। কিন্তু স্থানভ্রষ্ট রাজার দ্বারা কোনো কাজই হয় না। পরার পর ছেড়ে দেওয়া কাপড়, বিমর্দিত মালার মতো রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট রাজা শক্তিমান হলেও ব্যর্থ। যে অন্যদের অপমান করে, বিষয়াসক্ত, দেশ ও কালের বিভাগতত্ত্ব ভালোভাবে জানে না, দোষ-গুণ নির্ণয়ে অপারদর্শী সে রাজার রাজ্য বিপন্ন হয়।[৩]

যে রাজা খুবই কঠোর, অত্যন্ত প্রতিকূল ও উদ্ধত, তিনি রাজ্যপালন করতে পারেন না। মন্ত্রীদের উগ্র মন্ত্রণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে রাজা রাজ্যভোগ করেন– তিনি ধ্বংস হয়ে যান। বন্ধুর পথে অনভিজ্ঞ সারথিকে নিয়ে চললে রথের যে অবস্থা হয়, এক্ষেত্রেও তাই। প্রতিকূল রাজা উগ্রতার সঙ্গে প্রজাকুলকে রক্ষা

করলেও তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। শৃগালের পাহারায় যেমন হরিণের বৃদ্ধি হয় না ।[৪] দুর্নীতিপরায়ণ অশিক্ষিত রাজা শাসনকার্যে নিয়োজিত থাকলে রাষ্ট্র ও নগরসমূহ সমৃদ্ধ হলেও ধ্বংস হয়ে যায়।[৫]

ন্যায়পথে যে রাজকার্য সম্পাদন করে, সেই নিশ্চিতমতি রাজা পরে আর অনুতাপ করে না। সদুপায় ত্যাগ করে অন্যায়ভাবে যে কাজ করা হয়, সেই কাজ বিপরীত ফল প্রদান করে। অনুচিত যজ্ঞে আহুতি দিলে ঘৃত যেমন কলুষিত হয়, তেমনি অপবিত্র পাপকর্মও দূষিতই হয়ে থাকে। যে পূর্বের কার্য পশ্চাতে করতে ইচ্ছা করে, আর পরের কার্য পূর্বে করে, সে নীতি কি এবং অনীতিই বা কি জানে না। বিপক্ষের বল অধিক দেখেও যে যুদ্ধ করার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, শত্রুরা তখন তার ছিদ্র দেখতে পায়। পাখি যেমন ক্রৌঞ্চপর্বতে আকাশের মতো ছিদ্র অন্বেষণ করে, তেমনি শত্রুও সেই ব্যক্তির ছিদ্র অন্বেষণ করে।[৬]

ধর্ম, অর্থ, কাম– এই তিনের মধ্যে ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ– তা শুনেও যিনি বোঝেন না, সেই রাজার পাণ্ডিত্য ব্যর্থ।[৭] যারা মন্ত্রীদের কথা প্রকাশ্যে না শুনে, প্রগলভতার দ্বারা যে সব কথা বলে– তারা শাস্ত্র জানে না।[৮] যে রাজা চঞ্চল স্বভাব এবং সর্বদা সব কাজেই হস্তক্ষেপ করে, ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষের ব্যক্তিরা তার গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ঢুকে পড়ে। যে শত্রুদের অবজ্ঞা করে নিজেকে রক্ষা করে না– সে অনর্থের সম্মুখীন হয়। এবং তাকে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হতে হয়।[৯]

অধার্মিক রাজার রাজ্যে দুর্গতি

রাজার অসদাচরণের জন্য রাজ্যে দুর্দৈব ঘটে। রাজা যদি পাপকর্ম করে, তাহলে তার রাজ্যে দুর্দৈব ঘটে। অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদ প্রতাপশালী, বীর্যবান, খ্যাতিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর অসদাচরণের ফলে সে রাজ্যে অনাবৃষ্টি শুরু হয়। প্রজাদের জীবনে নেমে আসে ঘোরতর সংকট। তখন রাজা বুঝতে পারেন, তাঁর কারণেই রাজ্যে নেমে এসেছে অশান্তি। তখন তিনি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।[১০]

এখানে লক্ষণীয়, রাজার কারণেই রাজ্যে শান্তি বা অশান্তি বিরাজ করে– এ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির একটা বড় দিক। রাজা সদুপায় ত্যাগ করে অন্যায় ভাবে কাজ করলে সেই কাজ বিপরীত ফল

প্রদান করে। অনুচিত যজ্ঞে আহুতি দিলে ঘৃত যেমন কলুষিত হয়, তেমনি অপবিত্র পাপকর্মও দূষিত হয়ে থাকে।[১১]

যে রাজা রক্ষাকর্মে অশক্ত, বিবিধ দোষ এসে তাকে ধ্বংস করে

অযোধ্যায় অম্বরীষ নামে এক মহান রাজা ছিলেন। একবার তিনি যজ্ঞ করার উদ্যোগ নিলে ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করেন। পশুটি অপহৃত হলে পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন: মহারাজ, যজ্ঞের জন্য যে পশুটি আনা হয়েছিল, সেটি আপনারই দুষ্কর্মের জন্য অপহৃত হলো। হে নরনাথ, যে রাজা রাজকর্মে অশক্ত, বিবিধ দোষ এসে তাকে ধ্বংস করে।[১২]

তথ্যসূত্র :

১. সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্ ।
লুব্ধং ন বহু মন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ ॥
স্বয়ং কর্মাণি যঃ কালে নানুতিষ্ঠতি পার্থিবঃ।
স তু বৈ সহ রাজ্যেন তৈশ্চ কার্যৈর্বিনশ্যতি ॥
অযুক্তাচারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্ ।
বর্জয়ন্তি নরা দুরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৩৩/৩-৫

২. পৌরকার্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে ।
সংবৃতে নরকে ঘোরে পতিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ উত্তরকাণ্ড, ৫৩/৬

৩. তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্বিতং শঠম্ ।
ব্যসনে সর্বভূতানি নাভিধাবন্তি পার্থিবম্ ॥
অতিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্ ।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনেঽপি নরাধিপম্ ॥
নানুতিষ্ঠতি কার্যাণি ভয়েষু ন বিভেতি চ ।
ক্ষিপ্রং রাজ্যাচ্চ্যুতো দীনস্তৃণৈস্তুল্যো ভবেদিহ ॥
শুষ্ককাষ্ঠৈর্ভবেৎ কার্যং লোষ্ট্রৈরপি চ পাংসুভিঃ।
ন তু স্থানাৎ পরিভ্রষ্টৈঃ কার্যং স্যাদ্ বসুধাধিপৈঃ ॥
উপভুক্তং যথা বাসঃ স্রজো বা মৃদিতা যথা।
এবং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ সমর্থোঽপি নিরর্থকঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৩৩/১৫-১৯

৪. যে তীক্ষ্ণমন্ত্রাঃ সচিবা ভুজ্যন্তে সহ তেন বৈ।
বিষমেষু রথাঃ শীঘ্রং মন্দসারথয়ো যথা ॥
বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তধর্মমনুষ্ঠিতাঃ।

পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥
স্বামিনা প্রতিকূলেন প্রজাস্তীক্ষ্ণেন রাবণ।
রক্ষ্যমাণা ন বর্ধন্তে মৃগা গোমায়ুনা যথা ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪১/১২-১৪

৫. অকৃতাত্মনমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্ ।
সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥

৬. অনুপায়েন কর্মাণি বিপরীতানি যানি চ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রয়তেষ্বিব ॥
যঃ পশ্চাৎপূর্বকার্যাণি কর্মাণ্যভিচিকীর্ষতি।
পূর্বঞ্চাপরকার্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ ॥
চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্ ।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১২/৩১-৩৩

৭. ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে।
রাজা বা রাজমাত্রো বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/১০

৮. অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রার্থান্ পুরুষাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
প্রাগল্ভ্যাদ্ বক্তুমিচ্ছতি মন্ত্রিষ্বভ্যন্তরীকৃতাঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/১৪

৯. চপলস্যেহ কৃত্যাণি সহসানুপ্রধাবতঃ।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ ॥
যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি।
অবাপ্নোতি হি সোঽনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/১৯-২০

১০. অঙ্গেষু প্রথিতো রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
তস্য ব্যতিক্রমাদ্ রাজ্ঞো ভবিষ্যতি সুদারুণা ॥
অনাবৃষ্টিঃ সুঘোরা বৈ সর্বলোকভয়াবহা।
অনাবৃষ্ট্যাং তু বৃত্তায়াং রাজা দুঃখসমন্বিতঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৯/৮-৯

১১. অনুপায়েন কর্মাণি বিপরীতানি যানি চ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রয়তেষ্বিব ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১২/৩১

১২. পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর ॥ আদিকাণ্ড, ৬১/৭

Dhaka University Institutional Repository

অরাজক রাজ্যের দুরবস্থা

রাজা রাজ্যের নিয়ন্তা। তিনিই রাজ্যের সুখ-শান্তির বিধায়ক। প্রজাদের ধর্ম-আচরণের মূল একমাত্র রাজা। রাজার সুশাসনের জন্য প্রজারা পরস্পর হিংসাত্মক কর্ম থেকে বিরত থাকে। রাজাহীন রাজ্যে তাই ধন, প্রাণ, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নিরাপদ নয়। পালকহীন পশু, সেনাপতিবিহীন সৈন্যবাহিনী, চন্দ্রহীন রাত্রি এবং বৃষকে ছেড়ে গাভীর যে অবস্থা হয়– রাজাহীন রাজ্যের অবস্থাও হয় তেমনি শোচনীয়। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর মার্কণ্ডেয় প্রমুখ মুনি এবং অমাত্যগণ অরাজক রাজ্যের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। অরাজক রাজ্যে নৈসর্গিক ও সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসে। রাজ্যে রাজা না থাকলে জলভরা মেঘও বর্ষণ করে না। শস্যের বীজও ছড়ানো যায় না। পুত্র পিতার এবং পত্নী পতির বশে থাকে না। রাজ্যে ধন থাকে না। স্ত্রীও গৃহে বাস করে না। চারদিকে অমঙ্গল নেমে আসে। মানুষেরা কোনো সভা করে না। সানন্দে উদ্যান ও পবিত্র সুন্দর দেবগৃহ কেউ নির্মাণ করে না। যজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বহুদিনব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর করেন না। রাষ্ট্রের সৌন্দর্যদায়ক সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। সুন্দরের পূজারী অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের সমৃদ্ধি হয় না। ব্যবসায়ীদের ইচ্ছাপূরণ হয় না। পুরাণাদির পাঠ-শ্রবণ যাদের প্রিয়, তারা পাঠকদের কথায় আনন্দিত হয় না। কুমারী মেয়েরা সোনার গহনা পরে সন্ধ্যাকালে খেলার জন্য উদ্যানে যেতে পারে না। ধনীরা নিরাপদে থাকতে পারে না। কৃষক ও গোয়ালারা দরজা খোলা রেখে ঘুমাতে পারে না। আনন্দবিলাসী ব্যক্তিরা অরণ্যে ভ্রমণবিলাসে যেতে পারে না। ষাট বছর বয়স্ক দাঁতাল হাতিগুলো স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে না। বাণ এবং অস্ত্রের অভ্যাসকালে নিরন্তর শর-নিক্ষেপকারীদের করতালি শোনা যায় না। সমাজে অবাধ বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটে। বণিকেরা বহু দ্রব্যসম্ভার নিয়ে নিরাপদে পথ চলাচল করতে পারে না। আত্মভাবনায় মগ্ন ব্যক্তি সুন্দর কিছু চিন্তা করতে করতে নিশ্চিন্ত মনে পথে চলতে পারে না। রাজাহীন রাজ্যে সৈনেকেরা যুদ্ধে শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারে না। জনগণ ভালো বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে যেখানে সেখানে বেড়াতে পারে না। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিশ্চিন্ত মনে বনে-উপবনে বসে শাস্ত্রবিচারে নিমগ্ন থাকতে পারে না। লোকে সদাচার ভুলে যায়। ফলে ব্রতপরায়ণ মানুষেরাও দেবপূজার জন্য মালা, মিষ্টি ও দক্ষিণা দান করে না। রাজপুত্ররাও সাজসজ্জা করে শুধু বিলাসী হয়। অরাজক রাজ্য তাই জলহীন নদী, তৃণহীন বন, পালকহীন গরুর মতো শোচনীয়। রাজাহীন রাজ্যে কোনো কিছুই কারো নিজস্ব হয় না। যে-কেউ যে-কারো বস্তু কেড়ে নিতে পারে। মাৎস্যন্যায়ের মতো মাছ যেমন একে অপরকে খেয়ে ফেলে,অরাজক রাজ্যের মানুষও তেমনি একে অপরকে আত্মসাৎ করে।[১] রাষ্ট্রভাবনায় অরাজক রাজ্যের একটা যথার্থ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র পাওয়া যায় অযোধ্যাকাণ্ডের এই অংশে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সে যুগের রাষ্ট্রচিন্তকদের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল।

তথ্যসূত্র :

১. অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৭/৯-৩১

আদর্শ রাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রের সুশৃঙ্খলা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সমৃদ্ধির জন্য আদর্শ রাষ্ট্রনীতি অবশ্য কাম্য। রামায়ণে এই অভীপ্সিত রাষ্ট্রনীতির অনুশীলন পরিদৃষ্ট।

প্রজাবর্গকে রক্ষার জন্য সময় বিশেষে হত্যা কর্তব্য

রাজা প্রজাদের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। কোনো অশুভশক্তি যদি প্রজাদের নিপীড়ন করে, প্রজাদের শান্তি কল্যাণ বিনষ্ট করে– তখন রাজার উচিত সেই অশুভশক্তিকে ধ্বংস করা। তাড়কা রাক্ষসী ছিল ভয়ঙ্করী, অন্যায় আচরণে পরাক্রমশালিনী। সে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে অগস্ত্যের তপঃস্থলীর মঙ্গলময় দেশকে ধ্বংস করেছিল। তাই বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে নির্দেশ দেন তাড়কাকে হত্যা করতে। তাড়কা নারী, তবুও সে নিধনযোগ্য। তাকে নিধন করা উচিত। কেননা প্রজাবর্গকে রক্ষার জন্য নিষ্ঠুর হোক বা করুণই হোক, পাপযুক্তই হোক বা দোষযুক্তই হোক– রাজ্যপালন করতেই হবে। এ কথাগুলো বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলেছিলেন।[১]

রাজ্যরক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম

রামচন্দ্র নিষাদরাজ গুহকে রাজতন্ত্র পালনের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন: সৈন্যবাহিনী, কোষ, দুর্গ এবং জন বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থেকে রাজ্যরক্ষা অত্যন্ত কঠিন কর্ম।[২]

বয়সে বড় না হলেও রাজা হতে পারে

সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার সময় রামচন্দ্র তাঁকে বলেছেন: কুমার ভরতের সাথে রাজার মতো আচরণ করবেন। রাজধর্ম স্মরণ করুন– বয়সে বড় না হলেও কেউ রাজা হতে পারে। যোগ্যতাই এখানে বিচার্য।[৩]

শিষ্ট ব্যক্তিরা রাজাকেই অনুসরণ করে

রাজা তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য দ্বারা প্রজাদের আকর্ষণ করেন। তাই রাজচরিত্রকে শিষ্ট ব্যক্তিরা অনুসরণ করেন। ধর্ম অর্থ বা কাম যা শাস্ত্রে বলা হয়নি, শিষ্ট ব্যক্তিরা ঐ বিষয়ে রাজাকেই অনুসরণ করেন।

দ্রব্যসমূহের মধ্যে রাজা, ধর্ম এবং কাম উত্তমনিধি। ধর্ম, মঙ্গল এবং পাপ রাজার কাছ থেকেই প্রবর্তিত হয়। তিনিই এ সবের মূল। রাজা যেহেতু দেশের শাসক, সেহেতু আদর্শের প্রতীক হিসেবে রাজার চরিত্র প্রজাদের অনুসরণীয়।[৪] রাবণের সীতাহরণকালে জটায়ু রাবণকে তার দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য রাজার গুণাবলির কথা বলেছেন। রাবণ রাজা, কিন্তু তার মধ্যে ছিল না প্রজাদের আকর্ষণ করার মতো কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সকল অবস্থাতেই রাজা নিত্য মান্য ও পূজ্য

সীতাহরণে সাহায্যদানের জন্য রাবণ মারীচকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মারীচ রাবণকে এই অপরাধজনক কাজে উৎসাহিত করেনি এবং এ কাজে সাহায্যের অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচকে বলেন, রাজার আদেশ পালন করা প্রত্যেক প্রজার অবশ্য করণীয় কার্য। কেননা অমিততেজা রাজা অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম এবং বরুণ– এই পাঁচজনের রূপ ধারণ করে থাকেন। উষ্ণতা, পরাক্রম, স্নিগ্ধতা, দণ্ড এবং প্রসন্নতা মহান রাজা ধারণ করে থাকেন। সেজন্য সকল অবস্থাতেই রাজা নিত্যই মান্য ও পূজ্য।[৫]

আত্ম-সচেতন মন্ত্রীর বৈশিষ্ট্য

যে মন্ত্রী নিজের ভালো চান, তিনি রাজার অপ্রতিকূলে কথা বলেন। তাঁর মন্ত্রণা হবে বিনম্র, কল্যাণকর, হিত এবং রাজনীতিসম্মত। হিতকথাও যদি তিনি অপমানজনকভাবে বলেন, মানার্থী রাজা সম্মানহীন সেই বাক্যকে ভালো বলে মেনে নেবেন না।[৬] এটি রাবণের উক্তি। সীতাহরণে রাবণকে সাহায্য করতে মারীচ অস্বীকার করলে তখন রাবণ এ কথাগুলো বলেন।

হিতবক্তা অমাত্যই উত্তম

প্রকৃত সৎ অমাত্য সব সময় রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ কামনা করেন। দেশের জন্য যাতে মঙ্গল হয় সেই বিষয়ে তিনি রাজাকে মন্ত্রণা দেন। যিনি শত্রুর ও নিজের বীর্যবত্তা, অবস্থান, হ্রাস-বৃদ্ধি বিবেচনা করেন এবং স্বপক্ষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে বুদ্ধির সঙ্গে প্রভুর হিতকর উচিত বাক্য বলতে পারেন, তিনি হলেন মন্ত্রী।[৭] অনেক সময় কোনো মন্ত্রণা শ্রুতিমধুর নাও হতে পারে কিংবা রাজার কাছে অপ্রিয় হতে

পারে। কিন্তু উত্তম অমাত্য নির্ভীকভাবে যা রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গল, তারই কথা বারংবার বলে যাবেন। অনেক সময় রাজার কাছে অপ্রিয় হতে হয়। এমন কি মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রকৃত হিতকারী অমাত্যের কাছে চাকরি হারানোর ভয় নেই। তিনি মনে করেন, দেশের কল্যাণ সাধন তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করার পর, সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে প্রত্যর্পণের জন্য রাজসভায় বিভীষণ তাঁর অভিমত প্রদান করেন। তখন রাবণসহ ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে উপহাস ও তিরস্কার করেন। বিভীষণ তখন নির্ভীকভাবে বলেন: আমি আজ রাক্ষসগণসহ সমগ্র পুরীর এবং সুহৃদ্‌মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে রাজার মঙ্গলকর, অমৃততুল্য যথার্থ বাক্য বলছি– রাজপুত্র রামচন্দ্রের হাতে সীতাকে ফেরত দিন। অনেকে আমাকে এভাবে বলতে বারণ করেছিল। তোমার হিতৈষী বলে আমি এসব কথা বললাম।[৮]

যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বে নিয়োগ

প্রাচীন ভারতে রাজা যোগ্য ব্যক্তিদের মন্ত্রিত্বে নিয়োগ দিতেন। এর প্রমাণ রামায়ণে দেখা যায়। রাজা দশরথের মন্ত্রীরা ছিলেন রাজনৈতিক মন্ত্রণায় সুপণ্ডিত। তাঁরা রাজ্যের কল্যাণসাধনে সতত তৎপর ছিলেন। রাজা দশরথের আটজন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন যশস্বী, পবিত্রকর্মা এবং নিত্যই রাজকর্মে অনুরক্ত। তাঁরা ছিলেন বিদ্বান, বিনয়ান্বিত, লজ্জাশীল, দক্ষ, জিতেন্দ্রিয়, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বিক্রমপ্রকাশে দৃঢ়চিত্ত এবং সদা সতর্ক। তাঁরা কথায় যা বলতেন, কাজে তা রূপায়িত করতেন। যথোচিতভাবে তেজ ও ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্য তাঁরা ছিলেন প্রখ্যাত। মৃদু হেসে তাঁরা কথা বলতেন। কাম-ক্রোধ বা লোভের জন্য তাঁরা কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না। রাজ্যের ধনবৃদ্ধি ও সৈন্য সংগ্রহে তাঁরা ছিলেন আত্মনিবেদিতপ্রাণ। রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁরা ছিলেন পণ্ডিত। সঠিক বিচার করতেন। তাঁরা ছিলেন বীর, সদা উদ্যমশীল। দেশের সজ্জনদের তাঁরা রক্ষা করতেন। অপরাধীর দোষ-গুণ বিচার করেই তাঁরা দণ্ড দিতেন। তাঁদের সুশাসনে নগরে ও জনপদে রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রশান্তি বিরাজ করত। গুরুজনদের গুণই তাঁরা গ্রহণ করতেন। সন্ধি-বিগ্রহের রাজনীতিতে তাঁরা ছিলেন পারদর্শী।[৯]

রামচন্দ্র ভরতের কাছে জানতে চেয়েছেন– তিনি বীর, বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, সৎকুলজাত, ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মসমব্যক্তিদের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেছেন কি না? কেননা রাজাদের বিজয়ের মূলে থাকে মন্ত্রীদের

সঙ্গে ভালোভাবে মন্ত্রণা করা। শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য যাঁদের আছে, মূলত তাঁরাই পারেন সুযোগ্য মন্ত্রী হতে এবং সঠিক মন্ত্রণা দিয়ে রাজাকে সাহায্য করতে। তাই ভরতের কাছে রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসা– 'তুমি হাজার মূর্খের পরিবর্তে একজন পণ্ডিতকেই কামনা করছ তো?' অর্থকষ্টের সময় একজন পণ্ডিতই মহৎ কল্যাণ সাধন করতে পারেন। কেননা রাজা যদি সহস্র বা অযুত সংখ্যক মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তাতে তাঁর কোনো সাহায্য হয় না। কিন্তু একজন মাত্র মন্ত্রী যদি মেধাবী, বীর, দক্ষ এবং বিচক্ষণ হন– তাহলে তিনি তাঁর সৎ ও বিজ্ঞ মন্ত্রণা দ্বারা রাজ্যের কল্যাণ সাধন করতে পারেন।[১০]

এ থেকে এটা বলা যায় যে দশরথের রাজত্বে বা রামরাজ্যে যোগ্য মন্ত্রী নিয়োগের মানদণ্ড সুকঠোর ছিল। রামচন্দ্র অমাত্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ভরতকে আরও বলেছেন: যাঁরা ঘুষ নেন না, পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে মন্ত্রিত্ব করে আসছেন, যাঁরা ভেতরে-বাইরে পবিত্র, শ্রেষ্ঠদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ– তাঁদের তুমি নিয়োগ করেছ তো? [১১]

মন্ত্রীদের মতামতের গুরুত্ব প্রদান

মন্ত্রীদের পরামর্শ এবং তাঁদের মতামতকে রামচন্দ্র গুরুত্ব দিতেন। সমুদ্রতীরে সৈন্যশিবিরে রাবণভ্রাতা বিভীষণ রামচন্দ্রের শরণাগত হলে তিনি তাঁর সুহৃদ্‌বর্গের মতামত জানতে চেয়ে নিজের মতকেও সবার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর সুহৃদ্‌বর্গের উদ্দেশে বলেন: যিনি চিরকল্যাণকামী, সামর্থ্যবান ও বুদ্ধিমান, তিনি কর্তব্য নির্ণয়ে সুহৃদ্‌বর্গের অভিমত জানতে চান।[১২]

বংশানুক্রমিকভাবে অমাত্য নিয়োগ

বংশানুক্রমিকভাবে অমাত্য নিয়োগের একটা ধারা রামায়ণে দেখা যায়। এখানে নিয়োগ ব্যবস্থায় পরিবারতন্ত্রের গুরুত্ব দিলেও এর মাধ্যমে সুফল বয়ে আসত। কেননা শৈশব হতে অমাত্যপুত্র পারিবারিকভাবে রাজকর্মে পারদর্শী হয়ে উঠত। রাজার প্রতি তাঁদের আনুগত্য বৃদ্ধি পেত। রাজা দশরথের মন্ত্রীরা ছিলেন বংশানুক্রমে নিযুক্ত।

রাজকার্যে মন্ত্রগুপ্তি একান্ত প্রয়োজন

মন্ত্রগুপ্তি রাজাদের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। মন্ত্রণা অত্যন্ত সাবধানে গোপন রাখলে রাজার বিজয় হয়। মন্ত্রণা রাজাদের কবচ স্বরূপ। বাইরের লোক এবং নিজের অন্তরঙ্গ লোকও যেন মন্ত্রণা না জানতে পারে–

সেদিকে রাজাকে খেয়াল রাখতে হবে। রাজা দশরথের মন্ত্রিগণ ছিলেন মন্ত্রগোপনে সমর্থ।[১৩] রামচন্দ্র তাই ভরতকে মন্ত্রগুপ্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন: হে রাঘব, রাজাদের বিজয়লাভের মূলে রয়েছে মন্ত্রণা গোপন রাখা। তুমি একাকী বা বহুলোকের সঙ্গে মিলে মন্ত্রণা করো না তো? তোমার মন্ত্রণা করার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে না তো? তুমি যা ভবিষ্যতে করবে তা অন্য রাজারা জানেন না তো? [১৪]

কর্মীর স্বরূপ

একজন কর্মী কেমন হবে তার নির্দেশনা রামায়ণে পাওয়া যায়। যিনি মন্ত্রনির্ণয়ে সমর্থ এবং ত্রিবিধ মন্ত্রণায় যুক্ত, সমান সুখ-দুঃখভাগী বন্ধু বা বন্ধুর চেয়েও হিতকারী ব্যক্তির সঙ্গে মন্ত্রণা করে কর্ম আরম্ভ করেন এবং দৈবের সহায়ে তা পালন করেন– তাঁকেই বলা হয় উত্তম পুরুষ।[১৫] যিনি প্রভুর দ্বারা দুঃসাধ্য কার্যে নিযুক্ত হয়ে অনুরাগের সঙ্গে সেটি সমাধা করেন, তার অতিরিক্ত কাজও করেন, তিনি উত্তম পুরুষ।[১৬] যিনি একাই ভালো-মন্দ বিবেচনা করে ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হন, একাই সব কাজ সম্পন্ন করেন, তিনি মধ্যম পুরুষ।[১৭] যিনি কর্মে নিযুক্ত হয়ে সেই নির্ধারিত কাজটুকুমাত্র করেন, সমর্থ হয়েও প্রভুর হিতকর অন্য কাজ আর করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ।[১৮] যিনি গুণদোষ বিচার না করে, দৈবের আশ্রয়ও ত্যাগ করে একাই কার্য করবে বলে পরে সেই কার্য ত্যাগ করেন– তিনি অধম ব্যক্তি।[১৯] যে ভৃত্য কর্মে নিযুক্ত হয়ে সমর্থ হলেও একাগ্রতার সঙ্গে রাজার সেই কার্য সম্পাদন করেন না, তিনি অধম পুরুষ।[২০]

মন্ত্রণার স্বরূপ

মন্ত্রণা তিন প্রকার : উত্তম, মধ্যম ও অধম। শাস্ত্রানুযায়ী বিচার করে যে মন্ত্রণায় উপনীত হওয়া যায়– সেটি হলো উত্তম মন্ত্রণা।[২১] যেখানে মন্ত্রীরা প্রথমে বহু মত অবলম্বন করে বিচার করে অভীষ্ট লাভের জন্য শেষে একমতে উপনীত হন– তা হলো মধ্যম মন্ত্রণা।[২২] বিভিন্ন বুদ্ধিতে যেখানে আলোচনা করা হয়, ঐকমত্যে যেখানে উপনীত হওয়া যায়নি সেখানে কল্যাণ নেই। এরূপ অবস্থাকে বলা হয় অধম মন্ত্রণা।[২৩] যে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সাম-দান-দণ্ড এই তিনটি কাজ পাঁচ প্রকারে যুক্ত করে প্রয়োগ করেন– তিনিই ঠিক পথে চলেন।[২৪] এখানে পাঁচ প্রকারের যোগ হলো– কার্যারম্ভের উপায়, পুরুষ, রূপদ্রব্য সম্পত্তি, দেশকালের বিভাগ এবং বিপত্তি দূর করার উপায়।

যে রাজা নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সচিবদের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করে বুদ্ধি অনুসারে যখন যেমন যা আসছে তাকে এবং সংকল্পকে সাধন করতে ইচ্ছা করেন এবং বুদ্ধির সঙ্গে বন্ধুদের দেখেন– তিনি ঠিক পথে আছেন।[২৫]

দান, ভেদ, বিক্রমপ্রকাশ এবং যোগ, নীতি ও নীতিহীনতা নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজার মন্ত্রণা করা উচিত। এভাবে সমুচিতকালে ধর্ম, অর্থ এবং কাম যে আত্মজ্ঞানী রাজা সেবা করেন, তিনি কখনও দুঃখ পান না। অর্থতত্ত্বজ্ঞ, সচিব এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের মঙ্গলমূলক কার্যের অনুষ্ঠান রাজার করা উচিত।[২৬]

আদর্শ সভা ও সভ্যদের দায়িত্ব

যে সভায় বৃদ্ধগণ থাকেন না, সে সভা সভাই নয়। আবার যে বৃদ্ধগণ ধর্মের উপদেশ প্রদান করেন না, তাঁরা বৃদ্ধ বলে পরিগণিত হন না। যে ধর্মে সত্য নেই, সে ধর্ম ধর্মই নয়। ছলনা সমন্বিত সত্য প্রকৃতপক্ষে সত্যই নয়। সভায় চিন্তা করেও মৌন হয়ে থাকেন এবং স্বীয় যথাযোগ্য মত প্রকাশ করেন না, তারা সকলেই মিথ্যাবাদী। উত্তর জানা থাকলেও নিজের কাম, ক্রোধ অথবা ভীতিবশে যারা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন না, তারা নিজের ওপর সহস্র সংখ্যক বরুণপাশ নিক্ষিপ্ত করেন।[২৭] উত্তর কাণ্ডে গৃধ্র ও উলূকের আখ্যানে তাদের বিচার প্রক্রিয়ায় রামচন্দ্র এ কথাগুলি বলেছিলেন।

রাজসভায় জ্ঞানিজনের সমাগম

রাজসভায় জ্ঞানী ব্যক্তির সমাদর ছিল। বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী অগ্নিহোত্রী গুণবান উত্তম ব্রাহ্মণেরা রাজসভায় সমাদৃত হতেন। আবার পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিরা রাজাকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানাতেও রাজদরবারে উপস্থিত হতেন। রাবণবধের পর রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজ্যলাভ করলে বিভিন্ন দিক হতে মুনিবৃন্দ তাঁকে অভিনন্দন করার জন্য অযোধ্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন। বর্তমানে যেমন কেউ উচ্চতর পদে আসীন হলে তাকে সমাজের বুদ্ধিজীবী ও গুণিজনেরা অভিনন্দিত করেন, শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান – সে যুগেও তেমন ছিল। অযোধ্যার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চতুর্দিকে যে ঋষিগণ বাস করতেন, তাঁরা সবাই নৃপতি রামচন্দ্রকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাতে অযোধ্যায় এসেছিলেন।[২৮]

রাজভবনের প্রবেশদ্বারে দ্বারপালের অবস্থান

রামচন্দ্রের রাজভবনের প্রধান প্রবেশদ্বারে দ্বারপাল অবস্থান করতেন। বহিরাগত কেউ রাজভবনে প্রবেশ করার সময় দ্বারপালকে জানাতে হতো। রামচন্দ্রের দ্বারপাল ছিলেন নীতিজ্ঞানী, আভাসে-ইঙ্গিতে-বার্তাজ্ঞাপনে নিপুণ। তিনি ছিলেন সদাচারী, চতুর এবং ধৈর্যশীল। এখানে দ্বারপালের যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।[২৯]

উপঢৌকন

একরাজ্য থেকে অন্য রাজগৃহে গমনকালে সঙ্গে করে অনেক মূল্যবান উপহার নেওয়ার রীতি ছিল। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যা নগরী ছিল শোকাচ্ছন্ন। রাজভবনের প্রত্যেকে এবং পুরবাসী সবাই শোকাকুল। ভরত ও শত্রুঘ্ন ছিলেন অনেক দূরে কেকয়রাজ্যে। পাঁচজন দূত গিয়েছিলেন ভরত-শত্রুঘ্নকে আনতে। এমন বিপদের সময়ও তাঁরা অযোধ্যার রাজবাড়ি থেকে কেকয়রাজের উদ্দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন মহামূল্যবান উপহার সামগ্রী। দূতেরা কেকয়রাজ্যে পৌঁছে ভরতের সঙ্গে দেখা করে বললেন: এসব মহামূল্যবান বস্ত্র এবং অলঙ্কার আপনি গ্রহণ করে মাতুলকে দিন। হে রাজপুত্র, এর মধ্যে বিশ কোটি মুদ্রা মূল্যের দ্রব্য রাজার জন্য এবং দশকোটি মুদ্রা মূল্যের বস্তু আপনার মামার জন্য।[৩০] আবার ভরতের অযোধ্যা গমনকালে কেকয়রাজ ভরতকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কেকয়রাজ ভরতকে উত্তম হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম, বিরাটকায় অনেক কুকুর, দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা, ষোল হাজার অশ্ব এবং আরও অনেক ধনদান করেছিলেন। ভরতের মামা যুধাজিৎ ভরতকে দিয়েছিলেন ইন্দ্রশিরা নামক ঐরাবতের মতো অনেক সুদৃশ্য হস্তী, দ্রুতগামী ভারবহনক্ষম গর্দভরাজি এবং ধনরাশি।[৩১]

অপরাধীর দণ্ডবিধান

অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া হতো। যিনি দণ্ডনীয়ের প্রতি দণ্ডদান করেন এবং যিনি দোষ অনুসারে দণ্ডলাভ করেন, কার্যকারণ সিদ্ধির জন্য তাঁরা উভয়েই কখনও অবসন্ন হন না।[৩২] মৃত্যুপথযাত্রী বালীর উদ্দেশে রাম একথা বলেছেন। অপরাধীদের কারাগারে প্রেরণ করা হতো। চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া

হতো।[৩৩] রাবণের তিরস্কার এবং রাক্ষসীদের অত্যাচারে উৎপীড়িতা সীতার উক্তি থেকে এ বিষয়টি জানা যায়।

রাজদণ্ড

রাজদণ্ড খুব কঠোর ছিল। আগুন স্পর্শ করলেও বনে গাছ বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু রাজদণ্ড যদি স্পর্শ করে – তাহলে অপরাধীরা আর বাঁচে না।[৩৪]

ন্যায়বিচারে পুত্রও দণ্ডনীয়

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধী আপন সন্তান হলেও তাকে দণ্ড দেওয়া হতো। রাজা দশরথের মন্ত্রিমণ্ডলী ন্যায়বিচার করতেন। এমন কি তাঁদের পুত্রও অপরাধ করলে তাঁরা পুত্রদের যথাকালে দণ্ডদান করতেন।[৩৫]

ভিক্ষুকাদি বেশে চরের সাজ

বিপক্ষগণ যাতে প্রেরিত চরকে চিনতে না পারে, সেরূপ ছদ্মবেশে সজ্জিত করে চরকে রাষ্ট্রমধ্যে পাঠাতে হয়। ভিক্ষুক কিংবা সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত করে পাঠালে ফল ভালো হয়। কিষ্কিন্ধায় রাম-লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণের অভিপ্রায় জানার জন্য হনুমানকে চর হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সুগ্রীব হনুমানকে বলেছেন: বিশ্বাসের অযোগ্য শত্রুরা ছদ্মবেশে এসে, যারা বিশ্বাস করে তাদের ছিদ্র দেখে প্রহার করে। তাদেরকে জেনে রাখা উচিত। যাঁরা শত্রুকে ধ্বংস করতে জানেন, সাধারণ মানুষের চর নিযুক্ত করে তাঁদের অভিপ্রায় জেনে নিতে হবে। হে বানর, তুমি সাধারণভাবে ঐ দু'জনের কাছে গিয়ে ইঙ্গিত, আকার, প্রকার এবং কথার দ্বারা তাঁদের অভিপ্রায় জেনে নাও।[৩৬] হনুমান সুগ্রীবের কথানুসারে বানরের রূপ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী ভিক্ষুক রূপ ধারণ করে রাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়েছিলেন। মধুর ভাষায় তাঁদের প্রশংসা করেছিলেন। রাম-লক্ষ্মণের বনাগমনের কারণ, তাঁদের পরিচয় সবকিছু বুদ্ধিমান হনুমান জেনেছিলেন।

দূতের কাজ

দূতকে ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করে কাজ করতে হয়। দূত যদি দেশ-কালের বিরোধিতা করে কাজ করে, তাহলে সিদ্ধির মুখেও কার্যাবলি বিনষ্ট হয়। যে সকল দূত নিজেদের খুব পণ্ডিত মনে করে, কিসে ভালো হবে, কিসে অনর্থ হবে– এই নিশ্চিত বুদ্ধি তারা হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা কার্যহানিই করে থাকে।[৩৭]

দূত অবধ্য

সেকালে দূত অবধ্য ছিল। তবে অবস্থানুযায়ী তার প্রতি অন্যান্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। রাবণ হনুমানকে বধের আদেশ দিলে 'দূত অবধ্য'– এই যুক্তি দিয়ে বিভীষণ রাবণকে নিবৃত্ত করেছিলেন। বিভীষণ বলেছিলেন: হে রাজন্, সকল সময়েই দূত অবধ্য। সর্বত্রই সজ্জনেরা এই কথা বলেন। দূতকে বধ করতে নেই। তবে অপরাধের কারণে দূতের জন্য বহুবিধ দণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায়। সেগুলি হলো– অঙ্গের বিরূপতাসাধন, বেত্রাঘাত, মাথা মুড়িয়ে দেওয়া অথবা কোনো বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করা।[৩৮] ভালোই বলুক বা মন্দই বলুক, দূত অপরের অধীন। পরের অধীন যে, সে পরের কথা বলে। তাই দূতকে বধ করা উচিত নয়।[৩৯] এখানে উল্লেখ্য, হনুমান দূত হয়ে লঙ্কায় যান নি। তিনি গিয়েছিলেন সীতার অন্বেষণে। তবে তিনি বিভীষণের কারণে দূত হিসেবে গণ্য হয়েছেন।

শুক ও সারণ বানরের ছদ্মবেশে রাবণের গুপ্তচর হয়ে বানর সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করলে বিভীষণ আত্মগোপনকারী এ দুজনকে চিনতে পারলেন। বিভীষণ শুক ও সারণকে ধরে নিয়ে রামের কাছে বললেন: এ দুজন হলো রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ। গুপ্তচররূপে এরা এখানে প্রবেশ করেছে। তখন শুক ও সারণ ভয় পেয়ে ব্যথিত চিত্তে রামচন্দ্রকে বললেন : হে সৌম্য, রাবণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমরা উভয়ে এখানে এসেছি। এসেছি আপনার সেনাবাহিনীর শক্তি সামর্থ্য জানতে। তাদের কথা শুনে রামচন্দ্র হেসে বললেন: যদি সমগ্র সেনাবাহিনীকে দেখে থাক, আমাদেরও ভালোভাবে দেখে থাক, তাহলে এখন স্বচ্ছন্দে তোমরা চলে যাও। যদি কিছু এখনো দেখা না হয়ে ওঠে, আবার তা দেখে নিতে পার। কিংবা বিভীষণ পুনরায় সবকিছু সম্পূর্ণভাবে দেখিয়ে দেবে। তোমরা এখানে ধরা পড়েছ বলে প্রাণের ভয় করো না। তোমরা ধরা পড়লেও তোমাদের হাতে অস্ত্র নেই। তোমরা দূত, তাই অবধ্য।[৪০] শুক-সারণ মূলত দূত নয়, গুপ্তচর। যদিও রামচন্দ্র তাদের দূত বলেছেন, দূতের মর্যাদা দিয়েছেন।

অনুক্তবাদী দূত বধ্য

Dhaka University Institutional Repository

রাবণের দ্বারা প্রেরিত শুকরূপধারী রাক্ষসকে বানরসৈন্যরা আঘাত করলে বানরদের দ্বারা নিগৃহীত সেই শুক তখন বলেছিল: হে রামচন্দ্র, বানরদের আমায় মারতে বারণ করুন। তারা দূতকে মারছে। দূতকে মারা উচিত নয়। যে প্রভুর মত ত্যাগ করে নিজের মত প্রকাশ করে, সে অনুক্তবাদী। এমন দূতই বধ্য।[৪১]

রাজধর্মের বিপরীত কাজ করলে দূত বা চর বহিষ্কৃত হয়

রাবণ শুক-সারণকে চর করে রামচন্দ্রের বানর সৈন্যদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন। রাবণ জিজ্ঞাসা না করলেও শুক-সারণ দু'জন রাবণের সামনে বানর সৈন্যদের প্রশস্তি করেছেন। তখন রাবণ রাগান্বিত হয়ে তাদের বলেন: আচার্য, গুরু ও বৃদ্ধদের কাছে তোমরা বিদ্যা গ্রহণের জন্য বৃথাই উপাসনা করেছিলে। রাজধর্মের সারস্বরূপ যে অনুজীবী ধর্ম, তা তোমরা গ্রহণ করো নি। তখন রাগান্বিত হয়ে রাবণ তাঁদের রাজসভা হতে বহিষ্কার করেছিলেন।[৪২] তবে জিজ্ঞাসিত না হলেও গুপ্তচরের কাজ শত্রু বা বিপক্ষের শক্তির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া।

তথ্যসূত্র :

১. ন হি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্যা নরোত্তম।
চার্তুবর্ণহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা ॥
নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা ॥
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অধর্মাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে ॥ আদিকাণ্ড, ২৫/১৭-১৯

২. অপ্রমত্তো বলে কোশে দুর্গে জনপদে তথা।
ভবেথা গুহ রাজ্যং হি দুরারক্ষতমং মতম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫২/৭২

৩. কুমারে ভরতে বৃত্তির্বর্তিতব্যা চ রাজবৎ।
অজ্যেষ্ঠা অপি রাজানো রাজধর্মমনুস্মর ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৮/২০

৪. অর্থং বা যদি বা কামং শিষ্টাঃ শাস্ত্রেষ্বনাগতম্ ।
ব্যবস্যন্ত্যনু রাজানং ধর্মং পৌলস্ত্যনন্দন ॥
রাজা ধর্মশ্চ কামশ্চ দ্রব্যাণাং চোত্তমো নিধিঃ।
ধর্মঃ শুভং বা পাপং বা রাজমূলং প্রবর্ততে ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৫০/৯-১০

৫. পঞ্চ রূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ।

অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥
ঔষ্ণং তথা বিক্রমঞ্চ সৌমং দণ্ডং প্রসন্নতাম্ ।
ধারয়ন্তি মহাত্মানো রাজানঃ ক্ষণদাচর ॥
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ নিত্যদা।
ত্বং তু ধর্মমবিজ্ঞায় কেবলং মোহমাশ্রিতঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪০/১২-১৪

৬. সম্পৃষ্টেন তু বক্তব্যং সচিবেন বিপশ্চিতা।
উদ্যতাঞ্জলিনা রাজ্ঞো য ইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ ॥
বাক্যমপ্রতিকূলং তু মৃদুপূর্বং শুভং হিতম্ ।
উপচারেণ বক্তব্যো যুক্তঞ্চ বসুধাধিপঃ ॥
সাবমর্দং তু যদ্বাক্যমথবা হিতমুচ্যতে।
নাভিনন্দেত তদ্ রাজা মানার্থী মানবর্জিতম্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪০/৯-১১

৭. পরস্য বীর্যং স্ববলঞ্চ বুদ্ধ্বা স্থানং ক্ষয়ঞ্চৈব তথৈব বৃদ্ধিম্ ।
তথা স্বপক্ষেঽপ্যনুমৃশ্য বুদ্ধ্যা বদেৎ ক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৪/২২

৮. ইদং পুরস্যাস্য সরাক্ষসস্য রাজ্ঞশ্চ পথ্যং সসুহৃজ্জনস্য।
সম্যক্ হি বাক্যং স্বমৃতং ব্রবীমি নরেন্দ্রপুত্রায় দদাতু মৈথিলীম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৪/২১
নিবার্যমাণস্য ময়া হিতৈষিণা ন রোচতে তে বচনং নিশাচর। যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/২৬

৯. আদিকাণ্ড,৭ম সর্গ

১০. কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত মন্ত্রিণঃ ॥
মন্ত্রী বিজয়মূলং হি রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব।
সুসংবৃতো মন্ত্রিধূরৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥
কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্ ।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্যান্নিঃশ্রেয়সং মহৎ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/১৫-১৬, ২২

১১. অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহাঞ্শুচীন্ ।
শ্রেষ্ঠাঞ্জ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিযোজয়সি কর্মসু ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/২৬

১২. সুহৃদামর্থকৃচ্ছ্রেষু যুক্তং বুদ্ধিমতা সদা।
সমর্থেনোপসন্দেষ্টুং শাশ্বতীং ভূতিমিচ্ছতা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৭/৩৩

১৩. মন্ত্রসংবরণে শক্তাঃ শক্তাঃ সূক্ষ্মাসু বুদ্ধিষু। আদিকাণ্ড, ৭/১৯

১৪. মন্ত্রী বিজয়মূলং হি রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব।
সুসংবৃতো মন্ত্রিধূরৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিত্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাষ্ট্রং ন পরিধাবতি ॥
কচ্চিন্ন সুকৃতান্যেব কৃতরূপাণি বা পুনঃ।
বিদুস্তে সর্বকার্যাণি ন কর্তব্যানি পার্থিবাঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/১৬, ১৮, ২০

Dhaka University Institutional Repository

১৫. মন্ত্রস্ত্রিভির্হি সংযুক্তঃ সমর্থৈর্মন্ত্রনির্ণয়ে।
মিত্রৈর্বাপি সমানার্থৈর্বান্ধবৈরপি বাধিকৈঃ ॥
সহিতো মন্ত্রয়িত্বা যঃ কর্মারম্ভান্ প্রবর্তয়েৎ।
দৈবে চ কুরুতে যত্নং তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬/৭-৮

১৬. যো হি ভৃত্যো নিযুক্তঃ সন্ ভর্ত্তা কর্মাণি দুষ্করে।
কুর্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১/৭

১৭. একোঽর্থং বিমৃশেদেকো ধর্মে প্রকুরুতে মনঃ।
একঃ কার্যাণি কুরুতে তমাহুর্মধ্যমং নরম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬/৯

১৮. যো নিযুক্তঃ পরং কার্যং ন কুর্যাদ্ নৃপতেঃ প্রিয়ম্ ।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুর্মধ্যমং নরম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১/৮

১৯. গুণ-দোষৌ ন নিশ্চিত্য ত্যক্ত্বা দৈবব্যপাশ্রয়ম্ ।
করিষ্যামীতি যঃ কার্যমুপেক্ষেৎ স নরাধমঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬/১০

২০. নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্যং ন কুর্যাদ্ যঃ সমাহিতঃ।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড,১/৯

২১. ঐকমত্যমুপাগম্য শাস্ত্রদৃষ্টেন চক্ষুষা।
মন্ত্রিণো যত্র নিরতাস্তমাহুর্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬/১২

২২. বহ্বীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিণামর্থনির্ণয়ঃ।
পুনর্যত্রৈকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬/১৩

২৩. অন্যোন্যমতিমাস্থায় যত্র সম্প্রতিভাষ্যতে।
ন চৈকমত্যে শ্রেয়োঽস্তি মন্ত্রঃ সোঽধম উচ্যতে ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬/১৪

২৪. ত্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কর্মণাং যঃ প্রপদ্যতে।
সচিবৈঃ সময়ং কৃত্বা স সম্যগ্ বর্ততে পথি ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/৭
।

২৫. যথাগমঞ্চ যো রাজা সময়ঞ্চ চিকীর্ষতি।
বুধ্যতে সচিবৈর্বুদ্ধ্যা সুহৃদশ্চানুপশ্যতি ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/৮

২৬. ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে।
রাজা বা রাজমাত্রো বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্ ॥
উপপ্রদানং সান্ত্বঞ্চ ভেদং কালে চ বিক্রমম্ ।
যোগঞ্চ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠ তাবুভৌ চ নয়ানয়ৌ ॥
কালে ধর্মার্থকামান্ যঃ সম্মন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ।
নিষেবেতাত্মবাঁল্লোকে ন স ব্যসনমাপ্নুয়াৎ ॥
হিতানুবন্ধমালোক্য কুর্যাৎ কার্যমিহাত্মনঃ।

রাজা সহার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ সচিবৈর্বুদ্ধিজীবিভিঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/১০-১৩

২৭. ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্ ।
নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্ ॥
যে তু সভ্যাঃ সদো গত্বা তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে ।
যথাপ্রাপ্তং ন ব্রুবতে তে সর্ব্বেঽনৃতবাদিনঃ ॥
জানন্নবাব্রবীৎ প্রশ্নান্ কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াত্তথা ।
সহস্রবারুণান্ পাশানাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি ॥ উত্তরকাণ্ড, ১৩/৩৩-৩৫ (প্রক্ষিপ্ত)

২৮. প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে ।
আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্বে রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্ ॥
কৌশিকোঽথ যবক্রীতো গার্গ্যো গালব এব চ ।
কণ্বো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্বস্যাং দিশি যে শ্রিতাঃ ॥
স্বস্ত্যাত্রেয়শ্চ ভগবান্নমুচিঃ প্রমুচিস্তথা ।
অগস্ত্যোঽত্রিশ্চ ভগবান্ সুমুখো বিমুখস্তথা ॥
আজগ্মুস্তে সহাগস্ত্যা যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্ ।
নৃষঙ্গুঃ কবষো ধৌম্যঃ কৌষেয়শ্চ মহানৃষিঃ ॥
তেঽপ্যাজগ্মুঃ সশিষ্যা বৈ যে শ্রিতাঃ পশ্চিমাং দিশম্ ।
বসিষ্ঠঃ কশ্যপোঽথাত্রির্বিশ্বামিত্রঃ সগৌতমঃ ॥
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তেঽপি সপ্তর্ষয়স্তথা ।
উদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ ॥ উত্তরকাণ্ড, ১/১-৬

২৯. সমীপং রাঘবস্যাশু প্রবিবেশ মহাত্মনঃ ।
নয়েঙ্গিতজ্ঞঃ সদ্বৃত্তো দক্ষো ধৈর্যসমন্বিতঃ ॥ উত্তরকাণ্ড, ১/১০

৩০. ইমানি চ মহার্হাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ।
প্রতিগৃহ্য বিশালাক্ষ মাতুলস্য চ দাপয় ॥
অত্র বিংশতিকোট্যস্তু নৃপতের্মাতুলস্য তে ।
দশকোট্যস্তু সম্পূর্ণাস্তথৈব চ নৃপাত্মজ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০/৪-৫

৩১. তস্মৈ হস্ত্যুত্তমাংশ্চিত্রান্ কম্বলানজিনানি চ ।
সৎকৃত্য কেকয়ো রাজা ভরতায় দদৌ ধনম্ ॥
অন্তঃপুরেঽতিসংবৃদ্ধান্ ব্যাঘ্রবীর্যাবলোপমান্ ।
দংষ্ট্রাযুক্তান্ মহাকায়ান্ শুনশ্চোপায়নং দদৌ ॥
রুক্মনিষ্কসহস্রে দ্বে ষোড়শাশ্বশতানি চ ।
সৎকৃত্য কৈকয়ীপুত্রং কেকয়ো ধনমাদিশৎ ॥
ঐরাবতানৈন্দ্রশিরান্ নাগান্ বৈ প্রিয়দর্শনান্ ।
খরান্ শীঘ্রান্ সুসংযুক্তান্ মাতুলোঽস্মৈ ধনং দদৌ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০/১৯-২১,২৩

৩২. দণ্ডে যঃ পাতয়েদ্দণ্ড দণ্ড্যো যশ্চাপি দণ্ড্যতে ।
কার্যকারণসিদ্ধার্থাবুভৌ তৌ নাবসীদতঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮/৬১

৩৩. দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া মাসৌ চিরায়াভিগমিষ্যতো দ্বৌ ।

বদ্ধস্য বধ্যস্য যথা নিশান্তে রাজোপরোধাদিব তস্করস্য ॥ সুন্দরকাণ্ড, ২৮/৭

৩৪. অপ্যেব দহনং স্পৃষ্ট্বা বনে তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।
রাজদণ্ড পরামৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ২৯/১২

৩৫. প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি ॥ আদিকাণ্ড, ৭/১০

৩৬. অরয়শ্চ মনুষ্যেণ বিজ্ঞেয়াশ্ছদ্মচারিণঃ।
বিশ্বস্তানামবিশ্বস্তাশ্ছিদ্রেষু প্রহরন্ত্যপি ॥
তৌ ত্বয়া প্রাকৃতেনেব গত্বা জ্ঞেয়ৌ প্লবঙ্গম।
ইঙ্গিতানাং প্রকারৈশ্চ রূপব্যাভাষণেন চ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২/২২, ২৪

৩৭. কিং কার্যমস্য বৈ ব্রূত দণ্ডো বৈ কেঽস্য পাত্যতাম্ ।
সম্যক্প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥ উত্তরকাণ্ড, ১২/৩২ (প্রক্ষিপ্ত)

৩৮. প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র ধর্মার্থতত্ত্বং বচনং শৃণুষ্ব।
দূতা ন বধ্যাঃ সময়েষু রাজন্ সর্বেষু সর্বত্র বদন্তি সন্তঃ ॥
অসংশয়ং শত্রুরয়ং প্রবৃদ্ধঃ কৃতং হ্যনেনাপ্রিয়মপ্রমেয়ম্।
ন দূতবধ্যং প্রবদন্তি সন্তো দূতস্য দৃষ্টা বহবো হি দণ্ডাঃ ॥
বৈরূপ্যমঙ্গেষু কশাভিঘাতো মৌণ্ড্যং তথা লক্ষণসন্নিপাতঃ।
এতান্ হি দুতে প্রবদন্তি দণ্ডান্ বধস্তু দুতস্য ন নঃ শ্রুতেঽস্তি ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৫২/১৩-১৫

৩৯. সাধুর্বা যদি বাসাধুঃ পরৈরেষ সমর্পিতঃ।
ব্রুবন্ পরার্থং পরবান্ ন দূতো বধমর্হতি ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৫২/২১

৪০. তস্যৈতৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য মন্ত্রিণৌ শুক-সারণৌ।
লঙ্কায়াঃ সমনুপ্রাপ্তৌ চারৌ পরপুরঞ্জয় ॥
তৌ দৃষ্ট্বা ব্যথিতৌ রামং নিরাশৌ জীবিতে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ ভীতৌ বচনং চেদমূচতুঃ ॥
আবামিহাগতৌ সৌম্য রাবণপ্রহিতাবুভৌ।
পরিজ্ঞাতুং বলং সর্বং তদিদং রঘুনন্দন ॥
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রহসন্ বাকং সর্বভূতহিতে রতঃ ॥
যদি দৃষ্টং বলং সর্বং বয়ং বা সুসমাহিতাঃ।
যথোক্তং বা কৃতং কার্য্যং ছন্দতঃ প্রতিগম্যতাম্ ॥
অথ কিঞ্চিদদৃষ্টং বা ভূয়স্তদ্ দ্রষ্টুমর্হথঃ।
বিভীষণো বা কার্ৎস্ন্যেন পুনঃ সন্দর্শয়িষ্যতি ॥
ন চেদং গ্রহণং প্রাপ্য ভেতব্যং জীবিতং প্রতি।
ন্যস্তশস্ত্রৌ গৃহীতৌ চ ন দূতৌ বধমর্হথঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ২৫/১৪-২০

৪১. ন দূতান্ ঘ্নন্তি কাকুৎস্থ বার্যন্তাং সাধু বানরাঃ।
যস্তু হিত্বা মতং ভর্তুঃ স্বমতং সম্প্রধারয়েৎ ।
অনুক্তবাদী দূতঃ সন্ স দূতো বধমর্হতি ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ২০/১৮

Dhaka University Institutional Repository

৪২. রিপূণাং প্রতিকূলানাং যুদ্ধার্থমভিবর্ততাম্ ।
উভাভ্যাং সদৃশং নাম বক্তুমপ্রস্তবে স্তবম্ ॥
আচার্যা গুরবো বৃদ্ধা বৃথা বাং পর্যুপাসিতাঃ ।
সারং যদ্ রাজশাস্ত্রাণামনুজীব্যং ন গৃহ্যতে ॥ যুদ্ধকাণ্ড,২৯/৮-৯

সব যুগে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চলছেও। বৃহৎ যুদ্ধগুলিই মানুষের কাছে বেশি স্মরণীয় ও আলোচনীয়। রামায়ণের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে যুদ্ধ। রাম-রাবণের যুদ্ধ। যুগবিভাগে এটি ত্রেতা যুগের যুদ্ধও। এই যুদ্ধের নিয়ম-নীতি কেমন ছিল, যুদ্ধের যানবাহন কেমন ছিল, যোদ্ধাদের পোশাক কেমন ছিল ইত্যাদি এখানে আলোচ্য।

যুদ্ধের পোশাক ও সাজসজ্জা

হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় জম্বুমালীর পরিধানে ছিল রক্তবস্ত্র। গলায় রক্তপুষ্পের মালা। সাধারণ ফুলের মালাও তার গলায় ছিল। কানে ছিল কুণ্ডল।[১] কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রাকালে রাবণ নিজ হাতে তাকে মণিময় মালায় ভূষিত করেন। কেয়ূর, আংটি, চন্দ্রের মতো হার এবং রমণীয় অলঙ্কার পরিয়ে দিয়েছেন। দিব্য ও সুগন্ধি মালা দিয়ে তাকে সাজিয়েছেন। দুই কানে পরিয়েছেন কুণ্ডল।[২] ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর এবং মহাপার্শ্ব রাবণের এই ছয় পুত্র যুদ্ধযাত্রাকালে স্বর্ণকিরীট পরিধান করেছিল। মহাবলশালী যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী এই ছয়জন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সর্বৌষধি এবং গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত হয়েছিল।[৩] যুদ্ধকালে অতিকায় পরেছিল রক্তপুষ্পের মালা। তার বাহুদুটি ছিল সোনার কেয়ূরে ভূষিত। তার কর্ণদ্বয় ছিল স্বর্ণকুণ্ডলে শোভিত।[৪]

প্রত্যেক যোদ্ধার কবচ ব্যবহার

সব যোদ্ধা কবচ বা বর্ম পরিধান করত। বিচিত্র কবচের ব্যবহার ছিল। কুম্ভকর্ণের বর্ম ছিল সোনার তৈরি। সেটি ছিল বেশ হালকা ও দুর্ভেদ্য এবং বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল। নিজের দীপ্তিতেই জাজ্বল্যমান।[৫] রাবণপুত্র অতিকায়ের কবচ ছিল হীরকখচিত।[৬]

যুদ্ধে বালক-বৃদ্ধ অবধ্য

যুদ্ধ হলেই লোকক্ষয় হবে। যুদ্ধ হলেই অসংখ্য মানুষ হতাহত হবে। এটাই স্বভাবিক। তবে সেকালের যুদ্ধে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলার বিধান ছিল। যে কাউকে হত্যা করা যেত না। বালক এবং বৃদ্ধ অবধ্য ছিল। গরুড় রামচন্দ্রকে বলেছেন: যুদ্ধে আপনি শরের তরঙ্গ সৃষ্টি করবেন। বালক ও

বৃদ্ধদেরকে ছেড়ে দিয়ে সমগ্র লঙ্কাকে ধ্বংস করে, শত্রু রাবণকে হত্যা করে আপনি সীতাকে লাভ করবেন।[৭]

যুদ্ধের পূর্বে নগর রক্ষায় সৈন্য নিয়োগ

যুদ্ধের সময় যুদ্ধনিরত দুপক্ষেরই ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। সে কারণে প্রথমেই নিজপক্ষ নিজের দুর্গ সুরক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক। এ বিষয়টা সে সময়ে বিশেষভাবে দেখা হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর লঙ্কা নগরী সুরক্ষায় সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে সেনাপতি প্রহস্ত যুদ্ধবিদ্যায় কৃতবিদ্য, হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক এই চতুর্বিধ সৈন্য নগর রক্ষায় নিয়োজিত করেন। তিনি নগরের বাইরে ও ভেতরে সৈন্যদেরকে যথাস্থানে নিয়োগ করেছিলেন।[৮]

লঙ্কাপুরীর সুরক্ষায় বিভিন্ন দ্বারে সেনাপতি নিয়োগ

রামচন্দ্রের আক্রমণ হতে সুরক্ষার জন্য রাবণ লঙ্কার বিভিন্ন দ্বারে সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। লঙ্কার পূর্ব দ্বারে সৈন্য নিয়ে অবস্থান করেন সেনাপতি প্রহস্ত। দক্ষিণ দ্বারের দায়িত্বে ছিলেন মহাবীর মহাপার্শ্ব ও মহোদর। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বারের দায়িত্বে ছিলেন। উত্তর দ্বারে রাক্ষসরাজ রাবণ অবস্থান করেছিলেন।

লঙ্কাপুরীর বিভিন্ন দ্বারে আক্রমণ করার জন্য রামচন্দ্রের সেনাপতি নিয়োগ

লঙ্কাপুরীকে আক্রমণ করার জন্য রামচন্দ্র পূর্বদ্বারে বানরশ্রেষ্ঠ নীলকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। দক্ষিণদ্বারে বালীপুত্র অঙ্গদকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পবনপুত্র হনুমানের দায়িত্ব ছিল পশ্চিমদ্বারে। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্র নগরের উত্তরদ্বারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তঁদের সঙ্গে ছিলেন বিভীষণ ও তাঁর সচিব চারজন রাক্ষস।

প্রতিপক্ষের শক্তি বিচার করে যুদ্ধ করা উচিত

যুদ্ধের পূর্বে প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা উচিত। প্রতিপক্ষের শক্তি অধিক থাকলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অনুচিত। এ সম্পর্কে কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলেছেন: বিপক্ষের বল অধিক দেখেও যে যুদ্ধ করার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, শত্রুরা তখন তার ছিদ্র দেখতে পায়। পাখি যেমন ক্রৌঞ্চপর্বতে

আকাশের মতো ছিদ্র অন্বেষণ করে, তেমনি শত্রুও সেই ব্যক্তির ছিদ্র অন্বেষণ করে।[৯] রাবণের মাতামহ মাল্যবান রাবণকে বলেছেন: শত্রুর থেকে নিজে হীনবল হলে সেই শত্রুর সঙ্গে এবং সমান বলশালীর সঙ্গেও রাজার সন্ধি করা উচিত। শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তার থেকে নিজে শক্তিতে বড় হলেই শুধু যুদ্ধ করা উচিত।[১০] কুম্ভকর্ণ ও মাল্যবান উভয়েই রাবণকে রামের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের জন্য অনুরোধ করতে গিয়ে উপর্যুক্ত উক্তি করেছেন।

যুদ্ধের উৎকৃষ্ট সময়

প্রত্যেক যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর অনেক নির্ভর করতে হয়। এজন্য শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর অবস্থা দেখে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হয। সে সময় চৈত্র ও অগ্রহায়ণ মাস ছিল যুদ্ধযাত্রার জন্য উৎকৃষ্ট সময়। এ সম্পর্কে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলেছেন: এ সময় (অগ্রহায়ণ মাস) রাজারা বিজয় লাভের ইচ্ছায় যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে।[১১] যুদ্ধযাত্রার জন্য তিথি-নক্ষত্রযুক্ত শুভক্ষণও দেখা হতো। লঙ্কা হতে হনুমানের ফেরার পর সীতাদেবীর সংবাদ জেনে রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলেছেন: আজ উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র। কাল হস্তানক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে। সুগ্রীব, আজই এই শুভদিনে সৈন্যসকল সঙ্গে নিয়ে চলো। আজই আমরা যাত্রা করব।[১২] অমাবস্যা তিথিতে হতবান্ধব রাবণ যুদ্ধযাত্রা করেন। রাবণের অন্যতম অমাত্য সুপার্শ্ব রাবণকে বলেছেন: আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। আজ যুদ্ধের আয়োজন করে বিজয়ের জন্য সৈন্যদেরকে নিয়ে অমাবস্যায় যাত্রা করবেন।[১৩]

যুদ্ধযাত্রাকালে গুরুজনকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার

যুদ্ধযাত্রাকালে বীরযোদ্ধা গুরুজনকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন। কুম্ভকর্ণ যুদ্ধযাত্রকালে তাঁর অগ্রজ রাবণকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করেছিলেন। রাবণ তাঁকে আলিঙ্গন করে যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ করেছিলেন।[১৪] যুদ্ধোন্মত্ত এবং মত্ত নামক দুই ভাই রাবণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে যুদ্ধযাত্রা করেছিল।[১৫] রামানুজ লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাত্রার পূর্বে রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করে তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেছিলেন।[১৬]

যুদ্ধকালে যুদ্ধজয়ে যজ্ঞাদি সম্পাদন

যুদ্ধের সঙ্গে ধর্ম-কর্মের সম্পর্ক ছিল। তাই যুদ্ধকালেও যজ্ঞ সম্পন্ন করা হতো। ইন্দ্রজিৎ রণভূমিতে গিয়ে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলেন। রাবণ ইন্দ্রজিতের যুদ্ধগমন উপলক্ষে শাস্ত্রবিধি অনুসারে

উত্তমমন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞে ঘৃত, খৈ দিয়ে আহুতি দিয়েছিলেন। মাল্য ও গন্ধের দ্বারা অগ্নিদেবকে অর্চনা করেছিলেন।[১৭]

দেবরাজ ইন্দ্র প্রেরিত রামচন্দ্রের রথের বর্ণনা

যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত যুদ্ধযানের প্রয়োজন হয়। এর ওপর যুদ্ধের জয-পরাজয়ও অনেকটা নির্ভর করে। রাম-রাবণের যুদ্ধকালে দেখা যায়, দেবরাজ ইন্দ্র সারথি মাতলিসহ রামচন্দ্রের কাছে কারুকার্যখচিত যুদ্ধরথ পাঠিয়েছিলেন। রথের ঘোড়াগুলি ছিল সবুজ বর্ণের। রথটি ছিল সুবর্ণ রেখায় চিত্রিত, একশত কিঙ্কিণিতে ভূষিত। নবোদিত সূর্যের মতো তার দীপ্তি। বসার স্থানটি বৈদূর্যমণির দ্বারা নির্মিত। সোনার মালায় শোভিত অশ্বগুলির কেশরসমূহ ছিল শুভ্রবর্ণ। রথের পতাকা ছিল সোনার তৈরি।[১৮] এখানে উল্লেখ্য, রামচন্দ্রের উপযুক্ত যুদ্ধযান ছিল না। এদিক দিয়ে রামের তুলনায় রাবণ অনেক এগিয়ে ছিলেন।

রাবণের রথের বর্ণনা

রাবণের যুদ্ধরথ ছিল গন্ধর্ব নগরের মতো সুবিশাল। সোনার হারে সজ্জিত অশ্বযুক্ত সেই রথ। যুদ্ধের নানা উপকরণে পূর্ণ ও পতাকাশোভিত। আকাশে সূর্যোজ্জ্বল বিমানের মতো সেই রথ। রথের পতাকাগুলি যেন বিদ্যুতের ছটা।[১৯]

যুদ্ধক্ষেত্রে রথচালকের গুণাবলি ও কর্তব্য

যোদ্ধার মতো যুদ্ধরথের চালককেও অনেক পারদর্শী হতে হতো। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে চালকেরও অনেক দায়িত্ব থাকত। যুদ্ধক্ষেত্রে রথচালককে বিভিন্ন গুণের অধিকারী হতে হতো। দেশ-কাল এবং শুভ ও অশুভ লক্ষণ ও ইঙ্গিত সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হতো। তাকে জানতে হতো দৈন্য, হর্ষ ও খেদ। রথীর বলাবল সম্পর্কেও তার জানতে হতো। যুদ্ধক্ষেত্রে যে-স্থান দিয়ে রথ চলাচল করবে, সে স্থানের নিম্নতা, ভূমির সমতা ও বন্ধুরতা সম্পর্কেও তাকে জানতে হতো। যুদ্ধের যথোচিত সময় এবং শত্রুর ছিদ্র তাকে জানতে হতো। কখন রথ এগিয়ে নিতে হবে, কখন পালিয়ে যেতে হবে, কখন মরে যেতে হবে এ সবই রথস্থ সারথিকে জানতে হতো। রথের সারথি ছিলেন মূলত রথের কুটুম্ব।[২০]

অস্ত্র-শস্ত্র

যুদ্ধকালে নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। সেই অস্ত্রের বিভিন্ন নাম এবং ধ্বংসকারী শক্তির কথাও আছে। রামায়ণের যুগে ব্যবহৃত বিবিধ অস্ত্রের কথা জানা যায়।

দিব্যাস্ত্র

রামায়ণে অনেক দিব্যাস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষি বিশ্বামিত্র তপস্যা করে বহু দিব্যাস্ত্র লাভ করেছিলেন। 'দিব্য' নাম শুনেই বোঝা যায় যে তা ছিল দৈব ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র। মূলত এগুলি খুবই উন্নত মানের অস্ত্র। দিব্যাস্ত্রের সৃষ্টি ও প্রয়োগবিধি অত্যন্ত গোপনীয় ছিল। গুরুর মাধ্যমেই সাধনা দ্বারা এ দিব্যাস্ত্র লাভ সম্ভব ছিল।

ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে রামচন্দ্রের বিভিন্ন দিব্যাস্ত্র লাভ

তাড়কাবধের পর বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে রামচন্দ্রকে বলেন: তোমার মঙ্গল হোক। আজ তোমাকে দিব্যাস্ত্র সকল দান করব।[২১] ঋষি বিশ্বামিত্র বিভিন্ন দিব্যাস্ত্রের নাম রামচন্দ্রের কাছে বলেছেন। সে অস্ত্রসমূহের ছিল বিবিধ শক্তি, বিবিধ বর্ণ ও আকৃতি। বিশ্বামিত্র আবাহন মন্ত্র জপ করলে সেই মন্ত্রবলে রামের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিল দিব্য উজ্জ্বলধারী আয়ুধ মূর্তি। বিদ্যুতের রেখায় রেখায় তাদের দীপ্তি ঝলসিত। কেউ চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ; কেউ সূর্যের মতো প্রখর। কেউ বা পিঙ্গল, ধূম্র ধুসর আবার কেউ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। অগ্নির মতো আবর্তিত কালচক্র, দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, বিষ্ণুচক্র। বজ্রশুল ব্রহ্মশিরা, ঐষীকী মোদকী শিখরী। ধর্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ। কঙ্কাল মুষল কাপাল কিঙ্কিণি। নারায়ণ অস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র। ইচ্ছামতো রূপধারী এ অস্ত্রসমূহ সকল দেবতার দীপ্ত তপস্যার তেজ। বিশ্বামিত্র ধ্যানচিত্তে প্রতিটা অস্ত্রের আবাহন, প্রয়োগ ও প্রত্যাহার মন্ত্র রামচন্দ্রকে দান করেছেন। রামচন্দ্রও পবিত্র হয়ে ভক্তিভাবে তা গ্রহণ করেছেন।

রামচন্দ্রের দিব্যাস্ত্র লাভের পর উজ্জ্বলমূর্তি অস্ত্ররূপী দেবশক্তিরা কৃতাঞ্জলি হয়ে মধুর ভাষায় রামচন্দ্রকে বলেন: হে নরশ্রেষ্ঠ, বলুন আমরা এখন কী করব ?[২২] প্রসন্ন মনে রামচন্দ্র সাদরে তাঁদের করস্পর্শ করে বলেন: এখন তোমাদের ইচ্ছামতো তোমরা যাও। কার্যকালে আমার মনে অধিষ্ঠান থেকে সাহায্য করো।[২৩]

ঋষি অগস্ত্য কর্তৃক রামচন্দ্রকে দিব্যাস্ত্র দান

ঋষিদের নির্বিঘ্নে তপস্যার জন্য, রাক্ষসদের দমন করার উদ্দেশ্যে ঋষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে অনেক দিব্য অস্ত্র দান করেছিলেন। অস্ত্রদান করার সময় অগস্ত্য রামচন্দ্রকে বলেছিলেন: এই স্বর্ণভূষিত স্বর্গীয় বিরাট ধনুটি, হে পুরুষ, বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত এবং বিষ্ণুকে নিবেদিত। সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল ব্রহ্মদত্ত নামক এই অব্যর্থ শর, তূণীর এবং অক্ষয় দুটি বাণ মহেন্দ্র আমায় দিয়েছিলেন। নিখুঁত এই তীক্ষ্ম বাণ দুটি আগুনের মতো জ্বল জ্বল করছে। সোনায় মোড়া এই তরবারি ভালো রূপার খাপে ভরা। ইন্দ্র যেমন জয়ের জন্য বজ্রধারণ করেন, তেমনি হে মানদ, এই ধনু, তূণীর, শর ও খড়্গ জয়ের জন্য গ্রহণ করো।[২৪]

কারুকার্যখচিত অস্ত্র

অনেক বীরযোদ্ধা শখ করে তাঁদের অস্ত্রে বিভিন্ন রত্নদ্বারা কারুকার্য করাতেন। লক্ষ্মণ যে বাণদ্বারা রাবণপুত্র অতিকায়কে হত্যা করেছিলেন, তা ছিল হীরাদ্বারা চিত্রিত ও উত্তম সুবর্ণে নির্মিত।[২৫]কুম্ভকর্ণের শূল ছিল কালো লোহার তৈরি এবং তপ্ত স্বর্ণদ্বারা ভূষিত ও রক্তবর্ণ পুষ্পশোভিত।

খর প্রেরিত চৌদ্দজন রাক্ষসের অস্ত্র

রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করার জন্য খর যে চৌদ্দজন রাক্ষসকে পাঠিয়েছিল তাদের হাতে ছিল পরিঘ, শূল ও পট্টিশ।[২৬]

খরের অস্ত্র ও যুদ্ধরথের বর্ণনা

খর পরশ্বধ অস্ত্রদ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করতে চেয়েছিল।[২৭] ধনু, শর, বিচিত্র খড়্গ, নানাবিধ ধারাল অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খর পঞ্চবটীতে যুদ্ধের জন্য গমন করেছিল। খরের ছিল বিচিত্র উত্তম অশ্বে যোজিত, সূর্যবর্ণের বিশাল রথ। মেরু পর্বতের শিখরের মতো উঁচু উজ্জ্বল স্বর্ণে ভূষিত সেই রথ। তার চাকা ছিল সোনার তৈরি। অব্যাহত তার গতি। লম্বা খুঁটিগুলি বৈদূর্যমণিতে খচিত। তাতে মঙ্গলসূচক চিত্রে আঁকা ছিল মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পাহাড়, চন্দ্রকান্তমণি, সুবর্ণ, পাখির ঝাঁক ও তারা। রথটি ছিল পতাকাশোভিত ও উত্তম কিঙ্কিণি দ্বারা ভূষিত। খড়্গ, মুগুর, পট্টিশ, শূল, অত্যন্ত ধারাল কুঠার, চক্র, তোমর, শক্তি, ভয়ানক পরিঘ, বিশাল ধনু, গদা, তরবারি, মুসল, বজ্র দ্বারা পূর্ণ ছিল খরের রথ।[২৮]

মায়াযুদ্ধ

রাক্ষসেরা সাধারণত মায়াযুদ্ধে পারদর্শী হতো। মায়াযুদ্ধে মূলত যোদ্ধা ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে। বিপক্ষ যোদ্ধার কাছে মায়াযোদ্ধা অদৃশ্য হয়ে থাকে। অথবা মায়াযোদ্ধা বিচিত্র ছদ্মবেশ কিংবা বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা বিপক্ষ যোদ্ধা বুঝতে পারে না। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ছিলেন মায়াযুদ্ধে পারদর্শী। ইন্দ্রজিৎ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পৌরোহিত্যে সাতটি দুর্লভ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞে সিদ্ধ ইন্দ্রজিৎকে মহাদেব বরদান করে তাকে অক্ষয় তূণ, দুর্জয় ধনু, ব্রহ্মশিরা অস্ত্র ও তামসী মায়াবিদ্যা দান করেন।[২৯] ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর রাক্ষসী মায়া দিয়ে বানরদের মোহিত করেছিলেন। তার ঐন্দ্রজালিক মায়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে বানর বীরগণ সীতাদেবীকে তার হাতে বধ হতে দেখেছে। বিভীষণ ইন্দ্রজিতের এ মায়াশক্তির কথা জানতেন। তিনি তখন সবার সামনে ইন্দ্রজিতের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে বলেন: ইন্দ্রজিৎ যাকে হত্যা করেছে, সে প্রকৃত সীতা নয়। রাক্ষসী প্রহেলিকা দিয়ে গড়া এ এক মায়া সীতা।[৩০] রাবণেরও অনেক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ছিল। রাবণ মায়ারচিত রামচন্দ্রের মস্তক দেখিয়ে সীতাদেবীকে মোহিত করার চেষ্টা করেন। মায়াময় রামচন্দ্রের ছিন্ন মস্তক দেখে সীতা শোকে বিলাপ করেন। রাবণ চলে গেলে বিভীষণপত্নী সরমা সীতাদেবীকে বলেন: ক্রূরকর্মা মায়াবী রাবণ তোমার কাছে রামের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়ে ছলনা করেছে।[৩১]

লঙ্কাপুরীতে বিভিন্ন বেশে অস্ত্রধারী চর

বিপক্ষ শত্রুদের বিভ্রান্ত করা এবং তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য চরের প্রযোগ সব যুগেই দেখা যায়। হনুমান লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে বহু চরকে দেখেছিলেন। তাদের কেউ দীক্ষিত, কেউ জটাধারী, কেউ বা মুণ্ডিতমস্তক, আবার কেউ বা গরুর এবং হরিণের চামড়া পরিধান করে ছিল। তাদের কারো হাতে ছিল মুঠো করা কুশের অস্ত্র। কেউ বা আগুনের কুণ্ডকেই অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিল। কারো হাতে ছিল লৌহপিণ্ডরূপ অস্ত্র। কেউ বা মুগুরকে অস্ত্র হিসেবে হাতে নিয়েছিল। কারো হাতে ছিল বড় লাঠি, ধনু, তরবারি, শতঘ্নী, মুষল, পরিঘ নানাবিধ অস্ত্র। কেউ হাতে নিয়েছিল শক্তি নামক অস্ত্র, গাছের বড় বড় ডাল, পট্টিশ, অশনি, ক্ষেপণি তথা বল্লম, কারো বা হাতে ছিল পাশ (ফাঁদ)।

লঙ্কায় কিঙ্কর রাক্ষসদের ব্যবহৃত অস্ত্র

হনুমান লঙ্কার প্রমদবনকে বিধ্বস্ত করলে রাবণের নির্দেশে কিঙ্কর রাক্ষসেরা বিচিত্র গদা, পরিঘ, মুগুর, পট্টিশ, শূল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র হাতে নিয়ে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।[৩২]

যুদ্ধে গুপ্তচরদের ভূমিকা

বুদ্ধিমান রাজারা যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে শত্রুপক্ষের শক্তি জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। গুপ্তচরদের মাধ্যমে সবকিছু জেনে রাজারা যুদ্ধে অল্প আয়াসেই শত্রুপক্ষকে নিরস্ত্র করতে পারতেন।[৩৩]

সম্মুখ সমরে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের জন্য সম্মানের

ক্ষত্রিয়ের প্রধান কাজ হলো ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ। সম্মুখ সমরে মৃত্যুবরণ করা ক্ষত্রিয়-ধর্মসম্মত। তাই যুদ্ধে কোনো ক্ষত্রিয় নিহত হলে শোক করা উচিত নয়। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতার শোকে বিভীষণ বিলাপ করলে রামচন্দ্র তখন বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: অভ্যুদয়ের আশায় ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে গিয়ে যাঁরা সম্মুখ সমরে মৃত্যুবরণ করেন, তাদের জন্য শোক করতে নেই।[৩৪]

লঙ্কার সৈন্য সংখ্যা

যুদ্ধের সময় বিপক্ষ শত্রুর সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে বালীপত্নী তারা রাবণের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলেন: লঙ্কায় রয়েছে ১০০ কোটি সহস্র, ৩৬ অযুত, ৩৬ হাজার, ৩৬ শত রাক্ষস সৈন্য।

বিজয়ের জন্য রামচন্দ্রের 'আদিত্যহৃদয়' স্তোত্রপাঠ।

যুদ্ধজয়ের জন্য নানা ধরণের মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার ছিল এবং কোনো দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য স্তব-স্তুতি করা হতো। যুদ্ধক্ষেত্রে অগস্ত্য ঋষি রামচন্দ্রকে 'আদিত্যহৃদয়' স্ত্রোত্রপাঠ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এ স্তোত্র শত্রুকে জয় করার মন্ত্র। অগস্ত্য ঋষি রামচন্দ্রকে বলেন: হে মহাবীর রাম, গোপনীয় কিন্তু চিরন্তন 'আদিত্যহৃদয়' স্তব তোমাকে দান করছি। এর দ্বারাই যুদ্ধে সব শত্রুকে তুমি জয় করবে।[৩৫] রামচন্দ্র সূর্যের দিকে তাকিয়ে 'আদিত্যহৃদয় ' স্তোত্র জপ করে পরম আনন্দ লাভ করেন। এরপর তিনি ধনু ধারণ করে রাবণকে হত্যায় উদ্যত হন।

অমলেশ ভট্টাচার্য তাঁর 'রামায়ণ কথা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন –"মনে পড়ে মহাভারতের যুদ্ধের প্রাক্কালেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়েছিলেন এক সর্বজয়ী মন্ত্র– দুর্গাস্তোত্র। 'পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়' (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ২৩/২)। কেননা মন্ত্রই হলো দেবতার শক্তিরূপ। দেবতাদের মন্ত্রময় শরীর। মহাভারতের দুর্গাস্তোত্র আর রামায়ণের আদিত্যহৃদয় মন্ত্র স্বরূপত একই শক্তি। সকল দেবতার তেজোরাশি সংহত হয়ে আবির্ভূতা হন স্বয়ং দুর্গা। সুতরাং দুর্গা হলেন দেবতাদের হৃৎশক্তি। আবার দেবতারা অদিতির পুত্র। তাঁদের সাধারণ নাম আদিত্য। বিভিন্ন দেবতা একই দেবতার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ – " একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি"। ঋষি কাত্যায়ন তাঁর 'সর্বানুক্রমণী' গ্রন্থে বলেছেন, " একৈব দেবতা স্তূয়তে আদিত্য ইতি"। সুতরাং মহাভারতের দুর্গাস্তোত্র আর রামায়ণের আদিত্য হৃদয় মন্ত্র মূলত এক।" পৃষ্ঠা, ২৬০

শঙ্খধ্বনি ও রণবাদ্য

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীরপুরুষদের যুদ্ধকর্মে সাহস ও প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শঙ্খধ্বনিসহ বিভিন্ন রণবাদ্যরত সৈনিকেরা তাদের অনুগমন করত।[৩৬] ভেরীনাদের দ্বারা যোদ্ধাদের যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে আহ্বান করা হতো। লঙ্কা নগরীতে ভেরী বাজানোর শব্দ শুনে সরমা সীতাদেবীকে বলেন: হে মৃদুস্বভাবা, এটি হলো ভেরীর তুমুল শব্দ। এই শব্দ শুনে সৈনিকেরা বর্ম পরিধান করে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। মেঘের মতো গম্ভীর ঐ 'ভেরীনাদ' তুমি শোনো।[৩৭]

যুদ্ধকালে বীরধর্ম পরিত্যাগ করে পলায়ন অকীর্তিকর

যুদ্ধকালে প্রতিপক্ষের বীরত্ব দেখে ভয় পেয়ে পলায়ন ছিল অসম্মানের। লঙ্কায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাটকায় কুম্ভকর্ণকে দেখে বানরসৈন্যরা পলায়নপর হয়েছিল। তখন বানরবীর অঙ্গদ তাদের যুদ্ধে ফিরিয়ে আনার জন্য বীরধর্ম সম্পর্কে বলেন: যারা ভীরু তাদের জীবন ধিকৃত। সৎপুরুষেরাই বীর। তাঁরা ভয়কে জয় করে। বীরের মতো যুদ্ধ করে যাঁরা মারা যান, তাঁরা ব্রহ্মলোকে গতিলাভ করেন। ভীরুযোদ্ধারা কখনও ব্রহ্মলোক লাভ করতে পারে না।[৩৮]

তথ্যসূত্র:

১. রক্তমাল্যাম্বরধরঃ স্রগ্বী রুচিরকুণ্ডলঃ।
মহান্ বিবৃত্তনয়নশ্চণ্ডঃ সমরদুর্জয়ঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৪৪/২

২. অথাসনাৎ সমুৎপত্য স্রজং মণিকৃতীন্তরাম্ ।
আববন্ধ মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ ॥
অঙ্গদান্যঙ্গুলীবেষ্টান্ বরাণ্যাভরণানি চ ।
হারঞ্চ শশিসঙ্কাশমাববন্ধ মহাত্মনঃ ॥
দিব্যানি চ সুগন্ধীনি মাল্যদামানি রাবণঃ ।
গাত্রেষু সজ্জয়ামাস শোত্রয়োশ্চাস্য কুণ্ডলে ॥
কাঞ্চনাঙ্গদকেয়ূরনিষ্কাভরণভূষিতঃ ।
কুম্ভকর্ণো বৃহৎকর্ণঃ সুহুতেঽগ্নিরিবাবভৌ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৫/২৫-২৮

৩. সর্বৌষধীভিগন্ধৈশ্চ সমালভ্য মহাবলাঃ ।
নির্জগ্মুর্নৈর্ঋতশ্রেষ্ঠাঃ ষড়েতে যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৯/১৮

৪. রক্তকণ্ঠগুণো ধীরো মহাপর্বতসন্নিভঃ ।
কাঞ্চনাঙ্গদনদ্ধাভ্যাং ভুজাভ্যামেষ শোভতে ।
কুণ্ডলাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভাতি বক্ত্রং সুভীষণম্ । যুদ্ধকাণ্ড, ৭১/২২-২৪(খণ্ডাংশ)

৫. স কাঞ্চনং ভারসহং নিবাতং বিদ্যুৎপ্রভং দীপ্তমিবাত্মভাসা ।
আবদ্ধ্যমানঃ কবচং ররাজ সন্ধ্যাভ্রসংবীত ইবাদ্রিরাজঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৫/৩০

৬. তেঽতিকায়ং সমাসাদ্য কবচে বজ্রভূষিতে ।
ভগ্নাগ্রশল্যাঃ সহসা পেতুর্বাণা মহীতলে ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৭১/৯৫

৭. বালবৃদ্ধাবশেষান্তু লঙ্কাং কৃত্বা শরোর্মিভিঃ ।
রাবণন্তু রিপুং হত্বা সীতাং ত্বপমুলন্স্যসে ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৫০/৫৮

৮. স তাং পরিষদং কৃৎস্নাং সমীক্ষ্য সমিতিঞ্জয়ঃ ।
প্রচোদয়ামাস তদা প্রহস্তং বাহিনীপতিম্ ॥
সেনাপতে যথা তে স্যুঃ কৃতবিদ্যাশ্চতুর্বিধাঃ ।
যোধা নগররক্ষায়াং তথা ব্যাদেষ্টুমর্হসি ॥
স প্রহস্তঃ প্রণীতাত্মা চিকীর্ষন্ রাজশাসনম্ ।
বিনিক্ষিপদ্ বলং সর্বং বহিরন্তশ্চ মন্দিরে ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১২/১-৩

৯. চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্ ।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১২/৩৩

১০. হীয়মানেন কর্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ ।
ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্বীত বিগ্রহম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩৫/৯

১১. প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সম্পন্নতরগোরসাঃ ।
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১৬/৭

১২. উত্তরাফাল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে ।
অভিপ্রয়াম সুগ্রীব সর্বানীকসমাবৃতাঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৪/৫

Dhaka University Institutional Repository

১৩. অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৯২/৬৬

১৪. ভ্রাতরং সম্পরিষ্বজ্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্ ।
প্রণম্য শিরসা তস্মৈ প্রতস্থে স মহাবলঃ ॥
তমাশীর্ভিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ। যুদ্ধকাণ্ড, ৬৫/৩২-৩৩

১৫. যুদ্ধোন্মত্তঞ্চ মত্তঞ্চ ভ্রাতরৌ চাপি রাবণঃ।
রক্ষণার্থং কুমারাণাং প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং রাবণং লোকরাবণম্ ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণঞ্চৈব মহাকায়াঃ প্রতস্থিরে ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৯/১৬-১৭

১৬. সোঽভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্ ।
নিকুম্ভিলামভিযযৌ চৈত্যং রাবণিপালিতম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৮৫/২৯

১৭. স্থাপয়ামাস রক্ষাংসি রথং প্রতি সমন্ততঃ।
ততস্তু হুতভোক্তারং হুতভুক্ সদৃশপ্রভঃ ॥
জুহুবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ।
স হবির্লাজসৎকারৈর্মাল্যগন্ধপুরস্কৃতৈঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৭৩/২১-২২

১৮. ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গঃ কিঙ্কিণীশতভূষিতঃ।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো বৈদূর্যময়কূবরঃ।
সদশ্বৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈর্যুক্তঃ শ্বেতপ্রকীর্ণকৈঃ ॥
হরিভিঃ সূর্যসঙ্কাশৈর্হেমজালবিভূষিতৈঃ।
রুক্মবেণুধ্বজঃ শ্রীমান্ দেবরাজরথো বরঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০২/১০-১১

১৯. সারথিঃ স রথং হৃষ্টঃ পরসৈন্যপ্রধর্ষণম্ ।
গন্ধর্বনগরাকারং সমুচ্ছ্রিতপতাকিনম্ ॥
যুক্তং পরমসম্পন্নৈর্বাজিভির্হেমমালিভিঃ।
যুদ্ধোপকরণৈঃ পূর্ণং পতাকাধ্বজমালিনম্ ॥
দীপ্যমানমিবাকাশে বিমানং সূর্যবর্চসম্ ।
তড়িৎপতাকাগহনং দর্শিতেন্দ্রায়ুধপ্রভম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০৬/১-৩, ৬

২০. দেশ-কালৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষ্মণানীঙ্গিতানি চ।
দৈন্যং হর্ষশ্চ খেদশ্চ রথিনশ্চ মহাবলম্ ॥
স্থলনিম্নানি ভূমেশ্চ সমানি বিষমাণি চ।
যুদ্ধকালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ পরস্যান্তরদর্শনম্ ॥
উপযানাপযানে চ স্থানং প্রত্যপসর্পণম্ ।
সর্বমেতদ্ রথস্থেন জ্ঞেয়ং রথকুটুম্বিনা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০৪/১৮-২০

২১. পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥ আদিকাণ্ড, ২৭/২

২২. ইমে স্ম নরশার্দূল শাধি কিং করবাম তে ॥ আদিকাণ্ড, ২৮/১৩

২৩. গম্যতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ।
মানসাঃ কার্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ ॥ আদিকাণ্ড, ২৮/১৪

২৪. ইদং দিব্যং মহচ্চাপং হেমবজ্রবিভূষিতম্ ।
বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥
অমোঘঃ সূর্যসঙ্কাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোত্তমঃ।
দত্তৌ মম মহেন্দ্রেণ তূণী চাক্ষয্য-সায়কৌ ॥
সম্পূর্ণৌ নিশিতৈর্বাণৈর্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।
মহারজতকোশেঽয়মসির্হেমবিভূষিতঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১২/৩২-৩৪

২৫. তং লক্ষ্মণোৎসৃষ্টবিবৃদ্ধবেগং সমাপতন্তং শ্বসনোগ্রবেগম্।
সুপর্ণোবজ্রোত্তমচিত্রপুঙ্খং তদাতিকায়ঃ সমরে দদর্শ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৭১/১০৭

২৬. এভির্বাহুপ্রযুক্তৈশ্চ পরিঘৈঃ শূলপট্টিশৈঃ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষসি বীর্যঞ্চ ধনুশ্চ করপীড়িতম্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ২০/১৫

২৭. পরশ্বধহতস্যাদ্য মন্দপ্রাণস্য ভূতলে।
রামস্য রুধিরং রক্তমুষ্ণং পাস্যসি রাক্ষসি ॥ অরণ্যকাণ্ড, ২২/৫

২৮. তং মেরুশিখরাকরং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ।
হেমচক্রমসংবাধং বৈদূর্যময়কূবরম্ ॥
মৎস্যৈঃ পুষ্পৈদ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রকান্তৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।
মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্ ॥
ধ্বজনিস্ত্রিংশসম্পন্নং কিঙ্কিণীবরভূষিতম্ ।
সদশ্বযুক্তং সোঽমর্যাদারুরোহ খরস্তদা ॥ অরণ্যকাণ্ড, ২২/১৩-১৫

২৯. কামগং স্যন্দনং দিব্যমন্তরিক্ষচরং ধ্রুবম্ ।
মায়াঞ্চ তমসীং নাম যয়া সম্পাদ্যতে তমঃ ॥ উত্তরকাণ্ড, ২৫/১০

৩০. বানরান্ মোহয়িত্বা তু প্রতিযাতঃ স রাক্ষসঃ।
মায়াময়ীং মহাবাহো তাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৮৪/১৩

৩১. অযুক্তবুদ্ধিকৃত্যেন সর্বভূতবিরোধিনা।
এবং প্রযুক্তা রৌদ্রেণ মায়া মায়াবিনা ত্বয়ি ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩৩/১৩

৩২. মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ প্রাস-তোমরপাণয়ঃ।
পরিবার্য হনূমন্তং সহসা তস্থুরগ্রতঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৪২/২৯

৩৩. চারেণ বিদিতঃ শত্রুঃ পণ্ডিতৈর্বসুধাধিপৈঃ।
যুদ্ধে স্বল্পেন যত্নেন সমাসাদ্য নিরস্যতে ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ২৯/২১

৩৪. নৈবং বিনষ্টাঃ শোচ্যন্তে ক্ষত্রধর্মব্যবস্থিতাঃ।

বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণাজিরে ॥
ইয়ং হি পূর্বৈঃ সন্দিষ্টা গতিঃ ক্ষত্রিয়সম্মতা।
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শোচ্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০৯/১৫,১৮

৩৫. রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্ ।
যেন সর্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে ॥
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্বশত্রুবিনাশনম্ ।
জয়াবহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০৫/৩-৪

৩৬. তমাশীর্ভিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
শঙ্খদুন্দুভির্নির্ঘোষৈঃ সৈন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৫/৩৩

৩৭. সন্নাহজননী হ্যেষা ভৈরবা ভীরু ভেরিকা।
ভেরীনাদঞ্চ গম্ভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩৩/২১

৩৮. ভীরোঃ প্রবাদাঃ শ্রূয়ন্তে যস্ত জীবতি ধিক্কৃতঃ।
মার্গঃ সৎপুরুষৈর্জুষ্টঃ সেব্যতাং ত্যজ্যতাং ভয়ম্ ॥
শয়ামহে বা নিহতাঃ পৃথিব্যামল্পজীবিতাঃ।
প্রাপ্নুয়ামো ব্রহ্মলোকং দুষ্প্রাপঞ্চ কুযোধিভিঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৬/২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

রামরাজ্যসহ কতিপয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

রামায়ণে তিনটি সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনটি সভ্যতা হলো– আর্য সভ্যতা, আরণ্যক সভ্যতা এবং রাক্ষস সভ্যতা। আর্য সভ্যতায় আমরা প্রধানত অযোধ্যা এবং বিদেহদেশ, আরণ্যক সভ্যতায় নিষাদরাজ গুহের শৃঙ্গবেরপুর রাজ্য এবং কিষ্কিন্ধার বানর রাজ্য আর রাক্ষস সভ্যতায় লঙ্কারাজ্যের পরিচয় পাই।

অযোধ্যা রাজ্য

সূর্যবংশের রাজারা শাসন করেছেন অযোধ্যা। এখানে সূর্যবংশের অনেক রাজার নাম জানা গেলেও দশরথ, ভরত এবং রামচন্দ্রের কথাই বেশি জানা যায়। ফলে দশরথকে দিয়েই শুরু করা যেতে পারে অযোধ্যার শাসনব্যবস্থা বা আর্যসভ্যতার সমাচার।

দশরথশাসিত অযোধ্যা

অযোধ্যার রাজা দশরথ ছিলেন একজন আদর্শ রাজ্যপরিপালক। প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। অষ্ট সংখ্যাবিশিষ্ট তাঁর মন্ত্রিসভার সকল সদস্য ছিলেন যশস্বী। তাঁরা হলেন– ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল এবং অর্থশাস্ত্রজ্ঞ অষ্টম মন্ত্রী সুমন্ত্র। তাঁরা সকলে ছিলেন রাজকর্মে অনুরক্ত ও পবিত্রকর্মা। এঁরা সবাই ছিলেন বংশানুক্রমিকভাবে নিযুক্ত। তাঁরা ছিলেন বিদ্বান, বিনয়ী, জিতেন্দ্রিয়, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও বিক্রমপ্রকাশে দৃঢ়চিত্ত। কথায় ও কাজে তাঁরা এক ছিলেন। তাঁরা ছিলেন স্মিতভাষী। কাম-ক্রোধ-লোভের বশে তাঁরা কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না। গুপ্তচরদের মাধ্যমে তাঁরা রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অবহিত হতেন। রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ তাঁরা রাজকোষের ধনবৃদ্ধিতে ও সৈন্যসংগ্রহে সতত যত্নবান ছিলেন। তাঁরা সুশাসক ছিলেন। অপরাধীর দোষ-গুণ বিচার করে তাঁরা অপরাধীকে শাস্তি দিতেন। এমনকি নিজ সন্তান অপরাধ করলেও তাকে অবশ্যই দণ্ডভোগ করতে হতো। পররাষ্ট্রনীতিতে তাঁরা ছিলেন পারদর্শী। সন্ধি-বিগ্রহের নীতি তাঁরা জানতেন। রাজ্যশাসনকালে রাজা দশরথ নিজের চেয়ে অধিক কিংবা সমান শক্তিসম্পন্ন শত্রুর সম্মুখীন হননি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকবৃন্দ ও রাজাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। মিথিলারাজ জনক, কাশীরাজ, কেকয়রাজ, অঙ্গরাজ রোমপাদ, কোশলরাজ ভানুমান, মগধরাজ, পূর্বদেশীয় সমস্ত রাজন্যমণ্ডলী, সিন্ধু সৌবীরদেশীয়, সৌরাষ্ট্রদেশীয় রাজগণ, দাক্ষিণাত্যের রাজগণকে তিনি তাঁর যজ্ঞে

উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এছাড়া তাঁর বন্ধুস্থানীয় মহৎচরিত্র অন্য রাজাদেরও নিমন্ত্রণ করেছেন।[১] রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত উল্লিখিত রাজন্যবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাই রাজা দশরথের জন্য বহু রত্নসম্ভার উপহার হিসেবে এনেছিলেন। রাজা দশরথও তাঁর নিমন্ত্রিত মিত্ররাজাদের বহু মূল্যবান রত্ন দান করেছিলেন। এতে এটা প্রমাণিত হয়, রাজা দশরথের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের বেশ সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব বজায় ছিল। আবার বীর্যবত্তার দ্বারা তিনি শত্রুদের নির্মূল করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রিপরিষদ তাঁর প্রতি একান্ত অনুগত ছিল।

কথায় বলে যেমন রাজা, তেমন তাঁর প্রজা। তাই দেখা যায়, রাজা দশরথের রাজ্যশাসনকালে অযোধ্যার জনগণ ছিল ধর্মপ্রাণ, বিদ্বান, নির্লোভ ও সত্যপরায়ণ। তারা ছিল নিজেদের উপার্জিত ধনে সদা সন্তুষ্ট, আত্মীয়বৎসল। তাদের বেশি সঞ্চয়ের স্বপ্ন ছিল না, আবার তারা কারও মুখাপেক্ষী ছিল না। প্রজাদের রাজভক্তি ছিল। কামুক, কৃপণ, মূর্খ, নাস্তিক, নিষ্ঠুর কোনো ব্যক্তি ছিল না। সবাই ছিল দানশীল ও অতিথিপরায়ণ। সমাজে বর্ণপ্রথা ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র– চতুর্বর্ণের সবাই দেবতা ও অতিথিকে অর্চনা করত। তারা সত্য ও ধর্মকে আশ্রয় করে জীবন-যাপন করত। তখন মানুষ ছিল দীর্ঘজীবী। তারা স্ত্রী-পুত্র-পৌত্র নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করত। ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সুশিক্ষিত। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের অনুগত ছিলেন। বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুসরণ করতেন। শূদ্রেরা তিনবর্ণের সেবা করতেন। রাজা দশরথের শাসনকালে অযোধ্যাপুরী সুরক্ষিত ছিল।

ভরতশাসিত অযোধ্যা

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় সিংহাসনে স্থাপন করে ভরত রাজ্য পরিচালনা করেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে, ফলমূল খেয়ে, সমস্ত রাজকীয় সুখভোগ ত্যাগ করে ভরত চৌদ্দ বছর রাজ্য শাসন করেন। ভরতের রাজ্য ছিল মূলত একজন ভারপ্রাপ্ত রাজার রাজ্য। তাঁর রাজত্বকালে কোশল রাজ্যের সবাই সুখে-শান্তিতে ছিল। তিনি ছিলেন সুশাসক এবং রাজনীতিবিশেষজ্ঞ। রাজনীতিতে পারদর্শী না হলে তিনি চৌদ্দ বছরে রাজকোষ দশগুণ বৃদ্ধি করতে পারতেন না। লঙ্কাযুদ্ধশেষে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে ভরত রামচন্দ্রকে করজোড়ে বলেন: আপনার গচ্ছিত রাজ্য আজ আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি। আজ আমার পূর্ণ হলো মনোবাসনা, সার্থক হলো জন্ম। আপনি রাজকোষ, গৃহ ও সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণ করুন।

আপনার তেজোবলেই আমি এগুলিকে দশগুণ বৃদ্ধি করতে পেরেছি।[২] এখানে লক্ষণীয়, সন্ন্যাসীর মতো জীবন-যাপন করেও রাজধর্ম পালনে ভরতের ঐকান্তিকতা অসাধারণ। আত্মসংযম পালন করে তিনি রাজ্যের সুশাসনে তৎপর ছিলেন।

রামরাজ্য

অযোধ্যার রাজা ছিলেন রামচন্দ্র। সেই কতকাল আগের কথা। অন্তত খ্রি.পূ. এক হাজার অব্দ হবে। রামচন্দ্রের রাজ্যপালনের মঙ্গলময় দিকসমূহ আজও মানুষের হৃদয়ে জাগরূক। আজও মানুষের কাছে রামরাজত্ব কাঙ্ক্ষিত। লোকমুখে এখনও সেই আক্ষেপ ধ্বনিত হয়– সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বাল্মীকি-রামায়ণে রামরাজ্যের বর্ণনা পরিমিত। তবে যেটুকু বর্ণনা পাওয়া যায়, তা পড়লে মন পরিতৃপ্ত হয়। রামরাজ্যে অনেক সমৃদ্ধি ছিল। তবে শান্তি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।

রামচন্দ্র রাজ্যশাসন করার সময় কেউ বৈধব্যের কষ্ট পায় নি। রামরাজ্যে মানুষের রোগ-ব্যাধির ভয় দূর হয়েছিল। কোনো বৃদ্ধকে বালকদের জন্য শ্রাদ্ধ করতে হতো না। অর্থাৎ শিশুমৃত্যু ছিল না। সম্ভবত উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকায় অকাল মৃত্যু হতো না। জনগণের পরমায়ু বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই রাম-রাজত্বে প্রজারা ছিল রোগ-শোকহীন। রামরাজ্যে সর্বত্র ছিল আনন্দ ও শান্তি। আনন্দময় রামরাজ্যে সবাই ছিল ধার্মিক। সবাই রামচন্দ্রকে অনুসরণ করত। কেউ কাউকে হিংসা করত না। প্রকৃতিও ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধির অনুকূলে। বৃক্ষরাজির মূল ছিল দৃঢ়, তারা উপড়ে যেত না। গাছে নিত্য ফুল ফুটত, ফলে ভরে যেত তরুরাজি। প্রয়োজন অনুপাতে বৃষ্টি হতো। মৃদুমন্দ বায়ু বয়ে যেত, সে বায়ু ছিল সুখস্পর্শ। মানুষের মনে যখন শান্তি বিরাজ করে, তখন প্রকৃতিও শান্ত-সৌম্যরূপে মানুষের কাছে ধরা দেয়। মানুষ যদি প্রকৃতিকে ভালোবেসে তার রক্ষায় কাজ করে, তাহলে প্রকৃতিও মঙ্গলদায়িনী হয়ে মানুষকে নিয়ত সেবা করে যায়। মূলত রামরাজত্বে সবাই শান্তিপ্রিয় ও প্রকৃতিপ্রেমিক ছিল। গাছপালার সঠিক পরিচর্যা করা হতো। তাই ফুলে-ফলে বৃক্ষ ভরে যেত।

প্রজারা ছিল নির্লোভ। তারা ছিল সদানন্দ ও নিজকর্মে নিরত। তারা ছিল সত্যবাদী, উত্তম স্বভাবের ও ধর্মপরায়ণ। আপন জীবনে ধর্মকে লালন করে সত্য-সুন্দরের পথে তারা এগিয়ে চলত। মূলত শাসক যদি

Dhaka University Institutional Repository

নির্লোভ থাকেন, ধর্মপথে চলেন, তাহলে প্রজারাও তাঁকে অনুসরণ করে। ধর্মাত্মা রামচন্দ্র তাঁর সচ্চরিত্র ও মহৎ কর্মদ্বারা প্রজাদের হৃদয় জয় করেছিলেন। প্রজাদের হৃদয়ই হচ্ছে একজন রাজার প্রকৃত সিংহাসন। রামচন্দ্র সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামচন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে প্রজাদের মধ্যে শুধু 'রাম, রাম' – এই কথাই হতো। প্রজাদের জগৎ ছিল রামময়। এসকল বর্ণনা পাওয়া যায় যুদ্ধকাণ্ডে।[৩]

রামায়ণের যুগে ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। তবে রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি ছিলেন মূলত জনগণের সেবক। রাজা কখনও এককভাবে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন না। মন্ত্রিসভা ও জনগণের পূর্ণ সম্মতি নিয়েই রাজা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। রাজা দশরথ মন্ত্রিমণ্ডলী ও প্রজাদের মতামত নিয়ে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন। রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়তমা সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। সীতা বিসর্জনে সীতার দুঃসহ কষ্টের অবধি ছিল না। কিন্তু রামের কষ্টও ছিল নিরবধি। রামচন্দ্রের হৃদয় দগ্ধীভূত হয়েছে, তাঁর হৃদয়কুসুম শুকিয়ে গিয়েছিল। তবুও রামচন্দ্রের নৃপতিসত্তার কাছে পরাজিত হয়েছে স্বামীসত্তা। এর কারণ রামচন্দ্র মনে করতেন, তিনি প্রজার সেবক এবং প্রজাদের সেবা করা রাজার ধর্ম। তাই রাজতন্ত্র ছিল মূলত রাজধর্ম। রাজা শাসক হলেও তিনি সেবকমাত্র, ধর্মের প্রতিনিধি। সে যুগে জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল। জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। বলা যায়, গণতন্ত্র ও রাজশাসনের সমন্বয় ঘটেছিল এই রাজতন্ত্রের মধ্যে। তাই রামায়ণের যুগে জনগণ সুখে-শান্তিতে, নির্ভীকভাবে বসবাস করত।

রাবণশাসিত লঙ্কাপুরী

লঙ্কারাজ রাবণ অনার্য রাক্ষস সভ্যতার প্রতিনিধি। তাঁর শাসনকালে লঙ্কার সমৃদ্ধি ছিল অনেক বেশি। লঙ্কায় ছিল পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ অট্টালিকা যা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় মনোহর। গগনস্পর্শী সেই অট্টালিকার জানালাগুলি বজ্র ও অঙ্কুশের মতো দেখতে। সেখানকার পতাকাশোভিত, লতামণ্ডিত, সুরম্য কনকময় তোরণসমূহের সৌন্দর্য দেখে হনুমান মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৪]

রাজা রাবণ প্রাজ্ঞ এবং রাজনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মন্ত্রিপরিষদও শিক্ষিত এবং রাজনীতিতে প্রাজ্ঞ ছিল। রাবণের মন্ত্রীরা ছিলেন গুণবান, সর্বজ্ঞ, প্রকৃত অর্থনিরূপণে পণ্ডিত এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।[৫]

কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে লঙ্কারাজ রাবণ মন্ত্রিপরিষদের সভা ডাকতেন। অমাত্যদের মতামত তিনি শুনতেন কিন্তু নিজের মতের সঙ্গে না মিললে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। যেমন, তিনি তাঁর অমাত্য এবং অনুজ বিভীষণের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে সভামধ্যে উপহাস ও তিরস্কার করেছেন। বিভীষণ তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মদর্শন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে রাবণের সীতাহরণ ভীষণ অনৈতিক কাজ। সৎসাহসী বিভীষণ তাই সভামধ্যে রাবণকে তাঁর নিন্দনীয় কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সীতাকে রামের হাতে অর্পণ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু রাবণ বিভীষণের এই নৈতিক প্রস্তাবকে তিরস্কার করেছেন। আবার রাবণের রাজসভায় মহাপার্শ্ব নামক এক অমাত্য সীতাহরণের মতো রাবণের কুকর্মকে সমর্থন করেছেন এবং সীতাকে বলাৎকারের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।[৬]

পররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে রাবণের সুদূর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া না গেলেও নিজ রাষ্ট্রে তাঁর সুশাসন বজায় ছিল। কেননা তাঁর সময়ে লঙ্কায় দারিদ্র বলে কিছু ছিল না। তিনি অপরাধীদের বিচার করতেন। এ কারণে লঙ্কায় বিচারালয় ও কারাগার ছিল। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যুদ্ধে ব্যবহৃত আহত পশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। পশুচিকিৎসকেরা পশুদের সুচিকিৎসা করতেন। লঙ্কায় যুদ্ধ শুরু হলে রাবণ লঙ্কাপুরীকে সুরক্ষার জন্য সৈন্য দ্বারা পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশেষত অশোকবন, যেখানে সীতাকে বন্দিনী অবস্থায় রাখা হয়েছিল এবং রাজপ্রাসাদসমূহ ও অপরাধীদের বিচারালয় ইত্যাদি স্থানগুলির বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। যুদ্ধে যখন বহু রাক্ষসবীর একে একে নিহত হচ্ছিল, তখন রাবণ খুব ভগ্ন হৃদয় হয়ে গেলেও লঙ্কাপুরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাতে দুর্বল না হয়ে যায়, সেদিকে তিনি লক্ষ রেখেছিলেন। যুদ্ধে যে সৈন্যগণ মৃত্যুবরণ করত, রাবণের নির্দেশ ছিল তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার। কেননা মৃতসৈন্যদের দেখে জীবিত সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। এ থেকে লঙ্কারাজ রাবণের যুদ্ধ-কূটনীতির সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজর্ষি জনকশাসিত বিদেহরাজ্য

বিদেহরাজ জনক ছিলেন রাজর্ষি। রাজা হয়েও তিনি নিজহাতে কৃষিকাজ করতেন। তিনি জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর রাজসভায় জ্ঞানীদের সমাগম হতো। তাঁর অমাত্যগণ, রাজ্যের উপাধ্যায়গণ ও পুরোহিত শতানন্দের পরামর্শ নিয়ে তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন।

রাজসভায় বিশেষ অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি রাজ্যের বিশিষ্টজনের সঙ্গে প্রজাদেরও নিমন্ত্রণ করতেন। যেমন রামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গ অনুষ্ঠানে রাজ্যের গুণিজনের সঙ্গে প্রজারাও উপস্থিত ছিলেন।[৭]

বিদেহরাজ্য কিংবা রাজর্ষি জনকের রাজ্যশাসন সম্পর্কে রামায়ণে বেশি আলোচিত হয় নি। জনকের অনুজ সাঙ্কাশ্যনগরে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তাঁর নাম কুশধ্বজ। তিনিও রাজর্ষি জনকের মতো ধার্মিক ও সুশাসক ছিলেন। সাঙ্কাশ্য নগরীর প্রান্তপ্রাচীরে গজবন্ধনের স্থান ছিল। নগরীর সুরক্ষার জন্য বিশেষ যন্ত্র বসানো ছিল। সেখানকার সপ্ততল অট্টালিকা ছিল দিব্যধামতুল্য অতি মনোহর।[৮]

নিষাদরাজ গুহশাসিত শৃঙ্গবেরপুর রাজ্য

নিষাদরাজ গুহের পরিচয় অযোধ্যাকাণ্ডে পাওয়া যায়। শৃঙ্গবেরপুর বনরাজ্য, গুহ সেখানকার রাজা। অযোধ্যার রামচন্দ্রের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু। স্থপতি হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল।[৯]

বনগমনের পথে গুহের আতিথ্যে রামচন্দ্র তাঁর রাজ্যে একরাত্রি অবস্থান করেন। গুহের রাজ্যের সুবিস্তৃত বিবরণ কিংবা তাঁর রাজ্যশাসন সম্পর্কে রামায়ণে খুব বেশি আলোচিত হয় নি। গুহ রামচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। রামচন্দ্রের আগমনবার্তা শুনে তিনি তাঁর অমাত্য ও আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শৃঙ্গবেরপুর কোশলরাজ্যের প্রতিবেশী রাজ্য। রামচন্দ্রের এ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। রামচন্দ্র গুহের রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানকার সবার কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন।[১০]

গুহপ্রদত্ত শক্তপোক্ত নৌকা ও মাঝির সাহায্যে রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ গঙ্গানদী পার হয়েছিলেন। রামচন্দ্রকে বনবাস হতে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরত সসৈন্য যাত্রা করেছিলেন। পথিমধ্যে শৃঙ্গবেরপুরে তাঁরা একরাত্রি যাপন করেন। দূর থেকে ভরতের সৈন্যবাহিনী দেখে নিষাদরাজ প্রথমে ভেবেছিলেন, তারা মনে হয় বনবাসী রামচন্দ্রকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তাই তিনি তাঁর জ্ঞাতিদের যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে নির্দেশ দিয়ে বলেন: দশরথনন্দন রামচন্দ্র আমার বন্ধু। আবার তিনি আমার প্রভু। তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তোমরা সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গঙ্গার তীরে অবস্থান করো। নদীরক্ষাকারী শক্তিশালী সকল সেবক গঙ্গার কাছে

অবস্থান করুক। পাঁচ শত কৈবর্ত বহনকারী সমর্থ শত শত নৌকা এবং শক্তিশালী যুবকেরা এখানে অবস্থান করুক।[১১]

বন্ধুর প্রতি নিষাদরাজের অতুলনীয় কর্তব্যবোধ এখানে লক্ষণীয়। নিষাদরাজের যে শক্তিশালী নৌবহর ছিল এতে তার প্রমাণ মেলে। মৎস্য, মাংস ও মধু উপহার নিয়ে অমাত্য ও জ্ঞাতিদ্বারা পরিবৃত হয়ে নিষাদরাজ ভরতকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভরত রামচন্দ্রের প্রতি একান্ত অনুগত এবং তিনি তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এসেছেন, এটা জানার পর নিষাদরাজ আনন্দিত চিত্তে ভরতের বিশাল সেনাবাহিনীর সৎকার করেছিলেন। এতে তাঁর অতিথিপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বালীশাসিত কিষ্কিন্ধা

কিষ্কিন্ধার শাসক বালী ছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী ও রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন। কিষ্কিন্ধার গিরিগুহা ছিল বালীর রাজধানী। সে গুহা ছিল রত্নময় ও পুষ্পিত কাননে সুসজ্জিত। সেখানকার প্রাসাদসমূহ সুউচ্চ এবং রমণীয় ছিল। সেখানকার জনগণ ছিল হৃষ্টপুষ্ট। তাদের ব্যাকরণ, বেদ-বেদান্ত, রাজধর্ম, কামশাস্ত্র, অর্থনীতি, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় তারা অনেক উন্নত ছিল। বিশেষ করে মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধে কিষ্কিন্ধার সৈন্যরা খুব পারদর্শী ছিল। রামচন্দ্রের বাণাঘাতে মুমূর্ষু বালী যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তাতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। যেমন রাজকর্মের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন: সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য, পরাক্রম এবং অন্যায়কারীদের দণ্ডবিধান এগুলি রাজার গুণ। নীতি, বিনয়, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ এই রাজধর্মগুলি অসংকোচে পালন করা উচিত। রাজাদের ইচ্ছামতো চলা উচিত নয়।[১২]

বালীর মৃত্যুর পর তাঁর অনুজ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার রাজারূপে অভিষিক্ত হন। তিনিও রাজনীতিতে বেশ দক্ষ ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বানরবাহিনী সীতা উদ্ধারে অশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্ ।
মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্ ।

নিষ্ঠিতং সর্বশাস্ত্রেষু তথা বেদেষু নিষ্ঠিতম্ ॥
তমানয় মহাভাগঃ স্বয়মেব সুসৎকৃতম্ ।
পূর্বং সম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা ততঃ পূর্বং ব্রবীমি তে ॥
তথা কাশীপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্ ।
সদ্‌বৃত্তং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ ॥
তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্মিকম্ ।
শ্বশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয় ॥
অঙ্গেশ্বরং মহেষ্বাসং রোমপাদং সুসৎকৃতম্ ।
বয়স্যং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয় ॥
তথা কোসলরাজানং ভানুমন্তং সুসৎকৃতম্ ।
মগধাধিপতিং শূরং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥
প্রাপ্তিজ্ঞং পরমোদারং সৎকৃতং পুরুষর্ষভম্ ।
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় চোদয়স্ব নৃপর্ষভান্ ।
প্রাচীনান্ সিন্ধু-সৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ পার্থিবান্ ॥
দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানানয়স্ব হ।
সন্তি স্নিগ্ধাশ্চ যে চান্যে রাজানঃ পৃথিবীতলে ॥
তানানয় যথাক্ষিপ্রং সানুগান্ সহবান্ধবান্ ।
এতান্ দূতৈর্মহাভাগৈরানয়স্ব নৃপাজ্ঞয়া ॥ আদিকাণ্ড, ১৩/১৯-২৯

২. অদ্য জন্ম কৃতার্থং মে সংবৃত্তশ্চ মনোরথঃ।
যৎ ত্বাং পশ্যামি রাজানমযোধ্যাং পুনরাগতম্ ॥
অবেক্ষতাং ভবান্ কোশং কোষ্ঠাগারং গৃহং বলম্ ।
ভবতস্তেজসা সর্বং কৃতং দশগুণং ময়া ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১২৭/৫৫-৫৬

৩. রাঘবশ্চাপি ধর্মাত্মা প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্ ।
ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সসুহৃজ্‌জ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥
ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ঞ্চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি কুর্বতে ॥
সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥
আসন্ বর্ষসহস্রাণি যথা পুত্রসহস্রিণঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।
রামভূতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ।
কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা লোভবিবর্জিতাঃ।
স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ ॥
আসন্ প্রজা ধর্মপরা রামে শাসতি নানৃতাঃ।
সর্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১২৮/৯৭-১০৫

৪. ততস্তু তাং পুরীং লঙ্কাং রম্যামভিযযৌ কপিঃ।
হসিতোৎকৃষ্টনিনদৈস্তূর্যঘোষপুরস্কৃতৈঃ ॥
বজ্রাঙ্কুশনিকাশৈশ্চ বজ্রজালবিভূষিতৈঃ।
গৃহমেধৈঃ পুরী রম্যা বভাসে দ্যৌরিবাম্বুদৈঃ ॥
প্রজজ্বাল তদা লঙ্কা রক্ষোগণগৃহৈঃ শুভৈঃ।
সিতাভ্রসদৃশৈশ্চিত্রৈঃ পদ্মস্বস্তিকসংস্থিতৈঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৪/৫-৭

৫. মন্ত্রিণশ্চ যথামুখ্যা নিশ্চিতার্থেষু পণ্ডিতাঃ।
অমত্যাশ্চ গুণোপেতাঃ সর্বজ্ঞা বুদ্ধিদর্শনাঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১/২৫

৬. ঈশ্বরস্যেশ্বরঃ কোঽস্তি তব শত্রুনিবর্হণ।
রমস্ব সহ বৈদেহ্যা শত্রূনাক্রম্য মূর্ধসু ॥
বলাৎ কুক্কুটবৃত্তেন প্রবর্ত্তস্ব মহাবল।
আক্রম্যাক্রম্য সীতাং বৈ তাং ভুঙ্ক্ষ্ব চ রমস্ব চ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৩/৩-৪

৭. নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ।
বর্জয়িত্বা মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ ॥
প্রত্যাশ্বস্তে জনে তস্মিন্ রাজা বিগতসাধ্বসঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো মুনিপুঙ্গবম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৬৭/১৯-২০

৮. ভ্রাতা মম মহাতেজা বীর্যবানতিধার্মিকঃ।
কুশধ্বজ ইতি খ্যাতঃ পুরীমধ্যবসচ্ছুভাম ॥
বার্যাফলকপর্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীম্ ।
সাঙ্কাশ্যাং পুণ্যসঙ্কাশাং বিমানমিব পুষ্পকম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৭০/২-৩

৯. তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা।
নিষাদজাতো বলবান্ স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০/৩৩

১০. দিষ্ট্যা ত্বাং গুহ পশ্যামি হ্যরোগং সহ বান্ধবৈঃ।
অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ বনেষু চ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০/৪২

১১. ভর্তা চৈব সখা চৈব রামো দাশরথির্মম।
তস্যার্থকামাঃ সন্নদ্ধা গঙ্গানূপেঽত্র তিষ্ঠত ॥
তিষ্ঠন্তু সর্বদাসাশ্চ গঙ্গামন্বাশ্রিতা নদীম্ ।
বলযুক্তা নদীরক্ষা মাংস-মূল-ফলাশনাঃ ॥
নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাং শতং শতম্ ।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৪/৬-৮

১২. সাম দানং ক্ষমা ধর্মঃ সত্যং ধৃতিপরাক্রমৌ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ॥
নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ নিগ্রহানুগ্রহাবপি।
রাজবৃত্তিরসঙ্কীর্ণা ন নৃপাঃ কামবৃত্তয়ঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/২৯,৩২

Dhaka University Institutional Repository

অধার্মিক রাজার রাজ্যে দুর্গতি

রাজার অসদাচরণের জন্য রাজ্যে দুর্দৈব ঘটে। রাজা যদি পাপকর্ম করেন, তাহলে তাঁর রাজ্যে দুর্দৈব ঘটবে। রামায়ণে এর কিছু দৃষ্টান্ত আছে। অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদ প্রতাপশালী, বীর্যবান, খ্যাতিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর অসদাচরণের ফলে সে রাজ্যে অনাবৃষ্টি শুরু হয়। প্রজাদের জীবনে নেমে আসে ঘোরতর সংকট। তখন রাজা বুঝতে পারেন, তাঁর কারণেই রাজ্যে নেমে এসেছে অশান্তি। তখন তিনি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।[১] এখানে লক্ষণীয়, রাজার কারণেই রাজ্যে শান্তি বা অশান্তি বিরাজ করে, এ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির একটা বড় দিক।

যে রাজা রক্ষাকর্মে অশক্ত, বিবিধ দোষ এসে তাঁকে ধ্বংস করে

অযোধ্যায় অম্বরীষ নামে এক মহান রাজা ছিলেন। একবার তিনি যজ্ঞ করার উদ্যোগ নিলে ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করেন। পশুটি অপহৃত হলে পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন: মহারাজ, যজ্ঞের জন্য যে পশুটি আনা হয়েছিল, সেটি আপনারই দুষ্কর্মের জন্য অপহৃত হলো। হে নরনাথ, যে রাজা রাজকর্মে অশক্ত, বিবিধ দোষ এসে তাকে ধ্বংস করে।[২]

এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায়, সে যুগে রাজ্যের যে-কোনো দুর্গতি ঘটুক তার জন্য রাজাকেই জবাবদিহি করতে হতো। লেকবিশ্বাস এই ছিল যে রাজ্যের যা-কিছু বিশৃঙ্খলা, দুর্ঘটনা এবং প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা তা রাজার কোনো অসদাচরণ বা দোষের কারণেই ঘটে থাকে। এ বিষয়টি কোনো রাজ্যের সুশাসন বা আদর্শ রাজ্যের জন্য খুবই প্রণিধানযোগ্য।

তথ্যসূত্র :

১. অঙ্গেষু প্রথিতো রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
তস্য ব্যতিক্রমাদ্ রাজ্ঞো ভবিষ্যতি সুদারুণা ॥
অনাবৃষ্টিঃ সুঘোরা বৈ সর্বলোকভয়াবহা।
অনাবৃষ্ট্যাং তু বৃত্তায়াং রাজা দুঃখসমন্বিতঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৯/৮-৯

২. পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর ॥ আদিকাণ্ড, ৬১/৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রামায়ণের সমাজবীক্ষণ

বিবাহ

সমাজগঠনে এবং সমাজবদ্ধভাবে অবস্থান করে মানুষ অন্য সকল জীবপ্রজাতি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করেছে, নিজেকে সুশৃঙ্খল করেছে এবং সকল দিকে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। এই স্বাতন্ত্র্যে মানুষ হয়ে উঠেছে সামাজিক জীব। সে গড়ে তুলেছে সমাজ। একটি সুস্থ, স্বাভাবিক, পরিশীলিত সমাজের মধ্যে সমন্বিত হয যহুবিধ বিষয়। আর একটি সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় কোনো একটি বিশেষ সময়ের সমাজকে। সেই সাহিত্য যদি হয় বিশাল আকারের মহাকাব্য, তাহলে সেখানে সেই সমাজকে আরও বহুভাবে পূর্ণতররূপে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। এখানে সাহিত্য বা মহাকাব্যের সাক্ষ্য ইতিহাস থেকেও অধিক। রামায়ণ নামক মহাকাব্য থেকে আমরা সে সময়ের সমাজকে ধারণ করতে সচেষ্ট হব। আমরা জানি, সমাজ বিনির্মাণে প্রাথমিক কাঠামো হলো পরিবার। আর এই পরিবার সৃষ্টি হয় নারী-পুরুষের বিবাহের মধ্য দিয়ে। সভ্যমানুষের সমাজে পরিবার গঠন, বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সামাজিক সুস্থিতিতে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই বৈদিক কাল থেকে বিবাহপ্রথা দৃষ্ট। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কারে বিবাহ অন্যতম একটি সংস্কার। রামায়ণের যুগে বিবাহপ্রথার একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। সে প্রথার বহুকিছু বর্তমান যুগের হিন্দুসমাজেও পরিদৃষ্ট।

বিবাহ দুটি মনের বন্ধন ও দুটি বংশের মধ্যেও হয় আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধন

বিবাহের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় একটি পরিবার তথা সমাজ। তবে শুধু দু'জন নর-নারীর হৃদয়ের বন্ধন বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বিবাহের মাধ্যমে এক বংশের সঙ্গে অন্য বংশের আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হয়। রাজা দশরথ যখন তাঁর পুত্রদের বিবাহ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মিথিলা নগরীতে আসেন, তখন মিথিলারাজ জনক তাঁকে বলেন: আপনাদের এখানে পেলাম, এটা আমার পরম সৌভাগ্য। বীর্যবত্তায় যাঁরা শ্রেষ্ঠ, সেই মহাপ্রাণ রঘুবংশীয়দের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে আজ আমরা ধন্য হলাম। এখন এই মিথিলা নগরী যেমন রাজা দশরথের হয়ে গেল, তেমনি অযোধ্যাপুরীও হলো

আমার। আমার দ্বাররক্ষক কে আছেন? কার আদেশের প্রতীক্ষা করছেন রাজা দশরথ? এই রাজ্যের মতো এ বাড়িও তো তাঁর। নিজের গৃহে প্রবেশ করতে কি কোনো বিচার করতে হয়? [১]

কন্যার পিতৃগৃহে বিবাহ

সাধারণত কন্যার পিতৃগৃহে বা কন্যার অভিভাবকের গৃহে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো। সীতাদেবী, ঊর্মিলার বিবাহ হয় তাঁদের পিতৃগৃহে অর্থাৎ জনকগৃহে। রাজা জনকের অনুজ ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির বিবাহও জনকালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।[২]

বরযাত্রী

বিবাহের সময় বরের অনুগামীদের বলা হয় বরযাতী। সীতাদেবী, ঊর্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির বিবাহে বরপক্ষ অর্থাৎ রাজা দশরথ তাঁর উপাধ্যায়, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে মিথিলায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মুখে ছিলেন ঋষি বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ মুনি। তাঁদের সঙ্গে ছিল হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে চতুরঙ্গ বাহিনী। রাজা দশরথের আদেশে চতুরঙ্গ সেনা রাজার পশ্চাতে গমন করেছিল। এখানে রাজপরিবারের বিবাহে বরপক্ষের বিশাল বাহিনীর একটা চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়।[৩]

বিবাহে লগ্ন স্থিরীকরণ

বিবাহ একটি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তাই এই পবিত্র অনুষ্ঠান তিথি লগ্ন-নক্ষত্র দেখে শুভসময়ে অনুষ্ঠিত হতো। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের সম্মতি অনুসারে বিবাহের লগ্ন স্থির করা হতো। রাম-সীতা, লক্ষ্মণ-ঊর্মিলা, ভরত-মাণ্ডবী, শত্রুঘ্ন-শ্রুতকীর্তির বিবাহ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৪] রাজা জনক মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে বলেছিলেন: হে ব্রহ্মন্, আগামী পরশু হবে ফাল্গুনী নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা হচ্ছেন ভগ নামক প্রজাপতি। প্রাজ্ঞব্যক্তিরা ঐ দিনটিকে বিবাহের জন্য প্রশস্ত বলে মনে করেন।[৫]

বিবাহের পূর্বে বর-কনে উভয়পক্ষের সামনে পাত্র-পাত্রীর কুলপরিচয় জ্ঞাপন করা শাস্ত্রীয় বিধি

বিবাহের রীতি অনুসারে রাজপুরোহিতগণকে পাত্র-পাত্রীর কুলপরিচয় বিবাহসভায় তুলে ধরতে হতো। রাজা দশরথের কুলপুরোহিত বসিষ্ঠ সূর্যবংশের পরিচয় সবার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

বসিষ্ঠ কর্তৃক রামচন্দ্রের বংশ বর্ণনার পর রাজা জনক করজোড়ে বলেন: মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, কন্যাদানের পূর্বে আপন কুলপরিচয় জ্ঞাপন করা শাস্ত্রবিধি। বিবাহে সেই কুলগৌরব বৃদ্ধি পায়।[৬]

প্রাক্-বিবাহ মঙ্গলাচার

পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকর্ম

বিবাহের মধ্য দিয়ে বংশধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। এটা একটা কুলক্রমাগত ব্যাপার। তাই বিবাহকালে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা একটি পবিত্র কর্তব্য। বিবাহের পূর্বে শাস্ত্রীয় নিয়মে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকর্মাদি করতে হতো। রাজা দশরথ তাঁর পুত্রদের বিবাহের পূর্বে নিজেই বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ সম্পাদন করেছিলেন।[৭]

ব্রাহ্মণকে গো-দান

বিবাহ উপলক্ষে গোদানসহ বিবিধ দান একটি ধর্মীয় এবং সামাজিক কৃত্য হিসেবে বিবেচিত । রাজা দশরথ পুত্রদের বিবাহের পূর্বে তাদের কল্যাণের জন্য ধর্মানুসারে এক লক্ষ গাভী দান করেছিলেন। গো-শৃঙ্গগুলি স্বর্ণ দিয়ে মুড়ে কাঁসার দোহন পাত্রসহ, বৎসসহ চার লক্ষ ধেনু ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। তিনি পুত্রদের কল্যাণে ব্রাহ্মণদের আরও অনেক কিছু দান করেছিলেন।[৮]

মঙ্গলসূত্রবন্ধনাদি আচার

বিবাহের পূর্বে মঙ্গলসূত্রবন্ধনাদি আচার অনুষ্ঠিত হতো। এ অনুষ্ঠানে বরকে সকল অলঙ্কারে ভূষিত করা হতো।[৯] বিবাহের পূর্বে কন্যারও কৌতুক-মঙ্গলাদি আচার অনুষ্ঠিত হতো।[১০]

বিবাহ আসরে কন্যার পিতাই দাতা; তাঁর ইচ্ছাই পালনীয়

কন্যার পিতা দাতা। তিনি কন্যাকে প্রতিপালন করে সৎপাত্রে দান করেন। তিনি যেহেতু দাতা, তাই বরপক্ষের কাছে তাঁর বাক্যই পালনীয়। রাজা দশরথ রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গের সংবাদ শুনে মিথিলায় আগমন করলে জনক রাজা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন: বীর্যবত্তায় যাঁরা শ্রেষ্ঠ, সেই মহাপ্রাণ রঘুবংশীয়দের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধে আজ আমি ধন্য হলাম। হে রাজন্, কাল প্রভাতে

যজ্ঞের শেষে ঋষিদের অভিমত অনুসারে আপনিই বিবাহ সম্পাদন করবেন। তখন রাজা দশরথ রাজর্ষি জনককে বলেন: আমি পরম্পরাক্রমে শুনেছি যে, দাতা স্বেচ্ছায় সদ্‌বস্তু দান করতে চাইলে তা গ্রহণ করা সমুচিত। আপনি সত্যনিষ্ঠ। আপনার বাক্য ধর্মসম্মত ও যশস্কর। তাই আপনি যা বলছেন, তা আমরা প্রতিপালন করব।[১১] দশরথের এই উক্তিতে কন্যার পিতা রাজর্ষি জনকের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে।

বিবাহমণ্ডপের বর্ণনা

বিবাহমণ্ডপের মধ্যে শাস্ত্রীয় নিয়মে বেদি তৈরি করা হতো। দশরথপুত্রদের বিবাহ বেদির সবদিক চন্দন ও পুষ্প দিয়ে সাজানো ছিল। বিবাহ বেদির চারদিকে সোনার ঝালর টাঙানো ছিল। বেদিতে স্থাপন করা হয়েছিল অঙ্কুর সমন্বিত চিত্রিত কলস। অঙ্কুরিত ছোলা, মুগাদিপূর্ণ শরা স্থানে স্থানে রাখা হয়েছিল। সেখানে স্থাপন করা ছিল ধূপসহ ধুনুচি। শঙ্খপাত্র, স্রুব, স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র এবং পূজার অর্ঘ্যপাত্র সব সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।[১২]

পুরোহিত কর্তৃক হোম

দশরথপুত্রদের বিবাহের প্রধান পুরোহিত ছিলেন ঋষি বসিষ্ঠ। তিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মন্ত্রপাঠ করে সেই বেদিতে অগ্নিস্থাপন করে তাতে খৈ, আতপচাল আহুতি দিয়েছিলেন।[১৩]

পাণিগ্রহণ

বর কর্তৃক কন্যার পাণিগ্রহণ বিবাহের একটি প্রধান ক্রিয়া। কন্যার পিতা বা পিতৃস্থানীয় কেউ অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বরের হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। রাজা জনক তাঁর দুই কন্যা ও দুই ভ্রাতৃকন্যাকে তাঁদের বরের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। প্রথমেই তিনি সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে সম্প্রদান করে বলেন: তুমি একে গ্রহণ করো। তোমার কল্যাণ হোক। তোমার হস্তের দ্বারা তুমি সীতার হস্ত গ্রহণ করো। সীতা সৌভাগ্যবতী পতিব্রতা হয়ে সর্বদাই ছায়ার মতো তোমার অনুগামিনী হবে।[১৪] এরপর জনক লক্ষ্মণকে বলেন: এসো, তোমার কল্যাণ হোক। তোমায় আমি ঊর্মিলাকে দিতে চাই। এর হস্ত তুমি গ্রহণ করো।[১৫] এরপর রাজা জনক ভরতকে বলেন: হে রঘুনন্দন, তোমার হস্ত দ্বারা মাণ্ডবীর হস্ত

তুমি গ্রহণ করো।[১৬] অবশেষে রাজা জনক শত্রুঘ্নকে বলেন: হে মহাবীর, শ্রুতকীর্তির হস্ত তোমার হস্তে গ্রহণ করো।[১৭]

দম্পতির অগ্নি ও গুরুজনদের প্রদক্ষিণ

বিবাহ মণ্ডপে দম্পতি পরস্পর হস্তধারণ করে অগ্নি ও গুরুজনদের প্রদক্ষিণ করতেন। এ প্রথা আজও প্রচলিত। দশরথের চারপুত্র পত্নীদের পাণিগ্রহণ করে তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে অগ্নি, তারপর যজ্ঞবেদি, রাজা, ঋষিমণ্ডলী এবং অন্য মহাত্মগণকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন।[১৮]

কন্যাকে পিতৃগৃহ হতে উপহার প্রদান

রাজা জনক তাঁর কন্যাগণকে উপহারস্বরূপ অনেক ধন দান করেছিলেন। বহু লক্ষ ধেনু, অনেক কম্বল, অনেক রেশমী ও পট্টবস্ত্র, এক কোটি সাধারণ বস্ত্র, হস্তী-অশ্ব-রথ এবং পদাতিক সৈন্য, অলঙ্কারে শোভিতা একশত সুন্দরী দাসী, বহু ভৃত্য, ভালো সোনা-মুক্তা-প্রবাল কন্যাদের তিনি আনন্দিত চিত্তে দান করেছিলেন।[১৯] এখানে পিতা আনন্দিতচিত্তে তাঁর কন্যাকে উপহার দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানের বরপণ এটা নয়। সেকালে বর্তমানের বরপণের মতো নিষ্ঠুর ব্যাপার দৃষ্ট নয়।

পিতাই কন্যার পতি নির্ধারণ করতেন

কন্যার পতি নির্বাচনে পিতার একটি ভূমিকা লক্ষ করা যায়। রাজা কুশনাভের একশত কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁদের কুমারী জীবন যথেষ্ট আনন্দময় ছিল। সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে একদিন তাঁরা এক উদ্যানে বেড়াতে যান। সেখানে নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা তাঁরা আনন্দ করতে থাকেন। অপরূপ শতকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বায়ুদেবতা তাঁদের পত্নী হওয়ার প্রস্তাব দেন। (আদিকাণ্ড, ৩২/১৬-১৭)। কিন্তু বায়ুর প্রস্তাব শুনে শতকন্যা তাঁকে উপহাসের সঙ্গে বলেন: হে দুষ্টচিত্ত, সত্যবাদী পিতাকে অবজ্ঞা করে আমরা নিজেরাই পতিগ্রহণ করে স্বয়ম্বরা হব, এমন সময় আমাদের যেন না আসে। পিতাই আমাদের প্রভু। পরম দেবতা। পিতা যাঁর কাছে সম্প্রদান করবেন, তিনিই হবেন আমাদের পতি।[২০]

দানবরাজ ময় তাঁর কন্যা মন্দোদরীকে রাবণের হাতে সম্প্রদান করার ইচ্ছা নিজেই রাবণকে বলেছিলেন। তাঁর কন্যা সঙ্গেই ছিল। কিন্তু সম্প্রদান করার আগে একবারও তিনি তার মেয়ের মতামত নেন নি। বরং রাবণের পরিচয় জেনে তিনি রাবণকে স্বীয় কন্যা প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন: রাজন্, অপ্সরা হেমা যাকে জঠরে ধারণ করেছিল, এই সেই কন্যা। এর নাম মন্দোদরী। তুমি নিজের পত্নী হিসেবে একে গ্রহণ করো।[২১]

বিয়ের প্রস্তাবে অসম্মতিতে ধর্ষণের চেষ্টা ও শারীরিক আঘাত

রাজা কুশনাভের সুন্দরী শতকন্যা তাঁদের পিতার অনুপস্থিতিতে বায়ুর দেয়া বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ক্রুদ্ধ বায়ু তাঁদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে দিয়েছিলেন। বায়ুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাঁদের শরীর খর্ব হয়ে গিয়েছিল।[২২] এটি নিঃসন্দেহে সেই সময়ের একটি খারাপ দৃষ্টান্ত। আজও সমাজে এরূপ ঘটনা প্রতিদিনই দৃষ্ট হয়। প্রত্যাখ্যাত পুরুষের দ্বারা কোনো নারী নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।

সীতা ছিলেন বীর্যশুল্কা

জনক রাজার পূর্বপুরুষগণ দ্বারা পূজিত একটি হরধনু রাজপ্রাসাদে রক্ষিত ছিল। দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর ও মহানাগেরা কেউই এই হরধনু তুলতে পারে নি। রাজর্ষি জনক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন– যিনি এই হরধনুতে বাণ যোজনা করতে পারবেন, তাঁর হাতেই তিনি তাঁর কন্যা সীতাকে সম্প্রদান করবেন। তাই রামচন্দ্র যখন হরধনু ভঙ্গ করেন, তখন রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রকে বলেন: হে কৌশিক, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার কন্যা হবে বীর্যশুল্কা। সেটি আজ সত্য হলো। আমার অত্যন্ত আদরের কন্যা সীতাকে রামের হাতে তুলে দেব। আপনার অনুমতি পেলে আমার মন্ত্রীরা সত্বর অযোধ্যায় যেতে পারে। তাঁরা বিনম্র বাক্যে রাজা দশরথকে সন্তুষ্ট করবেন। রথে করে তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে আসবেন। বীর্যশুল্কা সীতাকে সম্প্রদানের বার্তা সব বলুন।[২৩]

পত্নীবান স্বামীর নিকট পত্নীই হচ্ছে আত্মা

সতী নারীর নিকট তাঁর স্বামী যেমন দেবতা, আবার পত্নীবান স্বামীর নিকট তাঁর পত্নীই আত্মা। রামচন্দ্র ছিলেন স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ। সীতা ছিলেন রামচন্দ্রের আত্মা।[২৪] সেকালের এই আদর্শটি প্রশংসনীয়।

পত্নীদান শ্রেষ্ঠ দান

শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি প্রয়োগের ফলে এবং বিভিন্ন বেদের নির্দেশে পত্নী পুরুষের অভিন্ন রূপ। জগতে জ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, পত্নীদানের চেয়ে আর বড় দান নেই।[২৫] এখানে মূলত বালীপত্নী তারা তাঁর মৃত স্বামী বালীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রামের কাছে অনেক মিনতি করেছেন। তারা চাইছেন, রাম যেন তাঁকে হত্যা করেন। এই হত্যায় রামের কোনো পাপ হবে না। কারণ, মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মা স্বামী বালীর আত্মার সঙ্গে মিলিত হবে। এবং এটা হবে স্বামীর কাছে পত্নীদান। এ বিবরণের মধ্য দিয়ে সেকালে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনের ধারণার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বিবাহের পাত্র হিসেবে যোগ্য বীরপুরষ

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বীর পুরুষকে কন্যাদানের জন্য বেশি যোগ্য মনে করতেন। বীরের পত্নীদেরও মর্যাদা ছিল। বালীর মৃত্যুর পর তারার বিলাপে এমন বিষয় ফুটে উঠেছে। তারা মৃত বালীর উদ্দেশে বলেছেন: তুমি তো অন্যদের মান দান করে থাক। আমাকে একা অসহায় রেখে তুমি চলে গেলে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বীরদের আর কন্যা দান করবেন না। বীরপত্নীরূপে আমার যে মর্যাদা ছিল, তা আজ বিনষ্ট হয়ে গেল। নষ্ট হয়ে গেল আমার স্থায়ী সুখ।[২৬]

কুলগুরু, মন্ত্রিবর্গ সবার সম্মতিতেই রাজপরিবারের বিবাহ সম্পাদিত হতো

পুত্ররা বিবাহযোগ্য হলে রাজা দশরথ তাঁর পুত্রদের বিবাহ নিয়ে উপাধ্যায়, মন্ত্রী ও সুহৃদ্‌বর্গের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।[২৭] রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করলে মিথিলারাজ জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতি নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের বিয়ের প্রস্তাব তাঁর মন্ত্রিবর্গের মাধ্যমে অযোধ্যায় পাঠিয়ে দেন। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করেছেন– এ সংবাদ শুনে রাজা দশরথ খুব খশি হন। কিন্তু মহাপ্রাণ জনকের প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত তিনি একা দেননি। তিনি বশিষ্ঠ, ঋষি বামদেব এবং মন্ত্রিবর্গকে বলেন: রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের তত্ত্বাবধানে বিদেহদেশে বাস করছে। সেখানে মহাত্মা জনক রামের বীর্যবত্তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই এখন রামচন্দ্রের হাতে তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করতে চাইছেন। মহাপ্রাণ জনকের এই প্রস্তাব যদি আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে সত্বর আমি মিথিলা নগরীতে যাব।[২৮] এখানে লক্ষণীয়, রাজা দশরথ তাঁর নিজ সন্তানের বিবাহ বিষয়ে কোনো একক সিদ্ধান্ত নেননি। কুলগুরু, মন্ত্রিবর্গ সবার সিদ্ধান্তকে

তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। এটাই সুসঙ্গত বলে মনে হয়। সমাজবিনির্মাণে বিবাহের ভূমিকা তথা সামাজিকতা খুবই ব্যাপক।

এখানে প্রধানত রামায়ণে দৃষ্ট সমাজের উঁচু স্তর তথা রাজকুলের বিবাহপ্রথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এ প্রথা সে যুগে সর্বত্র ছিল, এটা অনুমিত। বর্তমান সমাজেও এর বহুকিছু প্রচলিত।

তথ্যসূত্র :

১. রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধাদ্ বীর্যশ্রেষ্ঠৈর্মহাবলৈঃ।
শ্বঃ প্রভাতে নরেন্দ্র ত্বং সংবর্তয়িতুমর্হসি ॥ আদিকাণ্ড,৬৯/১২
যথা দশরথস্যেয়ং তথাঽযোধ্যা পুরী মম।
প্রভুত্বে নাস্তি সন্দেহো যথার্হং কর্তুমর্হতঃ ॥ আদিকাণ্ড,৭২/১৬
কঃ স্থিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাজ্ঞাং সংপ্রতীক্ষতে।
স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি যথা রাজ্যমিদং তব ॥
কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ ॥ আদিকাণ্ড,৭৩/১৪-১৫

২. আদিকাণ্ড,৭৩ সর্গ

৩. অদ্য সর্বে ধনাধ্যক্ষা ধনমাদায় পুষ্কলম্ ।
ব্রজন্ত্বগ্রে সুবিহিতা নানারত্নসমন্বিতাঃ ॥
চতুরঙ্গবলঞ্চাপি শীঘ্রং নির্যাতু সর্বশঃ।
মমাজ্ঞাসমকালঞ্চ যানং যুগ্যমনুত্তমম্ ॥
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুর্ঋষিঃ কাত্যায়নস্তথা ॥
এতে দ্বিজাঃ প্রযান্ত্বগ্রে স্যন্দনং যোজয়স্ব মে।
যথা কালাত্যয়ো ন স্যাদ্দূতা হি ত্বরয়ন্তি মাম্ ॥
বচনাচ্চ নরেন্দ্রস্য সেনা চতুরঙ্গিণী।
রাজানমৃষিভিঃ সার্ধং ব্রজন্তং তেঽন্বগাৎ ॥ আদিকাণ্ড, ৬৯/২-৬

৪. মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো।
ফাল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু।
রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে দানং কার্যং সুখোদয়ম্ ॥ আদিকাণ্ড,৭১/২৪

৫. উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৭২/১৩

৬. প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে ॥ আদিকাণ্ড,৭১/২

৭. পিতৃকার্যঞ্চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু ॥ আদিকাণ্ড,৭১/২৩
স গত্বা নিলয়ং রাজা শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। আদিকাণ্ড,৭২/২১

৮. গবাং শতসহস্রঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো নরাধিপঃ।
একৈকশো দদৌ রাজা পুত্রানুদ্দিশ্য ধর্মতঃ ॥
সুবর্ণশৃঙ্গাঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ ॥
বিত্তমন্যচ্চ সুবহু দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।
দদৌ গোদানমুদ্দিশ্য পুত্রাণাং পুত্রবৎসলঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৭২/২২-২৪

৯. যুক্তে মুহূর্তে বিজয়ে সর্বাভরণভূষিতৈঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥ আদিকাণ্ড,৭৩/৯

১০. কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ ॥ আদিকাণ্ড,৭৩/১৫

১১. বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ।
প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা ॥
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্ ।
তদ্ধর্মিষ্ঠং যশস্যঞ্চ বচনং সত্যবাদিনঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৬৯/১৪-১৫

১২. বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দঞ্চ ধার্মিকম্ ।
প্রপামধ্যে তু বিধিবদ্ বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ ॥
অলংচকার তাং বেদিং গন্ধ-পুষ্পৈঃ সমন্ততঃ।
সুবর্ণপালিকাভিশ্চ চিত্রকুম্ভৈশ্চ সাঙ্কুরৈঃ ॥
অঙ্কুরাঢ্যৈঃ শরাবৈশ্চ ধূপপাত্রৈঃ সধূপকৈঃ।
শঙ্খপাত্রৈঃ স্রুবৈঃ স্রুগ্ভিঃ পাত্রৈরর্ঘ্যাদিপূজিতৈঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৭৩/২০-২২

১৩. লাজপূর্ণৈশ্চ পাত্রীভিরক্ষতৈরপি সংস্কৃতৈঃ।
দর্ভৈঃ সমৈঃ সমাস্তীর্য বিধিমন্ত্রপূর্বকম্ ॥
অগ্নিমাধায় তাং বেদ্যাং বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ।
জুহাবাগ্নৌ মহাতেজা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৭৩/২৩-২৪

১৪. প্রতীচ্ছচৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা ।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা ॥ আদিকাণ্ড,৭৩/২৭

১৫. অব্রবীজ্জনকো রাজা হর্ষেণাভি পরিপ্লুতঃ।
লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে ঊর্মিলামুদ্যতাং ময়া ॥ আদিকাণ্ড, ৭৩/৩০

১৬. তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতং চাভ্যভাষত ॥

গৃহাণ পাণিং মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন । আদিকাণ্ড,৭৩/৩১-৩২

১৭. শত্রুঘ্নং চাপি ধর্মাত্মা অব্রবীন্মিথিলেশ্বরঃ ॥
শ্রুতকীর্তের্মহাবাহো পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা । আদিকাণ্ড,৭৩/৩২-৩৩

১৮. চত্বারস্তে চতসৃণাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ।
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ ॥
ঈদৃশে বর্তমানে তু তূর্যোদ্‌ঘুষ্টনিনাদিতে ।
ত্রিরগ্নিং তে পরিক্রম্য ঊহুর্ভার্যা মহৌজসঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৭৩/৩৫,৩৯

১৯. অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু।
গবাং শতসহস্রাণি বহূনি মিথিলেশ্বরঃ ॥
কম্বলানাঞ্চ মুখ্যানাং ক্ষৌম্যান্ কোট্যম্বরাণি চ।
হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতং দিব্যরূপং স্বলঙ্কৃতম্ ॥
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্ ।
হিরণস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ ॥
দদৌ রাজা সুসংহৃষ্টঃ কন্যাধনমনুত্তমম্ ।
দত্ত্বা বহুবিধং রাজা সমনুজ্ঞাপ্য পার্থিবম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৭৪/৩-৬

২০. মা ভূৎ স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্ ।
অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ং বরমুপাস্মহে ॥
পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ সঃ।
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ আদিকাণ্ড, ৩২/২১-২২

২১. দাতুং দুহিতরং তস্মৈ রোচয়ামাস তত্র বৈ।
করেণ তু করং তস্যা গ্রাহয়িত্বা ময়স্তদা ॥ উত্তরকাণ্ড, ১২/১৭

২২. তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা হরিঃ পরমকোপনঃ।
প্রবিশ্য সর্বগাত্রাণি বভঞ্জ ভগবান্ প্রভুঃ॥
অরত্নিমাত্রাকৃতয়ো ভগ্নগাত্রা ভয়ার্দিতাঃ।
তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুর্নৃপতের্গৃহম্।
প্রবিশ্য চ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রুলোচনাঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৩২/২৩-২৪
বায়ুঃ সর্বাত্মকো রাজন্ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।
অশুভং মার্গমাস্থায় ন ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে ॥ আদিকাণ্ড, ৩৩/২

২৩. মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্যশুল্কেতি কৌশিক।
সীতা প্রাণৈর্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা ॥
ভবতোঽনুমতে ব্রহ্মন্ শীঘ্রং গচ্ছন্তু মন্ত্রিণঃ।
মম কৌশিক ভদ্রন্তে অযোধ্যাং ত্বরিতা রথৈঃ ॥
রাজানং প্রশ্রিতৈর্বাক্যৈরানয়ন্তু পুরং মম।
প্রদানং বীর্যশুল্কায়াঃ কথয়ন্তু চ সর্বশঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৬৭/২৩-২৫

২৪. আত্মা হি দারাঃ সর্বেষাং দারসংগ্রহবর্তিনাম্ ।

আত্মেয়মিতি রামস্য পালয়িষ্যতি মেদিনীম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৭/২৪

২৫. শাস্ত্রপ্রয়োগাদ্ বিবিধাচ্চ বেদাদনন্যরূপাঃ পুরুষস্য দারাঃ।
দারপ্রদানাদ্ধি ন দানমন্যৎ প্রদৃশ্যতে জ্ঞানবতাং হি লোকে ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৪/৩৮

২৬. মামনাথাং বিহায়ৈকাং গতস্ত্বমসি মানদ।
শূরায় ন প্রদাতব্যা কন্যা খলু বিপশ্চিতা ॥
শূরভার্যাং হতাং পশ্য সদ্যো মাং বিধবাং কৃতাম্ ।
অবভগ্নশ্চ মে মানো ভগ্না মে শাশ্বতী গতিঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৩/৮-৯

২৭. অথ রাজা দশরথস্তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি ॥
চিন্তয়ামাস ধর্মাত্মা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
তস্য চিন্তয়মানস্য মন্ত্রিমধ্যে মহাত্মনঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১৮/৩৭-৩৮

২৮. দূতবাক্যন্তু তচ্ছ্রুত্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ মন্ত্রিণশ্চৈবমব্রবীৎ ॥
গুপ্তঃ কুশিকপুত্রেণ কৌসল্যানন্দনবর্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা বিদেহেষু বসত্যসৌ ॥
দৃষ্টবীর্যস্তু কাকুৎস্থো জনকেন মহাত্মনা ।
সম্প্রদানং সুতায়াস্তু রাঘবে কর্তুমিচ্ছতি ॥
যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ।
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ ॥
মন্ত্রিণো বাঢ়মিত্যাহুঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
সুপ্রীতশ্চাব্রবীদ্ রাজা শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিণঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৬৮/১৪-১৮

Dhaka University Institutional Repository

নারী

একটি সমাজে নর-নারীর অবস্থানের সাম্যের ওপর সেই সমাজের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। বিশেষত সমাজের সুস্থতা, সৌন্দর্য নারীর অবস্থানের ওপর অধিক বিবেচ্য। রামায়ণের যুগে পতিব্রতা সতী-সাধ্বী নারীর স্বরূপ, পতিকেই নারীর দেবতারূপে বিশ্বাস করা, বিধবা নারী সমাজে কতটা অসহায়, নারীর পর্দানশীলতা, নারীধর্ষণ, পত্নী ব্যতীত যজ্ঞ অসম্পূর্ণ, কন্যার পিতা হওয়া দুঃখের কারণ প্রভৃতি এখানে আলোচিত হয়েছে।

পুত্র অপেক্ষাও স্বামী আপন

নারীর কাছে পতিই সবচেয়ে আপনজন। তাই সবার আগে সতী নারী পতির ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বলে মনে করেন। কোটি পুত্রের ইচ্ছার চেয়েও কেবল স্বামীর ইচ্ছাপূরণেই নারীর কল্যাণ নিহিত।[১] শতপুত্রের জননী হলেও পতিকে ছেড়ে সতী সুখ পেতে পারেন না।[২] বালীর মৃত্যুর পর তাঁর নিকট আত্মীয়রা বালীপত্নী তারাকে বলল: বানরসৈন্যরা রামচন্দ্রের ভয়ে অভিভূত। তাই এই নগরীকে রক্ষা করা, অঙ্গদকে দ্রুত রাজপদে অভিষিক্ত করা কর্তব্য। সিংহাসনে অভিষিক্ত হলে বালীর পুত্রকে সবাই সেবা করবে। নিকট আত্মীয়দের এই কথা শুনে সতী তারা নিজের কর্তব্য সম্পর্কে বললেন: বানরশ্রেষ্ঠ বালী ছিলেন আমার পতিদেবতা। সেই পূজনীয় পতি যখন যমালয়ে চলে গেলেন, তখন পুত্র, রাজ্য এবং আমার জীবনেরই বা কী প্রয়োজন ?[৩] বালীর মৃত্যুর পর তারাকে সান্ত্বনা দিয়ে হনুমান বলেন: হে মহীয়সী, শোকসন্তপ্ত সুগ্রীব ও অঙ্গদ এই দু'জনকে পাঠিয়ে দাও। অঙ্গদ তোমার আনুগত্যে রাজ্য পালন করুক। এটাই তো কালের বিধান। বানররাজ বালীর অগ্নি সংস্কার করো। অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে পুত্রকে সিংহাসনে দেখে তুমি শান্তি লাভ করো।[৪] তখন স্বামীশোকে বিষণ্ণা তারা হনুমানকে বলেন: অঙ্গদের মতো একশ পুত্রের চেয়েও নিহত এই বীর পতির গাত্র আলিঙ্গন করা আমার কাছে অধিকতর প্রিয়।[৫]

পতিই পত্নীর দেবতা

সতী নারীর কাছে তাঁর পতিই দেবতা। যাঁরা সতী স্ত্রী, তাঁরা প্রতিষ্ঠিত থাকেন সচ্চরিত্রে, সত্যনিষ্ঠায়, প্রজ্ঞায়। তাঁদের কাছে একমাত্র পতিই পরম আশ্রয় ও পবিত্র।[৬] সীতাদেবী কৌশল্যা

দেবীকে বলেছেন: বাবা যা দেন, তা পরিমিত। ভাই ও ছেলে হিসেব করেই দিয়ে থাকে। কিন্তু স্বামী যা দেন তা অপরিমিত। সেই স্বামীকে কে পূজা করবে না?[৭]

অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া সীতাকে বলেছেন: নগরেই থাকুন বা বনেই থাকুন,ভালোই হোন বা মন্দই হোন, পতিই যাঁদের প্রিয় তাঁদের জন্য রয়েছে মহাসৌভাগ্যের স্বর্গলোক। পতি দুশ্চরিত্র হোক, কামী হোক বা নির্ধন হোক, সদাচারিণী স্ত্রীর কাছে তিনি হচ্ছেন পরম দেবতা। অনেক চিন্তা করেও পতির চেয়ে নারীর বড় কোনো বান্ধব আমি দেখছি না। সীতা, তপস্যা যেমন অব্যয় এবং সর্বত্রই যোগ্য, পতিও পত্নীর কাছে তাই।[৮] পতিই নারীর গুরু। পতি যদি অনাচারী ও বেকার হন, তাহলেও নারীদের উচিত কোনো দ্বিধা না রেখে তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।[৯] রামচন্দ্র বনগমনকালে দেবী কৌশল্যা তাঁর সঙ্গে বনগমনে ইচ্ছা প্রকাশ করলে রামচন্দ্র তাঁর মাকে বলেছেন: পতিকে পরিত্যাগ করার চেয়ে পত্নীর নিষ্ঠুরতার আর কিছু নেই। নিন্দনীয় সেই কাজকে আপনার মনেও স্থান দেওয়া উচিত নয়। জীবিতাবস্থায় স্বামীই হলেন স্ত্রীলোকের দেবতা এবং প্রভু।[১০] গুণবানই হোক বা নির্গুণই হোক, স্বামী ধার্মিক নারীদের কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা।[১১]

এখানে লক্ষণীয়, স্বামী লোকটা নির্গুণ দুশ্চরিত্র হলেও সে স্ত্রীর কাছে পূজনীয়। একজন নারীই এটাকে জীবনের স্বাভাবিক ব্রত বলে বিশ্বাস করেছে, অথবা তাকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। রামায়ণে স্বামীর জন্য স্ত্রী ত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু স্ত্রীর জন্য স্বামীর ত্যাগ স্বীকারের কোনো কথা নেই। এটা মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর আত্মমর্যাদার অবহেলা ও উপেক্ষা।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু ইহলোকে এক জনমেই নয়; তাঁদের সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তর ধরে। সীতাদেবী রামচন্দ্রকে বলেছেন: এই সংসার থেকে চলে গিয়ে মৃত্যুর পরও আপনার সঙ্গে আমার হবে মঙ্গল মিলন। যশস্বী ব্রাহ্মণদের মুখে আমি বেদবাক্যে শুনেছি যে ইহলোকে পিতৃগণ জলের দ্বারা সঙ্কল্প করে যার কাছে যাকে স্ত্রীরূপে সম্প্রদান করেছেন, মৃত্যুর পর জন্মান্তরেও সে তারই থাকে।[১২]

স্ত্রী একাই স্বামীর ভাগ্য লাভ করে

মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে-বৌ সবাই নিজ নিজ ভাগ্যানুসারে নিজেদের অর্জিত পুণ্যই ভোগ করে থাকে। কিন্তু স্ত্রী একাই স্বামীর ভাগ্য লাভ করে থাকে। পতির ভাগ্যই সতীর ভাগ্য। তাই রামচন্দ্র যখন বনবাসে যাওয়ার জন্য সীতাদেবীর কাছে বিদায় নিতে গেলেন তখন সীতাদেবী বললেন: আপনার বনবাসের আদেশে আমিও আদিষ্ট হয়েছি। তাই আমাকেও বনে বাস করতে হবে।[১৩]

পতিই সতীর ইহলোক-পরলোকের একমাত্র গতি

পিতা, পুত্র, মাতা, সখী এমনকি আত্মাও নারীর সদ্গতি বিধান করতে পারে না। ইহলোকে এবং পরলোকে পতিই নারীদের একমাত্র গতি।[১৪] রামের সঙ্গে বনবাসে যাওয়ার জন্য নানা যুক্তি দেখিয়ে সীতা এ কথাগুলো বলেছেন।

নারীদের পতিই হলো প্রথম গতি

রামচন্দ্র বনগমনের পর কৌশল্যা রাজা দশরথকে বলেছেন: পতিই নারীদের প্রথম গতি। দ্বিতীয় গতি হলো পুত্র। তৃতীয় জ্ঞাতিরা। চতুর্থ আর কেউ নেই।[১৫] দেবী কৌশল্যা আক্ষেপ করে দশরথকে বলেছেন: আপনি আমার প্রথম গতি হলেও আমার নন। আপনি কৈকেয়ীর। দ্বিতীয় যে রাম তাকে আপনি বনে পাঠিয়েছেন। আপনি আছেন বলে আমি বনে যেতেও ইচ্ছা করি না। এই অবস্থায় আমি সব রকমে ব্যর্থ। এখানে নারীর আত্মসত্তার বিলোপ ঘটেছে। জীবনের প্রতি স্তরে নারী যেন পরাধীন। কৌশল্যার এই উক্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, সেকালে সমাজ নারীকে আত্মমর্যাদাশীল হয়ে গড়ে উঠতে দেয় নি। বর্তমানেও যে নারী পুরুষের সমমানের আত্মমর্যাদা পেয়েছে তা বলা যায় না।

কন্যার পিতা হওয়া দুঃখের কারণ

কন্যা সন্তানকে বড় করার পর সৎপাত্রে দান করা পিতার মহান কর্তব্য। কন্যা সন্তানকে নিয়ে পিতার চিন্তা সবচেয়ে বেশি। দেবী সীতা অনসূয়া দেবীর কাছে তার বালিকাজীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন: আমার যখন বিয়ের বয়স হয়েছিল, তখন আমার বাবা আমাকে নিয়ে চিন্তান্বিত হয়েছেন। গরিবের বিত্তনাশ হলে যে রকম চিন্তা হয়, বাবারও হলো তাই। ভূতলে ইন্দ্রের মতো হলেও তিনি যদি

কন্যার পিতা হন, তাহলে তাঁরই সমান বা তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির কাছেও তিনি অসম্মান পেয়ে থাকেন।[১৬]

রাক্ষস সুমালী তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যাকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় ছিলেন। কন্যার পিতা হওয়ায় তিনি দুঃখ করে বলেছেন: সম্মানার্থী সকল ব্যক্তির কাছেই কন্যার পিতা হওয়া দুঃখের কারণ। যেহেতু আগে থেকে বোঝা যায় না যে, কেমন পুরুষ কন্যাকে বরণ করবে। স্বীয় মাতৃকুল, আপন পিতৃকুল এবং যে কুলে কন্যাকে সম্প্রদান করা হবে সেই পতিকুল– কন্যা এই তিন কুলকেই সংশয়াপন্ন করে থাকে।[১৭]

দিতিপুত্র ময় তার কন্যা মন্দোদরীকে পাত্রস্থ করার জন্য দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তাঁর কন্যার যোগ্য পতি সন্ধানে তিনি সকন্যা বহির্গত হয়েছিলেন। বনমধ্যে রাবণের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে রাবণ ময়কে দেখে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন ময় তাঁর পরিচয় দিয়ে রাজ্য ছেড়ে বহির্গত হওয়ার কারণ বলেন: কন্যার যোগ্য পতি সন্ধানে আমি বহির্গত হয়েছি। সম্মানাকাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তির পক্ষেই কন্যার পিতা হওয়া অতি দুঃখকর। পিতৃকুল ও পতিকুল দুই কুলকেই কন্যা সতত সংশয়াশ্রিত করে। [১৮] কিন্তু সে সমাজে পুত্রজন্ম ঘটলে পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। তাই দেখা যায়, পুত্র সন্তান কামনা করে রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছেন। কন্যা কামনা করে কেউ কন্যেষ্টি যজ্ঞ করেননি। মহামুনি বিশ্বামিত্র অযোধ্যার রাজসভায় এলে রাজা দশরথ আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন– অপুত্রক ব্যক্তির ধর্মরতা পত্নীতে পুত্রজন্ম, নষ্টদ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তি ও পুত্রজন্মের উৎসবজনিত আনন্দের মতো আনন্দময় আপনার আগমন।[১৯] এ থেকেই বোঝা যায়, সে সমাজে পুত্রজন্ম খুবই কাঙ্ক্ষিত ছিল কিন্তু কন্যাজন্ম ছিল পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার কারণ। আজও কি অবস্থার খুব পরিবর্তন ঘটেছে? কন্যার স্বাভাবিক জন্ম দূরে থাক, মাতৃগর্ভে কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রবণতা পরিলক্ষিত।

পতিব্রতা নারীর স্বভাব

সতী নারীর পাতিব্রত্যই পরম ধর্ম। বিবাহিতা নারীর পতিভক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পতিসেবা ছাড়া সতীনারীর অন্য কোনো তপস্যার বিধান নেই।[২০] পতিব্রতা সীতা, সাবিত্রী, রোহিণী

প্রভৃতি নারী চরিত্রের মাধ্যমে কবি বাল্মীকি সতীত্বের চিত্র অঙ্কন করেছেন। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী। তাই জীবনের প্রতিপদে সতী নারী স্বামী ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারেন না। স্বর্গে সকল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা দেবী রোহিণী। তিনি চন্দ্রকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ নারীরা স্বামীর প্রতি একান্ত ভক্তিমতী। স্বামীসেবাই তাঁদের কাছে পুণ্যকর্ম। অশোক বনে রাবণ যখন সীতাকে বিভিন্ন প্রলোভনমূলক বাক্য বলেছিলেন, তখন পতিব্রতা সীতাদেবী তাঁকে বলেছিলেন: আমি পতিব্রতা। স্বামীই আমার একমাত্র আরাধ্য। এ রকম নিন্দনীয় কাজ আমি করতে পারি না। [২১]

পতিব্রতা নারীর স্বভাব সম্পর্কে রামায়ণে অনেক উল্লেখ থাকলেও পত্নীব্রত পুরুষের স্বভাব নিয়ে কোনো আলোচনা নেই।

অসতী নারীর স্বভাব

পতির দ্বারা সর্বদা সম্মানিত হয়েও যে স্ত্রীরা বিপন্ন পতিকে সমাদর করে না, জগতে তারা অসতী। স্বামীর কাছ থেকে প্রথমে সুখলাভ করেও পরে সামান্য অসুবিধা হলেও তারা স্বামীকেই দোষারোপ করে। তাকে ত্যাগ করে। এই স্ত্রীরা মিথ্যাচরিত্রা, বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্না, হৃদয়হীনা। সহজে তাদের কাছে যাওয়া যায় না। এই অসতীরা পাপ কার্যের সঙ্কল্প করে। তাদের বৈরাগ্য মুহূর্তের জন্য মাত্র। পতির বংশমর্যাদা, সৎকর্ম, পাণ্ডিত্য, দান, এমনকি সুখ্যাতি অর্জন কোনো কিছুই এমন নারীর হৃদয়কে স্থায়ীভাবে আকর্ষণ করে না। কারণ তাঁদের হৃদয় চঞ্চল।[২২] বনবাসে যাওয়ার সময় কৌশল্যা দেবী সীতাকে অসতী ও সতী নারীর তুলনা করতে গিয়ে এ কথাগুলি বলেছিলেন।

নারীর চিত্ত সদা চঞ্চল

নারীর হৃদয় স্থির নয়, বিশেষ করে বিপদের সময়। সীতাদেবীকে বলা হয় স্থিরমতি। তিনি মাতা বসুন্ধরার কন্যা। কিন্তু তিনিও বিপদে ধৈর্য হারিয়েছিলেন। রামচন্দ্র স্বর্ণহরিণরূপী মারীচকে হত্যা করলে মারীচ ছল করে রামচন্দ্রের কণ্ঠ নকল করে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে– হা লক্ষ্মণ ! হা সীতা ! তা শুনে সীতাদেবী লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের কাছে যেতে বলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নির্দেশমতো সীতাকে ছেড়ে যেতে চাননি। তখন সীতাদেবী মর্মস্পর্শী বাক্য দ্বারা বৃথা সন্দেহে লক্ষ্মণকে মানসিক আঘাত করেছেন।

লক্ষ্মণ তখন সীতাদেবীকে বলেন: হে মৈথিলি, স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম অনুচিত বাক্য বলা আশ্চর্য নয়। এ সংসারে নারীদের এমন স্বভাব দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা ধর্মত্যাগিনী, চঞ্চলা, উগ্রা ও ভেদসৃষ্টিকারিণী হয়ে থাকে।[২৩]

পত্নী ছাড়া যজ্ঞ অসম্পূর্ণ

'পত্যুর্নো যজ্ঞ-সংযোগে'(পাণিনি,৪/১/৩৩)– সূত্রে পতির সঙ্গে স্ত্রী যজ্ঞে যুক্ত থাকেন বলে পতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'পত্নী' শব্দ সিদ্ধ হয়। যজ্ঞে যজমানকে পত্নীর সঙ্গ নিতে হয়। রাজা দশরথ তাঁর পত্নীদের নিয়েই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। সীতার অনুপস্থিতিতে রামচন্দ্র স্বর্ণসীতা নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। বালীর মৃত্যুর পর সতী তারা বিলাপ করে বলেছেন: সংগ্রামরূপ যজ্ঞ তুমি করেছ। রামের প্রহরণ স্নানীয়জলের কাজ করেছে। যজ্ঞান্তের সেই অবভৃত স্নান তুমি পত্নী ছাড়া কী করে করলে ?[২৪] পত্নী তাই পতির বিলাসসঙ্গিনী নয়; সহধর্মিণী, সহযোগিনী। এখানে পত্নীকে পতির সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পতিই সতীর ভূষণ

সতী নারীর কাছে শারীরিক শোভাবর্ধক অলঙ্কারের চেয়েও অধিক অলঙ্কার হলেন তাঁর পতি। পতি না থাকলে নারী আর শোভা পায় না।[২৫] লঙ্কায় অশোক বনে দুঃখ-সন্তপ্তা, অতি কৃশা তপস্বিনী, বিরহিণী সীতাকে দেখে হনুমান এই মন্তব্য করেন। সতী নারীর কাছে পতির গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই বলা হয়েছে পতিই সতীর ভূষণ। সতীই পতির ভূষণ– এ কথাটি নারীর মর্যাদাবোধক। রাবণকর্তৃক সীতাহরণের পর সীতাবিরহে রামচন্দ্র ছিলেন শোকগ্রস্ত। কিন্তু পতির ভূষণ সতী এ কথাটি রামায়ণে নেই।

সহমরণপ্রথা

স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো কোনো নারী স্বামীর চিতাগ্নিতে নিজেকে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিতেন। বালীর মৃত্যুর পর তারা বিলাপ করে স্বামীর চিতায় সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।[২৬] – এখন বানররাজ বালীর সহগমন আমার ঐহিক ও পারলৌকিক কর্তব্য। সম্মুখে আমার নিহত বীরপতি। তাঁর

চিতায় শয়নই আমার একমাত্র কর্তব্য। অবশ্য তারার সহমরণের ইচ্ছা থাকলেও হনুমান প্রমুখ সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করেছেন। বেদবতীর মাতা স্বামীর চিতায় নিজেকে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। নিজের মাতা-পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বেদবতী তাঁর মায়ের সহমরণের উল্লেখ করে রাবণকে বলেছেন: দৈত্যরাজ শম্ভু কর্তৃক আমার পিতা নিহত হন। তখন আমার মহাভাগা মাতৃদেবী দুঃখে আমার পিতাকে আলিঙ্গন করে অনলে প্রবেশ করেন।[২৭] মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সত্যবতী পতির সহগামিনী হয়েছিলেন। মহর্ষি তাঁর এই বোন সম্পর্কে বলেছেন: আমার দিদি উদারহৃদয়া। পতির অনুগামিনী হয়ে তিনি স্বর্গে গেছেন। এর পুণ্যফলে পবিত্র কৌশিকী নদীরূপে তিনি প্রবাহিতা।[২৮]

কেউ কেউ সহমরণের পক্ষে থাকলেও অধিকাংশ মানুষ সহমরণের বিপক্ষে ছিল। সহমরণের উল্লিখিত উদাহরণ তৎকালীন সমাজের সুনির্দিষ্ট নিয়ম নয়, এগুলি ব্যতিক্রমমাত্র। রামায়ণে সহমরণের কিছু বিচ্ছিন্ন উল্লেখ থাকলেও সে যুগে সহমরণপ্রথা অনুসৃত হয়নি বলা চলে। স্মরণীয়, দশরথের মৃত্যুর পর তাঁর কোনো স্ত্রী সহমরণে যাননি।

বিধবা নারীর দুঃখ

যে নারী পতিহীনা, তার পুত্র থাকলেও, ধনধান্যে তিনি সমৃদ্ধা হলেও তার দুঃখের শেষ নেই। তাই বালীর মৃত্যুর পর তারা বিলাপ করে বলেছেন, ধন-ধান্যে সমৃদ্ধা হলেও পতিহীনা নারীকে সবাই বিধবা বলে।[২৯] একজন পতি তার পত্নীকে হারিয়ে বিপত্নীক হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে একজন বিধবা নারীর অবস্থান এবং একজন বিপত্নীক পুরুষের অবস্থান এক নয়। তাই এখনও এই প্রবাদের প্রচলন আছে– 'ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগীর স্বামী'।

নারী -স্বাধীনতা

অযোধ্যায় নারীদের অনেক স্বাধীনতা ছিল। তাঁরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। অযোধ্যা নগরীতে নারীদের অভিনয়যোগ্য বহু নাট্যশালা ছিল।[৩০] লঙ্কার পথে নারীরা নিঃশঙ্কভাবে ঘুরে বেড়াত।[৩১] রাজর্ষি

তৃণবিন্দুর আশ্রমে অবিবাহিতা কন্যারা প্রায়ই খেলা করতে আসত। সেখানে তারা নাচ, গান, বাদ্যধ্বনি ও হাস্যপরিহাসে আনন্দ করত।[৩২]

পিতৃগৃহ পরম সুখের

পিতৃগৃহ মেয়েদের কাছে পরম সুখের। মেয়েদের বাবার বাড়িতে বসবাস নিশ্চিন্ত, নিরাপদ ও সুখের। বনগমনকালে প্রথমে সীতাদেবীকে সঙ্গে নিতে অসম্মতি জানান রামচন্দ্র। তখন রামচন্দ্রের বনবাসসঙ্গিনী হওয়ার জন্য সীতাদেবী বলেন: বাবার বাড়িতে মেয়েরা যেমন সুখে থাকে, তেমনি বনে আপনার সঙ্গে আমি সুখে থাকব।[৩৩]

পর্দানশীলতা

সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা পর্দানশীলা ছিলেন। রাবণের মৃত্যুর পর রাণী মন্দোদরীর বিলাপে জানা যায়, রাবণের স্ত্রীরা পর্দা মেনে চলতেন। রাবণের মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে রাণী মন্দোদরী বিলাপ করে বলেছেন: তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন? নগরের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে আমি এখানে এসেছি। দেখো, যে পত্নীদের তুমি অভীষ্ট মনে করতে, তারা আজ লজ্জা ও ঘোমটা ছেড়ে দিয়েছে। তাদের সবাইকে বাইরে চলে আসতে দেখেও কেন তুমি রাগ করছ না ?[৩৪] বনগমনের পূর্বে সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে পায়ে হেঁটে কৈকেয়ীভবনে গিয়েছিলেন। তা দেখে পুরবাসীরা শোকার্ত হয়ে বলেন: আকাশচারীদের কাছেও যিনি অদৃশ্য ছিলেন, সেই সীতাদেবীকে আজ পথের লোকজনও দেখছে।[৩৫] নারীরা কখন জনসম্মুখে আসতে পারে সে সম্পর্কে রামায়ণে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে। লঙ্কা যুদ্ধশেষে সীতার জনসম্মুখে আসার ব্যাপারে রামের উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি– বিপদের সময়, কষ্টের সময়, যুদ্ধে, স্বয়ংবর সভায়, যজ্ঞে বা বিবাহে নারীদের সর্বসমক্ষে আসা দোষের নয়।[৩৬] পর্দানশীলতা অবশ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের ক্ষেত্রে প্রচলন ছিল, সাধারণ্যে ছিল না।

বিবাহাদিতে উপহাররূপে নারী প্রদান

বিবাহে উপহাররূপে, বিশেষ ব্যক্তিকে খুশি হয়ে উপঢৌকনরূপে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে সালঙ্কৃতা নারী দানের প্রমাণ পাওয়া যায় রামায়ণে। মিথিলাপতি জনক তাঁর কন্যাদের বিবাহের পর বহু মূল্যবান

উপঢৌকনের সঙ্গে সালঙ্কৃতা একশত সুন্দরী নারী যৌতুকরূপে দান করেছিলেন।[৩৭] লঙ্কাজয়ের পর হনুমান রামচন্দ্রের বিজয় ও আগমন সংবাদ জানালে ভরত খুশি হয়ে তাঁকে আচারবতী সালঙ্করা ষোলজন কন্যাকে ভার্যারূপে দান করেন।[৩৮] অবশ্য এই প্রথা রাজাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলনের কথা জানা যায় না।

মদমত্তা বারস্ত্রী

সে যুগে মদমত্তা এবং বারস্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। মদমত্তা হয়ে বারস্ত্রী নারী প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত।[৩৯] কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের প্রথম সর্গে পম্পা সরোবরতীরে বসন্ত ঋতুর বর্ণনায় একটি উপমার মধ্য দিয়ে এ দৃষ্টান্তটি পাওয়া যায়।

সুখের সময় স্বামীকে ভালোবাসা এবং দুঃখের সময় স্বামীকে ত্যাগ করা নারীর স্বভাব

অগস্ত্য ঋষি রামচন্দ্রকে বলেছেন: নারীদের স্বভাব চঞ্চল। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর দ্রুতগামিতাকে নারীর চাঞ্চল্য অনুগমন করে।[৪০]

বারাঙ্গনা নারীর প্রতি ব্যবহার

আদিকাণ্ডে (৮-১০ সর্গ) ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে আমরা জানতে পারি, ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর কাছে আগতা কয়েকজন বারাঙ্গনাকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। অবশ্য ঋষ্যশৃঙ্গের তখন নারী সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। এখানে বারাঙ্গনা নারীকে পুরুষকে মোহিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটা নারী হিসেবে তাদের প্রতি যোগ্য মর্যাদা নয়।

পরস্ত্রীর ওপর ধর্ষণ মহাপাপ

সীতাহরণে রাবণ মারীচের সাহায্য কামনা করলে মারীচ রাবণকে বলেছিল: পরস্ত্রীর ওপর ধর্ষণ করার চেয়ে বড় পাপ আর নেই।[৪১]

রম্ভার ওপর রাবণের বলাৎকার

রাবণের কৈলাশ পর্বতে একরাত অবস্থান করার সময় স্বর্গের অপ্সরা রম্ভার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দিব্য অলঙ্কারে শোভিতা, শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রম্ভাকে দেখে কামার্ত হয়ে রাবণ তাকে বললেন: আমাকে তুমি

স্বামী হিসেবে স্বীকার করো। তখন রম্ভা ভীত হয়ে রাবণকে বললেন: আপনি প্রসন্ন হোন। আমাকে এই রকম বলা আপনার উচিত নয়। কেননা আপনি আমার গুরুজন। এমন কি কোনো পুরুষ যদি আমাকে ধর্ষণ করতে যায়, তাহলে তাদের থেকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। কারণ আমি আপনার পুত্রবধূ। ধর্মানুযায়ী আমি আপনার পুত্রের পত্নী। আপনার ভ্রাতা কুবেরের পুত্র আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর। কেবল তাঁরই কারণে আমি এই সকল বিভূষণে বিভূষিতা। আমার প্রতি তাঁর যেমন অনুরাগ, তাঁর প্রতিও রয়েছে আমার প্রগাঢ় প্রেম, তা আর দ্বিতীয় কারও প্রতি নেই।[৪২] কিন্তু রাবণ কামাসক্ত হয়ে জোরপূর্বক রম্ভাকে বলাৎকার করেছিলেন। রম্ভা এ ঘটনা তাঁর প্রেমিক নলকুবেরকে বললে তিনি রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।[৪৩]

নারীর প্রতি বলাৎকার সেই প্রাচীন যুগ হতে চলে আসছে। রাক্ষসরাজ রাবণ শুধু রম্ভাকে বলাৎকার করেননি। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে অনেক সুন্দরী নারীকে তার প্রাসাদের অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখেছিলেন।

দণ্ডরাজ কর্তৃক শুক্রাচার্যতনয়া অরজার বলাৎকার

ইক্ষ্বাক্ষুপুত্র রাজা দণ্ড ছিলেন শুক্রাচার্যের শিষ্য। তিনি একদিন শুক্রাচার্যের আশ্রমে বেড়াতে যান। আশ্রমে তখন শুক্রাচার্য ছিলেন না। রাজা দণ্ড এক অপরূপ সুন্দরীকে আশ্রমের বনপ্রান্তে বিচরণ করতে দেখেন। তাকে দেখে রাজা কামবাণে বিদ্ধ হন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, সুন্দরী কন্যাটি তাঁর গুরুকন্যা। তাঁর নাম অরজা। গুরুকন্যা জেনেও দণ্ডরাজ অরজাকে বলেন: তোমাকে দর্শন করার পর থেকে আমি কামবাণে পীড়িত।[৪৪] তখন অরজা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন: রাজন্, আমাকে আপনি বলপূর্বক স্পর্শ করবেন না। আমি কুমারী। পিতার অধীনস্থা। আমার মহাত্মা পিতার শিষ্য আপনি। মহান তপস্বী তিনি। আমার পিতা কুপিত হয়ে আপনাকে অভিসম্পাত করলে আপনি মহাবিপদে পড়বেন। আমাতে আপনার একান্ত অভিলাষ থাকলে, ধর্মসঙ্গত পথে আমার পিতার কাছে আপনি আমাকে প্রার্থনা করুন।[৪৫] কিন্তু দণ্ডরাজ নিজেকে সংযত না রেখে অরজাকে বলাৎকার করেন। শুক্রাচার্য আশ্রমে ফিরে এসে তাঁর কন্যার অত্যাচারের কাহিনি শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা দণ্ডকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। শুক্রাচার্যের অভিশাপে সপরিবার রাজা দণ্ডের ও তাঁর রাজ্যের বিনাশ হয়েছিল।

বহুপত্নীকতা

সে সময় সমাজে বহুপত্নীকতা বিদ্যমান ছিল। রাজা কুশনাভ তাঁর শত কন্যাদের ব্রহ্মদত্তকে সানন্দে সম্প্রদান করেন।[৪৬] রাজা দশরথের তিনজন প্রধানা রাণী ছিলেন।[৪৭] বনগমনের সময় রামচন্দ্র সাড়ে তিনশত মাতৃসম দশরথপত্নীদের দেখে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।[৪৮] রামচন্দ্রের বনগমনকালে দশরথের ব্রতচারিণী সাড়ে তিনশ' রাণীর কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়েছিল।[৪৯] রাক্ষসরাজ রাবণের হাজার জন পত্নী ছিল।[৫০] মারীচের মুখ থেকে একথা জানা যায়। বানররাজ বালীরও বহু পত্নী ছিল।[৫১] বালীর মৃত্যুর পর তারার বিলাপ থেকে একথা জানা যায়।

একপত্নীব্রত

সমাজে বহুপত্নীকতা বিদ্যমান থাকলেও সে সময় একপত্নীকতাকে সম্মানের চোখে দেখা হতো। একটি মাত্র বিবাহ তপস্যার মহিমায় মহিমান্বিত ছিল। একাধিক বিবাহ বংশরক্ষার জন্য অনুমোদিত হলেও একপত্নীব্রত ছিল স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়।[৫২] রাজা দশরথ বহুবিবাহ করেছিলেন। বংশরক্ষার জন্য বহুবিবাহ অনুমোদিত থাকলেও তা সমাজে নন্দিত ছিল না। রাজা দশরথের দুর্দশার কারণও বহুবিবাহ। কিন্তু রাজা দশরথ বহু বিবাহ করলেও তাঁর পুত্রগণ রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন একপত্নীব্রতই পালন করেন।

বিধর্মীর দ্বারা জোর করে সতী নারীকে বিবাহ

বিধর্মীর দ্বারা জোর করে সতী নারীকে বিবাহের ঘটনা সে যুগে ছিল। কিন্তু জোর করে বিবাহ করলেও বিধর্মীর পতিত্ব স্বীকৃত হতো না। রামের দ্বারা বাণবিদ্ধ বালী রামচন্দ্রকে দুঃখ করে বলেছেন: চরিত্রবতী নারীকে বিধর্মী বিবাহ করলে সেই নারী যেমন নাথবতী হন না; তেমনি হে কাকুৎস্থ, ক্ষাত্রধর্মবিরোধী তোমার দ্বারা পৃথিবীও সনাথা হলো না।[৫৩]

মূলত রামায়ণের যুগে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল দৃঢ়। কিন্তু সেই দৃঢ়তা ছিল নারীর ওপর নির্ভরশীল। নারীকেই বেশি দিতে হয়েছে। যাকে বলা যায় আত্মবলিও। নারীরা ছিল সেবাপরায়ণ। পুরুষের তুলনায় সমাজে নারীর অবস্থান ছিল পশ্চাৎপদ ও অবদমিত। সমাজে নারীর এই অবহেলা-অবদমন

কিংবা অপমান এতটাই স্বাভাবিক ছিল যে, কেউ তার প্রতিবাদের কথা চিন্তা করেনি। রাম-সীতা ছিলেন আদর্শ স্বামী-স্ত্রী। তাঁরা অভিন্ন আত্মা। অথচ লঙ্কায় যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতের বাণে লক্ষ্মণ অচেতন হলে রামচন্দ্র বলেছেন: খোঁজ করলে মর্ত্যলোকে সীতার মতো নারী মিলবে। কিন্তু লক্ষ্মণের মতো যুদ্ধনিপুণ, সচিব ভ্রাতা তো কখনও মিলবে না।[৫৪] রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্ছা গেলে রামচন্দ্র বিলাপ করে একই কথা বলেছেন: দেশে দেশে পত্নী পাওয়া যায়, বন্ধুও মেলে। কিন্তু সহোদর ভাই মেলে এমন দেশ তো দেখা যায় না।[৫৫] রামচন্দ্রের এই উক্তিতে তাঁর পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ও স্ত্রীর প্রতি গুরুত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ সেই কতকাল আগের সমাজের দর্পণ। কিন্তু আজও সেই পুরুষতন্ত্রের অবসান হয়েছে কি? এতকাল পেরিয়ে এই আধুনিক যুগে সমাজে নারীর অবস্থান কতটা উন্নত হয়েছে সেই প্রশ্ন জাগে মনে।

তথ্যসূত্র :

১. ভর্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিষ্যতে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৫/৮

২. নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯/২৯

৩. পুত্রেণ মম কিং কার্যং রাজ্যেনাপি কিমাত্মনা।
কপিসিংহে মহাভাগে তস্মিন্ ভর্তরি নশ্যতি ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৯/১৮

৪. তাবিমৌ শোকসন্তপ্তৌ শনৈঃ প্রেরয় ভামিনি।
ত্বয়া পরিগৃহীতেঽয়মঙ্গদঃ শাস্তু মেদিনীম্ ॥
সন্ততিশ্চ যথা দৃষ্টা কৃত্যং যচ্চাপি সাম্প্রতম্ ।
রাজ্ঞস্তৎক্রিয়তাং সর্বমেষ কালস্য নিশ্চয়ঃ ॥
সংস্কার্যো হরিরাজস্তু অঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্ ।
সিংহাসনগতং পুত্রং পশ্যন্তী শান্তিমেষ্যসি ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২১/৯-১১

৫. অঙ্গদপ্রতিরূপাণাং পুত্রাণামেকতঃ শতম্ ।
হতস্যাপ্যস্য বীরস্য গাত্রসংশ্লেষণং বরম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড,২১/১৩

৬. সাধ্বীনাং ভূস্থিতানাং তু শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯/২৪

৭. মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ ॥

সাহমেবং গতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্মপরা বরা।
আর্যে কিমবমন্যেয়ং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দৈবতম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯/৩০-৩১

৮. নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা যদি বাশুভঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ
দুঃশীলঃ কামবৃত্তো ব ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ ॥
নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিমৃশন্ত্যহম্ ।
সর্বত্র যোগ্যং বৈদেহি তপঃ কৃতমিবাব্যয়ম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৭/২৩-২৫

৯. বিদিতং তু মমাপ্যেতদ্ যথা নার্যাঃ পতির্গুরুঃ ॥
যদ্যপ্যেষ ভবেদ্ ভর্তা অনার্যো বৃত্তিবর্জিতঃ।
অদ্বৈধমত্র বর্তব্যং তথাপ্যেষ ময়া ভবেৎ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৮/২-৩

১০. ভর্তুঃ পুনঃ পরিত্যাগো নৃশংসঃ কেবলং স্ত্রিয়াঃ।
স ভবত্যা ন কর্তব্যো মনসাপি বিগর্হিতঃ ॥
জীবন্ত্যা হি স্ত্রিয়া ভর্তা দৈবতং প্রভুরেব চ।
ভবত্যা মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ২৪/১২, ২১

১১. ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্নির্গুণোঽপি বা।
ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬২/৮

১২. ইহ লোকে চ পিতৃভির্যা স্ত্রী যস্য মহাবল।
অদ্ভির্দত্তা স্বধর্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ২৯/১৮

১৩. ভর্তুর্ভাগ্যন্তু নার্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭/৫

১৪. ন পিতা নাত্মজো বাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭/ ৬

১৫. গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে ॥অযোধ্যাকাণ্ড, ৬১/২৪

১৬. সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ।
প্রধর্ষণমবাপ্নোতি শক্রেণাপি সমো ভুবি ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৮/৩৫

১৭. কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্।
ন জ্ঞায়তে চ কঃ কন্যাং বরয়েদিতি কন্যকে ॥
মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব চ দীয়তে।
কুলত্রয়ং সদা কন্যাং সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি ॥ উত্তরকাণ্ড, ৯/৯-১০

১৮. ভর্তারমনয়া সার্দ্ধমস্যাঃ প্রাপ্তোঽস্মি মার্গিতুম্ ।
কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥

কন্যা হি দ্বে কুলে নিত্যং সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি।
পুত্রদ্বয়ং মমাপ্যস্যাং ভার্যায়াং সম্বভূব হ ॥ উত্তরকাণ্ড, ১২/১১-১২

১৯. যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাঽপ্রজস্য বৈ।
প্রণষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১৮/৫১

২০. পরিশুশ্রূষণান্নার্যাস্তপো নান্যদ্ বিধীয়তে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৮/৯

২১. ন মাং প্রার্থয়িতুং যুক্তস্ত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ।
অকার্যং ন ময়া কার্যমেকপত্ন্যা বিগর্হিতম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ২১/৪

২২. অসত্যঃ সর্বলোকেঽস্মিন্ সততং সৎকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্তারং নাভিমন্যন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ ॥
এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্ ।
অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি ॥
অসত্যশীলা বিকৃতা দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা।
অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ক্ষণমাত্রবিরাগিণঃ ॥
ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ।
স্ত্রীণাং গৃহ্নাতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়া হি তাঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯/২০-২৩

২৩. বাক্যমপ্রতিরূপং তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি।
স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে ॥
বিমুক্তধর্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৫/২৯-৩০

২৪. ইষ্ট্বা সংগ্রামযজ্ঞেন রামপ্রহরণাহুসা।
তস্মিন্নবভৃথে স্নাতঃ কথং পত্ন্যা ময়া বিনা ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৩/২৭

২৫. ভর্তা নাম পরং নার্যাঃ শোভনং ভূষণাদপি।
এষা হি রহিতা তেন শোভনার্হা ন শোভতে ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১৬/২৬

২৬. ন হি মম হরিরাজসংশ্রয়াৎ ক্ষমতরমস্তি পরত্র চেহ বা।
অভিমুখহতবীরসেবিতং শয়নমিদং মম সেবিতুং ক্ষমম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২১/১৬

২৭. ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্মম।
পরিষ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥ উত্তরকাণ্ড, ১৭/১৫

২৮. সশরীরা গতা স্বর্গং ভর্তারমনুবর্তিনী।
কৌশিকী পরমোদারা প্রবৃত্তা চ মহানদী ॥
সা তু সত্যবতী পুণ্যা সত্যে ধর্মে প্রতিষ্ঠাতা।
পতিব্রতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাং বরা ॥ আদিকাণ্ড, ৩৪/৮, ১১

২৯. ধন-ধান্যসমৃদ্ধাপি বিধবেত্যুচ্যতে জনৈঃ।

স্বগাত্রপ্রভবে বীর শেষে রুধিরমণ্ডলে ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৩/১৩

৩০. বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্ । আদিকাণ্ড, ৫/১২

৩১. প্রমদাজনসম্বাধং প্রজল্পিতমহাপথম্ । যুদ্ধকাণ্ড, ১০/৫

৩২. ঋষিপন্নগকন্যাশ্চ রাজর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ।
ক্রীড়ন্ত্যোঽপ্সরসশ্চৈব তং দেশমুপপেদিরে ॥
সর্বর্তুষূপভোগ্যত্বাদ্ রম্যত্বাৎ কাননস্য চ।
নিত্যশস্তাস্তু তং দেশং গত্বা ক্রীড়ন্তি কন্যকাঃ ॥
দেশস্য রমণীয়ত্বাৎ পুলস্ত্যো যত্র স দ্বিজঃ।
গায়ন্ত্যো বাদয়ন্ত্যশ্চ লাসয়ন্ত্যস্তথৈব চ ॥ উত্তরকাণ্ড, ২/৯-১১

৩৩. সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ। অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭/১২
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতুর্গৃহে তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭/২২

৩৪. দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে।
দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্ ॥
নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো।
পশ্যেষ্টদার দারাংস্তে ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনান্ ॥
বহির্নিষ্পতিতান্ সর্বান্ কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি।
অয়ং ক্রীড়াসহায়স্তেঽনাথো লালপ্যতে জনঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১১/৬১-৬৩

৩৫. যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি।
তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৩/৮

৩৬. ব্যসনেষু চ কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়াঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪/২৮

৩৭. কম্বলানাঞ্চ মুখ্যানাং ক্ষৌম্যান্ কোট্যম্বরাণি চ।
হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতং দিব্যরূপং স্বলঙ্কৃতম্ ॥
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্।
হিরণস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ ॥ আদিকাণ্ড, ৭৪/৪-৫

৩৮. গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাঞ্চ শতং পরম্ ।
সকুন্তলাঃ শুভাচারা ভার্যাঃ কন্যাস্তু ষোড়শ ॥
হেমবর্ণাঃ সুনাসোরূঃ শশিসৌম্যাননাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সর্বাভরণসম্পন্নাঃ সম্পন্নাঃ কুলজাতিভিঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১২৫/৪৪-৪৫

৩৯. লতাঃ সমনুবর্তন্তে মত্তা ইব বরস্ত্রিয়ঃ। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১/৮৫

৪০. এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামা সৃষ্টে রঘুনন্দন।
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ ॥

শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা।
গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্রমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১৩/৫-৬

৪১. পরদারাভিমর্শাত্তু নান্যৎ পাপতরং মহৎ। অরণ্যকাণ্ড, ৩৮/৩০

৪২. এবমুক্তাব্রবীদ্ রম্ভা বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রসীদ নার্হসে বক্তুমীদৃশং ত্বং হি মে গুরুঃ ॥
অন্যেভ্যোঽপি ত্বয়া রক্ষ্যা প্রাপ্নুয়াং ধর্ষণং যদি।
তদ্ধর্মতঃ সুষা ত্বেহং তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥
তমুদ্দিশ্য তু মে সর্বং বিভূষণমিদং কৃতম্ ।
যথা তস্য হি নান্যস্য ভাবো মাং প্রতি তিষ্ঠতি ॥ উত্তরকাণ্ড, ২৬/২৮-২৯, ৩৫

৪৩. তস্মাৎ স যুবতীমন্যাং নাকামামুপযাস্যতি।
যদা হ্যকামাং কামার্তো ধর্ষয়িস্যতি যোষিতম্ ॥
মূর্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা ।
তস্মিন্নুদাহৃতে শাপে জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভে ॥ (উত্তরকাণ্ড, ২৬/৫৫-৫৬)

৪৪. তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য মোহোন্মত্তস্য কামিনঃ।
ভার্গবী প্রত্যুবাচেদং বচঃ সানুনয়ং ত্বিদম্ ॥ উত্তর.৮০/৭

৪৫. ব্যসনং সুমহৎ ক্রুদ্ধঃ স তে দদ্যান্মহাতপাঃ।
যদি বান্যন্ময়া কার্যং ধর্মদৃষ্টেন সৎপথা ॥
বরয়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহাদ্যুতিম্ ।
অন্যথা তু ফলং তুভ্যং ভবেদ্ ঘোরাভিসংহিতম্ ॥ উত্তরকাণ্ড, ৮০/১০-১১

৪৬. স বুদ্ধিং কৃতবান্ রাজা কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ।
ব্রহ্মদত্তায় কাকুৎস্থং দাতুং কন্যাশতং তদা ॥
তমাহূয় মহাতেজা ব্রহ্মদত্তং মহীপতিঃ।
দদৌ কন্যাশতং রাজা সুপ্রীতেনান্তরাত্মা ॥ আদিকাণ্ড, ৩৩/২০-২১

৪৭. অস্য ভার্যাসু তিসৃষু হ্রী-শ্রী-কীর্ত্যুপমাসু চ ॥ আদিকাণ্ড, ১৫/২০

৪৮. ত্রয়ঃ শতশতার্ধা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯/৩৬

৪৯. অর্ধসপ্তশতাস্ত্রত্র প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ।
কৌসল্যাং পরিবার্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/১৩

৫০. প্রমদানাং সহস্রাণি তব রাজন্ পরিগ্রহে ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৩৮/৩০

৫১. ইমাঃ পশ্য বরা বহ্ব্যো ভার্যাস্তে বানরেশ্বর ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২০/২২

৫২. যা গতিঃ সর্বভূতানাং স্বাধ্যায়াত্তপসশ্চ যা।
ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ ॥

৫৩. ত্বয়া নাথেন কাকুৎস্থ ন সনাথা বসুন্ধরা ।
প্রমদা শীলসম্পূর্ণা পত্যেব চ বিধর্মণা ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/৪২

৫৪. শক্যা সীতাসমা নারী মর্ত্যলোকে বিচিন্বতা।
ন লক্ষ্মণসমো ভ্রাতা সচিবঃ সাম্পরায়িকঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৪৯/৬

৫৫. দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০১/১৫

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক সম্পর্ক

পারিবারিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে একটি সুন্দর পরিবার এবং এক একটি পরিবারের সুষ্ঠু বন্ধনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে বৃহৎ সমাজ। পরিবারে আছে নানা ধরণের সম্পর্ক। কেমন ছিল রামায়ণের যুগের পরিবার, তাই এখানে আলোচ্য।

জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রতি পিতৃস্নেহ এবং কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের তারতম্য

পিতার নিকট জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং মাতার নিকট কনিষ্ঠ সন্তান অত্যন্ত প্রিয়। আদিকাণ্ডের একষট্টি সর্গে বর্ণিত শুনঃশেফের কাহিনিতে এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে। ঋষি ঋচীক পুত্রদের ও পত্নীকে নিয়ে ভৃগুতুঙ্গ পর্বতে থাকতেন। রাজা অম্বরীষ যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য একজন মানুষের খোঁজে বহু দেশ, জনপদ, নগর, অরণ্য এবং পবিত্র আশ্রম ঘুরে ঘুরে এসেছেন ভৃগুতুঙ্গ পর্বতে। সেখানে তিনি ঋষি ঋচীককে সপরিবারে দেখে প্রণাম করে বললেন: হে ভৃগুবংশধর মহাত্মন্, শত সহস্র অর্থাৎ এক লক্ষ গাভীর বিনিময়ে যজ্ঞীয় পশুরূপে আপনি যদি আপনার পুত্রকে আমার নিকট বিক্রয় করেন, তাহলে আমি কৃতার্থ হব। মহারাজের কথা শুনে ঋচীক বললেন: দেখুন, জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমি কোনোভাবেই বিক্রয় করব না। তখন ঋচীকের স্ত্রী বললেন: কনিষ্ঠ পুত্র শুনক আমার অতি প্রিয়। তাই কোনো অবস্থাতেই কনিষ্ঠ পুত্রকে আমি দেব না। মা-বাবা উভয়ের কথা শুনতে পেলেন মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ। তখন শুনঃশেফ নিজেই বললেন: পিতা জ্যেষ্ঠকে এবং মাতা কনিষ্ঠকে বিক্রয়যোগ্য মনে করেন না। তাই মনে হয়, মধ্যম পুত্রই বিক্রয়যোগ্য। হে রাজপুত্র, আমাকেই আপনি ক্রয় করে নিন। শুনঃশেফের এ কথাগুলি ছিল অনেক অভিমানভরা, অনেক কষ্টের। তার বাবা তাকে রাজা অম্বরীষের হাতে তুলে দিলেন এবং বিনিময়ে পেলেন বহুকোটি সুবর্ণ ও রত্নরাশিসহ একলক্ষ গাভী।[১] এখানে একটি প্রশ্ন জাগে মনে, ঋষি ঋচীকের কাছে সত্যিই কি মধ্যম পুত্রের চেয়ে ধন-সম্পদ বেশি প্রিয় ছিল ?

শুনঃশেফ অনেক অভিমানে, দুঃখে-কষ্টে রাজা অম্বরীষের কাছে বিক্রীত হয়েছিল। জীবনের প্রতি ভালোবাসা সকলের আছে। কে সহজে নিজের আপন জীবনকে যজ্ঞে বলি দিতে চায়? তাই দেখা যায়, পথিমধ্যে পুষ্করতীর্থে শুনঃশেফের জ্যেষ্ঠ মাতুল বিশ্বামিত্রের কাছে বাঁচার জন্য তার আকুল প্রার্থনা।

মাতুলের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বলে: হে মুনিশ্রেষ্ঠ, ধর্মের দ্বারা আপনি আমাকে বাঁচান। আমার মা নেই। বাবা নেই। জ্ঞাতি আর বন্ধুই বা কোথায়? আপনিই আমার রক্ষাকর্তা।[২]

পিতৃ-মাতৃসেবায় স্বর্গলাভ

পিতা-মাতা সাক্ষাৎ গুরু। পিতা-মাতার অনুগত থাকাই ধর্ম। রামচন্দ্র ছিলেন পিতৃমাতৃভক্ত। পিতৃসত্য পালন করার জন্য তিনি হাসিমুখে বনে গমন করেছিলেন। পিতৃমাতৃভক্ত রামচন্দ্র তাই সীতাদেবীকে বলেছেন: পিতা-মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে আমি বাঁচতে চাই না। তাঁরা প্রত্যক্ষ গুরু। তাঁদের অতিক্রম করে অপ্রত্যক্ষ দৈবকে কি আরাধনা করা যায়? পিতৃমাতৃসেবার দ্বারা ভূলোকে ত্রিলোকের ধর্ম-অর্থ-কাম এই পবিত্র ত্রিবর্গ লাভ করা যায়। এর চেয়ে ভালো আর কিছুতেই নেই। সত্য, দান, মান দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞ যা দিতে পারে না, পিতা-মাতার সেবা করলে সেই পরম শান্তি লাভ করা যায়। পিতা-মাতার অনুসরণ করলে স্বর্গ-ধন-ধান্য-বিদ্যা-পুত্র বিবিধ সুখ কোনো কিছুই দুর্লভ নয়। পিতৃমাতৃসেবক মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা দেবলোক, গন্ধর্বলোক, ব্রহ্মলোক এবং অন্যসব সুখকর লোকে গমন করে থাকেন।[৩]

পিতা হলেন দেবতাদের দেবতা

পিতা পরম গুরু। তিনি দেবতাদের দেবতা।[৪] বনগমনকালে রামচন্দ্র তাঁর পিতা দশরথকে এ কথা বলেছিলেন।

পিতা হলেন পুত্রের বন্ধু, মাতা নয়

বানররাজ বালী নিহত হলে হনুমান বালীপত্নীকে অনুরোধ করে বলেছিলেন: অঙ্গদ তোমার আনুগত্যে রাজ্যপালন করুক। তখন সতী তারা বলেছিলেন: হে হনুমন্, অঙ্গদের প্রতি আমার প্রভুত্ববুদ্ধি স্থাপন করা উচিত হবে না। পিতাই হচ্ছেন পুত্রের বন্ধু, মাতা নয়।[৫]

মানুষ বাবাকে নয়, মাকেই অনুকরণ করে

সাধারণত দেখা যায়, বাবার চেয়ে মানুষ মাকেই অনুকরণ করে। অরণ্যবাসের সময় লক্ষ্মণ তাঁর অগ্রজ ভরতের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন: দ্বিপদ মানুষ বাবাকে নয়, মাকেই অনুকরণ করে। এই বিখ্যাত লোকপ্রবাদ ভরত বিপরীত করে দিয়েছেন।[৬]

কনিষ্ঠ ভ্রাতা সর্বদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত থাকবে

ছোট ভাই সব সময় বড় ভাইয়ের বশীভূত থাকবে– এটাই হলো সদাচার। রাম-লক্ষ্মণ বন গমনের সময় সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণকে বলেছেন: বৎস, তোমার দাদা বিপদেই পড়ুক বা ঐশ্বর্যেই থাকুক, সে তোমার আশ্রয়। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বশীভূত হবে, জগতে এটাই হচ্ছে সজ্জনের ধর্ম।[৭]

পারিবারিক সম্পর্কের দিক থেকে দেখা যায়, রামায়ণের যুগে পারিবারিক সম্পর্ক খুব দৃঢ় ছিল।

তথ্যসূত্র:

১. আদিকাণ্ড, ৬১/১৩-২৩ ।

২. আদিকাণ্ড, ৬২/৪-৫।

৩. এষ ধর্মশ্চ সুশ্রোণি পিতুর্মাতুশ্চ বশ্যতা।
আজ্ঞাং চাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥
অস্বাধীনং কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধ্যতে।
স্বাধীনং সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম্ ॥
যত্র ত্রয়ং ত্রয়ো লোকাঃ পবিত্রং তৎসমং ভুবি।
নান্যদস্তি শুভাপাঙ্গে তেনেদমভিরাধ্যতে ॥
ন সত্যং দান-মানৌ বা যজ্ঞো বাপ্যাপ্তদক্ষিণাঃ।
তথা বলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতুর্মতা ॥
স্বর্গো ধনং বা ধান্যং বা বিদ্যাঃ পুত্রাঃ সুখানি চ।
গুরুবৃত্ত্যনুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥
দেব-গন্ধর্ব-গোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথাপরান্ ।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ ॥
স মাং পিতা যথা শাস্তি সত্যধর্মপথে স্থিতঃ।
তথা বর্তিতুমিচ্ছামি স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০/৩২-৩৮

৪. পিতা হি দৈবতং তাত দেবতানামপি স্মৃতম্ । অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/৫২

৫. ন হ্যেষা বুদ্ধিরাস্থেয়া হনুমন্নঙ্গদং প্রতি।
পিতা হি বন্ধুঃ পুত্রস্য ন মাতা হরিসত্তম ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২১/১৫

৬. ন পিত্র্যমনুবর্তন্তে মাতৃকং দ্বিপদা ইতি।
খ্যাতো লোকপ্রবাদোঽয়ং ভরতেনান্যথা কৃতঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১৬/৩৪

৭. ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০/৬

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা

একজন মানুষ, একটি সমাজ, একটি জাতি তথা একটি রাষ্ট্র কতটা সুশৃঙ্খল এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। রামায়ণের যুগে শিক্ষার চর্চা বা শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল তা আলোচনীয়।

বেদ ও বেদাঙ্গ চর্চা

গৃহীর নিত্য বেদপাঠ অবশ্য করণীয়। অযোধ্যার ব্রাহ্মণেরা ছয় বেদাঙ্গসহ বেদবিদ্যায় নিষ্ণাত ছিলেন।[১] রাজা দশরথ ছিলেন বেদজ্ঞ।[২] তাঁর চারপুত্রও বেদজ্ঞ ছিলেন।[৩] অযোধ্যা কাণ্ডে রামচন্দ্রকে বলা হয়েছে 'সাঙ্গবেদবিৎ'। অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষসহ ছয়টি বেদাঙ্গ সমস্ত বেদবিদ্যায় রামচন্দ্র ছিলেন পারদর্শী। বেদজ্ঞরা তাঁকে যথোচিত সম্মান দিয়েছেন।[৪]

পরশুরাম এবং তাঁর বংশের সকলে বেদবিদ্যায় অধিকারী ছিলেন। রাজা দশরথ পরশুরামকে বলেছেন: আপনার বংশধরেরা সবাই স্বাধ্যায়বান।[৫] প্রত্যহ বেদপাঠকে বলা হয় স্বাধ্যায়। যিনি প্রত্যহ বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন, তিনি স্বাধ্যায়বান। রাজা দশরথ কর্তৃক আয়োজিত অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রত্যেক পুরোহিত ছিলেন বেদ-বেদাঙ্গে পণ্ডিত।[৬] হনুমান ছিলেন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণবেশী হনুমান রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রথম আলাপে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছিলেন। তাঁর সারগর্ভ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ মধুরবাক্যে মুগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছিলেন: ঋগ্বেদে যিনি শিক্ষিত নন, যজুর্বেদ যিনি অধিগত করেননি, সামবেদে যিনি বিদ্বান নন, তিনি কখনো এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলতে পারেন না।[৭]

লঙ্কাতেও বেদবিদ্যার চর্চা হতো। রাবণ ছিলেন বেদবিদ্যায় পণ্ডিত। রাবণ ব্রাহ্মণবেশে সীতাকে হরণ করার উদ্দেশ্যে সীতার সামনে উপস্থিত হয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।[৮] হনুমান যখন লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি দেখেছিলেন, রাক্ষসেরা গৃহে মন্ত্র জপ ও বেদ অধ্যয়ন করছে।[৯] অশোকবনে বসে হনুমান রাত্রিশেষে রাক্ষস-ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। বেদের ছয়টি অঙ্গেই তাঁরা ছিলেন বিদ্বান। যজ্ঞ-সম্পাদনে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক।[১০]

বেদজ্ঞানে সব সংশয় বিনষ্ট হয়

বালীকে বাণবিদ্ধ করার পর বালী রামচন্দ্রকে তিরস্কার করে বলেছেন: পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মে বেদজ্ঞানের দ্বারা যার সব সংশয় বিনষ্ট হয়ে গেছে এমন কোন ব্যক্তি ধার্মিকের ছদ্মবেশে এরূপ নিষ্ঠুর কর্ম সম্পাদন করতে পারে ?

বেদধ্বনি অমঙ্গল শক্তিকে বিনষ্ট করে

ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে যখন উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করেন, সেই বেদধ্বনির উচ্চারণে রাক্ষসেরা দুর্বল হয়ে যায়। সূর্য উঠলে মেঘ যেমন পালিয়ে যায়, তেমনি বেদধ্বনি শুনে তারাও সবদিকে পালিয়ে যায়।[১১]

সংস্কৃত ছিল শিক্ষিত মানুষের কথ্যভাষা

ব্রাহ্মণবেশী হনুমান রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রথম আলাপে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছিলেন। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ মধুর বাক্যে রামচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মণকে বলেছিলেন: সমগ্র ব্যাকরণ নিশ্চয়ই ইনি বহুভাবে পড়েছেন। বহু কথা বললেন, তবুও একটা অপশব্দ ব্যবহার করেননি। ইনি যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর চোখে মুখে ললাটে ভ্রূযুগলে এমন কি অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো বিকৃতি দেখা যায়নি। তাঁর বাক্যে বাড়িয়ে বলা কিছু নেই। অর্থে কোথাও সন্দেহ নেই। টেনে টেনে কথা বলেননি। উচ্চারণে আড়ষ্টভাব কোথাও নেই। বক্ষ এবং কণ্ঠ থেকে মধ্যমস্বরে ইনি বাক্য বলেছেন। ইনি যে কল্যাণকর বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তাতে রয়েছে ব্যাকরণের সংস্কার। পদবিন্যাসে ক্রম সুরক্ষিত হয়েছে। অশোভন ভাবে টেনে টেনে না বলে যথাযথভাবে উচ্চারণ করেছেন শব্দরাজি। এঁর বাক্য হৃদয়ে অদ্ভুত আনন্দ দিয়েছে। হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্ধা ঐ তিনস্থানেই উচ্চারিত এই সুন্দর বাক্যে কার চিত্তই না প্রসন্ন হয় ? [১২] অশোকবনে সন্তপ্তা সীতার সঙ্গে হনুমান কোন ভাষায় কথা বলে তাঁকে আশ্বস্ত করবেন, তা নিয়ে গভীরভাবে ভেবে বলেছেন: বিশেষত অতি ক্ষুদ্রকায় বানর আমি। তথাপি এখন ব্যাকরণাদির দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলব।[১৩] তখন যে সভ্য মানুষেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন, তার প্রমাণ এই শ্লোক। রাক্ষস হলেও রাবণ সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন, তাই তিনি সংস্কৃত ভাষায় কথা

বলতেন। হনুমানও ভেবেছেন– দ্বিজাতির মতো সংস্কৃতেই যদি আমি কথা বলি, তাহলে আমাকে রাবণ মনে করে সীতা ভীতা হয়ে পড়বেন।[১৪]

গুরু পরম শ্রদ্ধেয়

ঋষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের অস্ত্রগুরু। আদিকাণ্ডেই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। রাম-লক্ষ্মণের বয়স তখন পনের বছরের কোঠায়,ষোল বছরের নীচে (ঊনষোড়শবর্ষ)। বিশ্বামিত্র এসেছেন অযোধ্যার রাজসভায়। রাজা দশরথ সুশোভন বাক্যে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন: যেমন অমৃত-প্রাপ্তি, জলহীন দেশে বর্ষণ, যেমন শাস্ত্রসম্মত যোগ্য পত্নীতে অপুত্রকদের পুত্র জন্ম, হে মহর্ষি, সেরকম মনে হচ্ছে আপনার আগমন। হে মহামুনি, আপনাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আনন্দের সঙ্গে আপনার কোন কাজ সম্পাদন করব? [১৫] এখানে অযোধ্যাপতি দশরথের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে বিদ্বান, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্কে সমাদৃত হয়ে প্রসন্ন মনে বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করেছেন।– আমি একটি কথা ভেবে এখানে এসেছি। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আপনি সেই কাজ করবেন, আমায় কথা দিন। হে নরশ্রেষ্ঠ, আমি একটি ব্রতপালনে উদ্যোগী হয়েছি। মায়াবী দুটি রাক্ষস সেখানে বিঘ্ন উৎপাদন করছে। ব্রতের অঙ্গীভূত যজ্ঞ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় শক্তিশালী, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ মারীচ এবং সুবাহু মাংস এবং রক্ত প্রভূতভাবে সেখানে বর্ষণ করছে। যজ্ঞ এইভাবে বিনষ্ট হওয়ায় আমার শ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। তাই নিরুৎসাহ হয়ে দেশ থেকে চলে এসেছি। হে রাজন্, তাদের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করতে কিন্তু আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। আমাদের ব্রতাচরণ এইভাবে বিপর্যস্ত হলেও যজ্ঞকাল বলে শাপ দেওয়া চলে না। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আপনার সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী, সুন্দর কেশধারী বীর, জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে আমায় দিন। আমি তাকে রক্ষা করব। যে রাক্ষসেরা অন্যায় করেছে, নিজের তেজোবীর্যে সে তাদের বিনাশ করতে পারবে। নানাভাবে তার কল্যাণসাধন আমি নিশ্চয়ই করব।[১৬] কিন্তু রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠাতে সম্মত হলেন না। তিনি নিজেই তার অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার্থে যেতে চাইলেন। বিশ্বামিত্র তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: "তার প্রয়োজন নেই মহারাজ। আমার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন নিজেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছেন। রঘুবংশের নামে কলঙ্ক দিয়ে মিথ্যাবাদী হয়ে আপনি বন্ধুদের নিয়ে সুখে থাকুন। আমি চলে যাচ্ছি।"[১৭] বিশ্বামিত্রের ক্রোধে পৃথিবী

কাঁপতে লাগল। দেবগণও ভীত হলেন। নিদারুণ আশঙ্কায় জগৎসংসার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মূলত বিশ্বামিত্র ছিলেন সত্যের পূজারী। তাই রাজা দশরথের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করাকে তিনি মানতে পারেননি। বিশ্বামিত্র সম্পর্কে ঋষি বসিষ্ঠ তাই রাজা দশরথকে বলেছেন: এঁর দেহে ধর্মই যেন মূর্ত হয়েছে। ইনি বীরমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জগতে ইনি বিদ্বানরূপে পরিচিত। ইনি তপস্বী। ঋষি বিশ্বামিত্র বীর্যবান, মহাযশস্বী, মহাতেজস্বী। মহারাজ, রামের গমন নিয়ে আপনি কোনো সংশয় করবেন না। কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নিজেই তাদের নিগ্রহে সমর্থ। কেবল আপনার পুত্রের কল্যাণের জন্য আপনার কাছে এসে তিনি প্রার্থনা করেছেন।[১৮]

ঋষি বসিষ্ঠের কথায় আশ্বস্ত হয়ে রাজা দশরথ রাম-লক্ষ্মণকে পাঠালেন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে। রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গমন করলেন। বিশ্বামিত্র অগ্রে চলতে লাগলেন। পশ্চাতে রাম-লক্ষ্মণ। গুরু শিষ্যকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। সরযূর দক্ষিণে সার্ধযোজন পথ অতিক্রম করে বিশ্বামিত্র বললেন– 'বৎস রাম, শীঘ্র এই সরযূর জলে আচমন করে এস। তোমাকে মন্ত্র দেব।' বিশ্বামিত্রের জীবনের সকল তপস্যাস্বরূপ বলা ও অতিবলা মন্ত্র তিনি রামচন্দ্রকে দান করলেন। এই মন্ত্রবলে শ্রম-জরা-ক্ষুধা-তৃষ্ণা কখনও পীড়িত করে না। বিশ্বামিত্র জানতেন, শৌর্যে-বীর্যে-জ্ঞানে-দাক্ষিণ্যে-কর্মদক্ষতায়-বিচারে-বাগ্মিতায় রামচন্দ্রের তুল্য কেউ হবে না। রামচন্দ্রই এই মন্ত্রের উপযুক্ত আধার। তাই বিশ্বামিত্র প্রফুল্লমুখে রামচন্দ্রকে বললেন: তপস্যার দ্বারা আমি এই দুটি বিদ্যা অর্জন করেছি। তোমার দ্বারা এর প্রভাব প্রসারিত হবে।[১৯] তখন সানন্দচিত্তে জল স্পর্শ করে রামচন্দ্র পবিত্র হলেন।

গুরুর অর্জিত বিদ্যা যখন শিষ্যের মধ্যে প্রসারিত হয়, তখন সে জ্ঞানদান সার্থক হয়। বিশ্বামিত্রের কাছে বিদ্যালাভের পর রামচন্দ্রকে দেখাচ্ছিল শরৎকালের সূর্যের মতো ভাস্বর। তিনি গুরুর প্রতি সব করণীয় কাজ সম্পাদন করলেন। সুখের রাজশয্যায় যাদের শয়নের অভ্যাস, অযোধ্যার সেই দুই রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণ অনভ্যস্ত তৃণশয্যায় সুখেই শয়ন করল। বিশ্বামিত্র শুধু তাদের মন্ত্রদীক্ষা দেননি, দিয়েছেন কষ্টসহিষ্ণুতার তপস্যাও। প্রকৃতপক্ষে সে সময় গুরু তাঁর শিষ্যদের শারীরিক, নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশসাধনের দিকে গুরুত্ব দিতেন। গুরুর শিক্ষাপদ্ধতি শিষ্যের মানসিক বিকাশ ও মনুষ্যত্বলাভে সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল।

অযোধ্যার রাজপরিবারের কুলগুরু ছিলেন ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ। তিনি ছিলেন রাজপুরোহিত, প্রধানমন্ত্রীও। রাজা দশরথের গুরুও তিনি। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রণা না করে রাজা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। রাজকুমারদের বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনায় গুরু বসিষ্ঠের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ গুরুর অবস্থান সম্পর্কে রামচন্দ্রকে বলেছেন– হে রাঘব, জন্মাবার পর মানুষের গুরু হন তিনজন। হে কাকুৎস্থ, তাঁরা হলেন আচার্য, মাতা ও পিতা। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, পিতা জন্মদান করেন। আচার্য তাকে প্রজ্ঞাদান করেন। এজন্য তাঁকে গুরু বলা হয়।[২০]

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক অনেক গভীর ও আত্মিক ছিল। শিষ্য তাঁর বিদ্যাদাতা গুরুকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। আবার গুরুর কাছে শিষ্য ছিল তাঁর নিজ পুত্রতুল্য। গুরু শিষ্যকে ব্যক্তিগত পবিত্রতার আচার, সুর্যোপাসনা ও দৈনন্দিন ধর্মপালনের শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁর অর্জিত সমুদয় জ্ঞান নিঃশেষে শিষ্যকে দান করতেন। জন্মদাতা, বিদ্যাদাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা এ তিনজনকেই পিতা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে– যাঁরা ধর্মকে লালন করে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলেন, তাঁদের কাছে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, জন্মদাতা ও বিদ্যাদাতা এ তিনজনই পিতা। তাই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছোটভাই, ঔরসজাতপুত্র ও গুণী শিষ্যকে পুত্রের মতো মনে করেন।[২১] মুমূর্ষু বালীকে রামচন্দ্র উপদেশচ্ছলে এ কথাগুলি বলেছেন।

লৌকিক সদাচার ছিল পরম্পরাগতভাবে আচার্যদের দ্বারা অনুসৃত

ধর্মযুক্ত, অর্থসম্পন্ন, গুণঋদ্ধ অর্থ, কাম এবং লৌকিক সদাচার পরম্পরাগতভাবে আচার্যদের কাছ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত ছিল। বালীকে বাণবিদ্ধ করার পর বালীর দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে রামচন্দ্র তাঁকে বলেছেন– তাঁর প্রতি তিনি যে দণ্ডবিধান করেছেন, তা পরম্পরাগত আচার্যদের কাছ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত ও শাস্ত্রানুমোদিত।[২২]

বিদ্যাসমাপনী ব্রত

বিদ্যা সমাপনান্তে অর্জিত বিদ্যাকে রক্ষার জন্য ব্রতপালন করতে হতো।[২৩] প্রত্যক্ষভাবে সমাবর্তন শব্দটি এখানে নেই। অনুমিত হয়, বিদ্যা সমাপনান্তে এটি সমাবর্তন উৎসব।

শাস্ত্রপাঠ ও বৃদ্ধদের সেবা করে জ্ঞান পরিপক্ব হয়

বিভীষণ সম্পর্কে সুগ্রীব অনেক প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। এ সকল মন্তব্য শুনে রামচন্দ্র বলেছেন– বানরাধিপতি সুগ্রীবের উক্তি থেকে বোঝা যায়, শাস্ত্র না পড়ে আর বৃদ্ধদের সেবা না করে এ সকল বলা সম্ভব নয়।[২৪] শাস্ত্র অধ্যয়নে জ্ঞান অর্জন হয় এবং বৃদ্ধদের সেবায় তাঁদের অভিজ্ঞতার জ্ঞান গ্রহণ করা যায়। মূলত এ দুইয়ের সমন্বয় হলে জ্ঞান লাভ পরিপক্ব হয়।

অনধ্যায়

কেনো কোনো তিথিতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বন্ধ থাকত। অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে অনধ্যায় পালন করা হতো। পতি বিরহে কৃশা সীতাদেবীর বর্ণনা করতে গিয়ে হনুমান বলেছেন: প্রতিপদ তিথিতে অধ্যয়নরত বিদ্যার্থীর বিদ্যা যেমন ক্ষীণ হয়ে যায়, তেমনি সীতাদেবীর অবস্থা।[২৫] এখানে অনধ্যায়ে গেছে অমাবস্যা-পূর্ণিমা। প্রতিপদে পাঠ শুরু হচ্ছে। তখন তো পড়া শুরু। তাই পড়া স্বল্পই হয়।

বিতর্কচর্চা

বিতর্কচর্চা হতো সেকালে। অযোধ্যা নগরীর বীর রক্ষিগণ যাদের বাক্যের দ্বারা পরাজিত করা যায়, তাদের বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতেন না।[২৬] রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ চলাকালে যজ্ঞের একটি অংশের সমাপ্তির পর অন্য অংশের আরম্ভের মধ্যবর্তী সময়ে সুবক্তা, বিতার্কিকগণ শাস্ত্রের কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতেন। সাধারণত ধীরস্বভাব ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনায় পরস্পরকে জয় করার ইচ্ছায় নানাবিধ হেতু উল্লেখ করে বিচারে প্রবৃত্ত হতেন।[২৭]

অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিযুক্ত বাক্য

শোনার ইচ্ছা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, ঊহ (তর্ক-বিতর্ক),অপোহ (সিদ্ধান্ত নিশ্চয়),অর্থ বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান হলো বাক্যসংক্রান্ত আট রকমের গুণ। এতদ্‌বিষয়ক বুদ্ধিকে অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি বলে। হনুমান সীতার কাছে গিয়ে রামচন্দ্রের বিজয়লাভের সংবাদ জ্ঞাপন করলে সীতাদেবী হনুমানের বাক্যকে বলেছিলেন, অত্যন্ত সুলক্ষণসম্পন্ন ও মাধুর্যগুণান্বিত। হনুমানের বাক্য ছিল মূলত অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিযুক্ত।[২৮]

ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণকে বেদমন্ত্র দিতেন না

ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অব্রাহ্মণকে বেদমন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারতেন না। লঙ্কায় সীতাদেবী রাবণপ্রযুক্ত রাক্ষসীদের তিরস্কার সহ্য করতে না পেরে বলেছিলেন– ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে বেদমন্ত্র দিতে পারে না, তেমনি আমিও রাবণের অনুগমন করতে পারি না।[২৯]

রাজপুত্রদের সর্বকার্যে দক্ষ হতে হতো

জীবনে যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য রাজকুমারদের সর্বকার্যে পারদর্শী হতে হতো। রাম-লক্ষ্মণ রাজপুত্র হলেও তাঁরা ছিলেন সমস্ত কাজে দক্ষ। বনবাসকালে যমুনা নদী পার হওয়ার জন্য তাঁরা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ভেলা তৈরি করেছিলেন। শুধু ভেলা তৈরি নয়, তাঁরা নৌ চালনায়ও দক্ষ ছিলেন। নিজ হাতে দাঁড় টেনে তাঁরা উত্তাল যমুনা নদী পার হয়েছেন।[৩০] চিত্রকূট পর্বতে লক্ষ্মণ নিজহাতে কাঠ সংগ্রহ করে সুন্দর আচ্ছাদনবিশিষ্ট পর্ণকুটীর তৈরি করেছেন।[৩১] পঞ্চবটীর রমণীয় প্রদেশে লক্ষ্মণ নিজহাতে পর্ণশালা তৈরি করেছেন।[৩২] রাজকুমারদের জীবনচর্যা দেখে মনে হয়, তাঁদের সমস্ত কর্মে দক্ষ হতে হতো। কারণ শিক্ষা না থাকলে এ সকল কাজ বিনা আয়াসে করা সম্ভব নয়।

রাজপরিবারে নারীশিক্ষা

রামায়ণের যুগে নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তবে অভিজাত পরিবারে বিশেষত রাজপরিবারের নারীদের পারিবারিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো। সুন্দরকাণ্ডে হনুমান লঙ্কায় বন্দিনী সীতাকে রামচন্দ্রের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করলে তা দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। অক্ষরজ্ঞান না থাকলে রামচন্দ্রের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক তিনি চিনতে পারতেন না। তাছাড়া তাঁর যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রানুমোদিত কথায় প্রজ্ঞা বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়, তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সীতাদেবী ছিলেন বিদেহরাজকন্যা ও অযোধ্যার রাজবধূ। লঙ্কার রাজপরিবারের কন্যা শূর্পণখার রাষ্ট্রনীতিতে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। লঙ্কারাজ রাবণপত্নী মন্দোদরী ও কিষ্কিন্ধারাজ বালিপত্নী তারারও যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। কিন্তু সাধারণ নারীদের শিক্ষার কোনো পরিচয় রামায়ণে পাওয়া যায় না। সর্বস্তরে শিক্ষার সুব্যবস্থা পরিদৃষ্ট না হলেও সামগ্রিকভাবে রামায়ণে শিক্ষার একটা সুন্দর বাতাবরণ পরিলক্ষিত।

তথ্যসূত্র :

১. তামগ্নিমদ্ভির্গুণবদ্ভিরাবৃতাং দ্বিজোত্তমৈর্বেদ-ষড়ঙ্গপারগৈঃ। আদিকাণ্ড, ৫/২৩

২. তস্যাং পূর্যামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ।
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৬/১

৩. সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১৮/২৫

Dhaka University Institutional Repository

৪. সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ। অযোধ্যাকাণ্ড, ১/২০
যজুর্বেদবিনীতশ্চ বেদবিদ্ভিঃ সুপূজিতঃ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৩৫/১৪

৫. ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্বাধ্যায়ব্রতশালিনাম্ ।
সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শাস্ত্রং প্রক্ষিপ্তাবানসি ॥ আদিকাণ্ড, ৭৫/৭

৬. নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীন্নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ।
সদস্যাস্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলো দ্বিজঃ॥ আদিকাণ্ড, ১৪/২১

৭. নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩/২৮

৮. দৃষ্ট্বা কামশরাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষমুদীরয়ন্ ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং রহিতে রাক্ষসাধিপঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৬/১৪

৯. শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু বৈ।
স্বাধ্যায়নিরতাংশ্চৈব যাতুধানান্ দদর্শ সঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৪/১৩

১০. ষড়ঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্ ।
শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১৮/২

১১. মুখ্যৈর্যজ্ঞৈর্যজন্ত্যেতে তৈস্তৈর্যত্তে দ্বিজাতয়ঃ।
জুহ্বত্যগ্নীংশ্চ বিধিবদ্ বেদাংশ্চোচ্চৈরধীয়তে ॥
অভিভূয় চ রক্ষাংসি ব্রহ্মঘোষানুদীরয়ন্ ।
দিশো বিপ্রদ্রুতাঃ সর্বাঃ স্তনয়িতুরিবোষ্ণগে ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩৫/১৯-২০

১২. নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্ ।
বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্ ॥
ন মুখে নেত্রয়োশ্চাপি ললাটে চ ভ্রুবোস্তথা।
অন্যেষ্বপি চ সর্বেষু দোষঃ সংবিদিতঃ ক্বচিৎ ॥
অবিস্তরমসংদিগ্ধমবিলম্বিতমব্যথম্ ।
উরঃস্তং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ততে মধ্যমস্বরম্ ॥
সংস্কারক্রমসম্পন্নামদ্ভুতামবিলম্বিতাম্ ।
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয়হর্ষিণীম্ ॥
অনয়া চিত্রয়া বাচা ত্রিস্থানব্যঞ্জনস্থয়া ।
কস্য নারাধ্যতে চিত্তমুদ্যতাসেরবেরপি ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩/২৯-৩৩

১৩. অহং হ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচং চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৩০/১৭

১৪. যদি বাসং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্ ।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৩০/১৮

Dhaka University Institutional Repository

১৫. উবাচ পরমোদারো হৃষ্টস্তমভিপূজয়ন্ ।
যথামৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে ॥
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাঽপ্রজস্য বৈ।
প্রণষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ॥
তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।
কঞ্চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১৮/৫০-৫২

১৬. যত্তু মে হৃদ্‌গতং বাক্যং তস্য কার্যস্য নিশ্চয়ম্ ।
কুরুষ্ব রাজশার্দূল ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥
অহং নিয়মমাতিষ্ঠে বিধ্যর্থং পুরুষর্ষভ।
তস্য বিঘ্নকরৌ দ্বৌ তু রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ॥
ব্রতে তু বহুশশ্চীর্ণে সমাপ্ত্যাং রাক্ষসাবিমৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ॥
তৌ মাংস-রুধিরৌঘেণ বেদিং তামভ্যবর্ষতাম্ ।
অবধূতে তথাভূতে তস্মিন্ নিয়মনিশ্চয়ে ॥
কৃতশ্রমো নিরুৎসাহস্তস্মাদ্ দেশাদপাক্রমে।
ন চ মে ক্রোধমুৎসৃষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব ॥
তথাভূতা হি সা চর্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে।
স্বপুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥
কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি।
শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তেজসা ॥
রাক্ষসা যে বিকর্তারস্তেষামপি বিনাশনে ।
শ্রেয়শ্চাস্মৈ প্রদাস্যামি বহুরূপং ন সংশয়ঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১৯/৩-১০

১৭. এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ।
এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসশ্চ পরায়ণম্ ॥ আদিকাণ্ড, ২১/১০

১৮. এবং বীর্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।
ন রামগমনে রাজন্ সংশয়ং গন্তুমর্হসি ॥
তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামপেত্যাভিযাচতে ॥ আদিকাণ্ড, ২১/ ২০-২১

১৯. তপসা সম্ভৃতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ।
ততো রামো জলং স্পৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ ॥ আদিকাণ্ড, ২২/২১

২০. পুরুষস্যেহ জাতস্য ভবন্তি গুরবস্ত্রয়ঃ।
আচার্যশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ রাঘব ॥
পিতা হ্যেনং জনয়তি পুরুষং পুরুষর্ষভ।
প্রজ্ঞাং দদাতি চাচার্যস্তস্মাৎ স গুরুরুচ্যতে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১১১/২-৩

২১. জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্মে চ পথিবর্তিনঃ ॥

যবীয়ানাত্মনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ।
পুত্রবত্তে ত্রয়শ্চিন্ত্যা ধর্মশ্চৈবাত্র কারণম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮/১৩-১৪

২২. ধর্মার্থগুণসম্পন্নং হরীশ্বরমনুত্তমম্ ।
অধিক্ষিপ্তস্তদা রামঃ পশ্চাদ্ বালিনব্রবীৎ ॥
ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ সময়ং চাপি লৌকিকম্ ।
অবিজ্ঞায় কথং বাল্যান্মামিহাদ্য বিগর্হসে ॥
অপৃষ্ট্বা বুদ্ধিসম্পন্নান্ বৃদ্ধানাচার্যসম্মতান্ ।
সৌম্য বানরচাপল্যাত্ত্বং মাং বক্তুমিহেচ্ছসি ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮/৩-৫

২৩. ব্রতস্নাতস্য বিদ্যেব বিপ্রস্য বিদিতাত্মনঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ২১/১৭

২৪. অনধীত্য চ শাস্ত্রাণি বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ন শক্যমীদৃশং বক্তুং যদুবাচ হরীশ্বরঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৮/৮

২৫. সা প্রকৃত্যেব তন্বঙ্গী তদ্বিয়োগাচ্চ কর্শিতা।
প্রতিপৎপাঠশীলস্য বিদ্যেব তনুতাং গতা ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৫৯/৩৫

২৬. যে চ বাণৈর্ন বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্ ।
শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৫/২০

২৭. কর্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহূনপি।
প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পরজিগীষয়া ॥ আদিকাণ্ড, ১৪/১৯

২৮. অতিলক্ষণসম্পন্নং মাধুর্যগুণভূষণম্ ।
বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং ত্বমেবার্হসি ভাষিতুম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৩/২৬

২৯. ভাবং ন চাস্যাহমনুপ্রদাতুমলং দ্বিজো মন্ত্রমিবাদ্বিজায় ॥ সুন্দরকাণ্ড, ২৮/৫

৩০. তৌ কাষ্ঠসঙ্ঘাটমথো চক্রতুঃ সুমহাপ্লবম্ ।
শুষ্কৈর্বন্যৈঃ সমাকীর্ণমুশীরৈশ্চ সমাবৃতম্ ॥
ততো বৈতসশাখাশ্চ জম্বুশাখাশ্চ বীর্যবান্ ।
চকার লক্ষ্মণশ্ছিত্ত্বা সীতায়াঃ সুখমাসনম্ ॥
আরোপ্য সীতাং প্রথমং সংঘাটং পরিগৃহ্য তৌ।
ততঃ প্রতরেতুর্যত্তৌ প্রীতৌ দশরথাত্মজৌ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৫/১৪-১৫, ১৮

৩১. তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রির্বিবিধান্ দ্রুমান্ ।
আজহার ততশ্চক্রে পর্ণশালামরিন্দমঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৬/২০

৩২. অচিরেণাশ্রমং ভ্রাতুশ্চকার সুমহাবলঃ ॥
পর্ণশালাং সুবিপুলাং তত্র সঙ্ঘাতমৃত্তিকাম্ । অরণ্যকাণ্ড, ১৫/২০-২১

নৈতিক শিক্ষা

সকল দেশে সকল কালে সমাজকে সুস্থ ও সুস্থিত রাখতে নীতি বা নৈতিক শিক্ষার চর্চা লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ভারতে এই নৈতিক শিক্ষার চর্চা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেকালে সকল সাহিত্যের মূল লক্ষ্য ছিল কোনো বিশেষ আদর্শ বা নৈতিক শিক্ষা অর্জন। প্রাচীন সে সময়ে এর জন্য পঠনীয় বিদ্যার নাম হয়েছে নীতিবিদ্যা বা নীতিশাস্ত্র। রামায়ণে বিধৃত হয়েছে অজস্র নীতিকথা। কালান্তরেও এ সকল নীতিকথা আমাদের কাছে সমভাবে দীপ্যমান। আধুনিক এই সভ্যতার যুগেও রামায়ণে বিধৃত নৈতিক শিক্ষা আমাদের আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানায়। একজন আদর্শ মানুষের বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে, কীভাবে তিনি তাঁর মানবীয় গুণাবলি দ্বারা দেবত্বে উন্নীত হতে পারেন তারই অনুপম নিদর্শন রামায়ণ। রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে– "ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"(প্রাচীন সাহিত্য) । এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন: রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। ... কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই; সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।... গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। ... বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"(প্রাচীন সাহিত্য)।

সমগ্র রামায়ণের মধ্য দিয়ে বহুবিধ নৈতিক শিক্ষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ক্রোধজয়, যথোচিত বক্তব্য উপস্থাপন, মিত্রতা, কৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতার পরিচয়, শরণাগতরক্ষা, ক্ষমাধর্ম, সত্য ও প্রতিজ্ঞাপালন, নিসর্গ ও প্রাণিকুলের সংরক্ষণ, পরার্থপরায়ণতা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

ক্রোধ মানুষের মহাশত্রু

ক্রোধের চেয়ে বড় শত্রু আর নেই। জল দিয়ে জ্বলন্ত আগুনকে নেভানোর মতো যাঁরা জাগ্রত ক্রোধকে প্রশমিত করে থাকেন, সেই মহাত্মারাই ধন্য। রেগে গেলে মানুষ কোন পাপই না করে থাকে? ক্রুদ্ধ হলে মানুষ গুরুজনদেরও হত্যা করে। ক্রোধী মানুষ রূঢ় বাক্যে সাধুদেরও অসংযত কথা বলে থাকে। বেশি রেগে গেলে কোনটা বলা উচিত এবং কোনটা বলা উচিত নয়, তা মানুষ আর বুঝতে পারে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির অকার্য কিছু নেই। অবাচ্যও কিছু নেই। বিপরীত দিকে যিনি ক্রোধ সংবরণ করে সকলকে ক্ষমা করতে পারেন তিনি যথার্থ মানুষ। এখানে উপমাসংযোগে স্মরণীয় উক্তি, সাপ যেমন তার জীর্ণ খোলস পরিত্যাগ করে, ঠিক সেভাবে ক্রোধ-উদ্রেকের মুহূর্তেই যিনি ক্ষমার দ্বারা তা দূর করতে পারেন, তিনিই পুরুষ পদবাচ্য।[১] হনুমান যখন অগ্নিসংযোগে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করছিলেন তখন তাঁর মনে ক্রোধ সম্পর্কিত এই ভাবনার উদ্রেক হয়েছিল।

হিতকর অথচ অপ্রিয় বক্তা ও শ্রোতা দুইই দুর্লভ

মঙ্গলকামী ব্যক্তি যদি সুন্দর নীতিযুক্ত কথা বলে, অজিতেন্দ্রিয় মৃত্যুপথযাত্রী তা গ্রহণ করে না। সর্বদাই মিষ্ট কথা বলে এমন মানুষ সহজেই মেলে। কিন্তু হিতকর অথচ অপ্রিয় এমন বক্তা ও শ্রোতা দুইই দুর্লভ।[২] উক্তিটি বিভীষণ রাবণকে উদ্দেশ করে বলেন। বিভীষণ ছিলেন ধার্মিক। তাই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের অনাচারের প্রতিবাদ করেছেন বার বার। সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করার জন্য তিনি রাবণকে অনুরোধ করেছেন। রাবণ বিভীষণের সদুপদেশ গ্রাহ্য করেননি, বরং তাঁকে তীব্র তিরস্কার করেছেন। রাবণের রূঢ় আচরণের প্রতিবাদে ন্যায়বাদী বিভীষণ যৌক্তিক কথা বলেছেন।

মিত্ররূপী শত্রুর সঙ্গে বাস করা অনুচিত

শত্রু ও ক্রুদ্ধসর্পের সঙ্গেও বাস করা যায়। কিন্তু দেখতে মিত্রের মতো অথচ শত্রুর সেবা করে যারা, তাদের সঙ্গে বাস করা উচিত নয়।[৩] 'রামচন্দ্র অজেয়, তাই সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের কাছে প্রত্যর্পণ করা উচিত।'– রাবণের রাজসভায় বিভীষণ এই অভিমত প্রকাশ করেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এ প্রস্তাবে রাগান্বিত হয়ে কঠোর বাক্যে বিভীষণকে এই কথাগুলি বলেন।

ধর্মত্যাগীকে ত্যাগ করা উচিত

ধর্ম হতে যে বিচ্যুত, পাপে যে সংকল্পবদ্ধ, তাকে ত্যাগ করলে হাত থেকে বিষ পরিত্যাগ করলে যে সুখ লাভ করা যায়, সেই রকম সুখই অনুভব করা যায়। পরস্ব যে হরণ করে, পরস্ত্রীকে যে অত্যাচার করে, সেই দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের মতোই ত্যাগ করা উচিত।[৪] বিভীষণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎকে এ কথাগুলি বলেছিলেন অন্যায়কারী রাবণের পক্ষ ত্যাগ করার কারণ হিসেবে।

ধর্মত্যাগী যদি নিজের আত্মীয় হয়, তবুও তাকে ত্যাগ করা উচিত। আমরা জানি, ধার্মিক বিভীষণ তাঁর অধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সৎপথে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু স্বৈরাচারী রাবণ বিভীষণের কথায় কর্ণপাত না করে বরং তাঁকে সভামধ্যে অপমান করেছেন। তখন বিভীষণ তাঁর সিদ্ধান্তের কথা রাজসভায় ব্যক্ত করেন এভাবে– রাজন্, আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃতুল্য। কিন্তু আপনি ধর্মভ্রষ্ট, ভ্রান্ত। কালপাশে আবদ্ধ আপনি। আপনার গৃহে আগুন লেগেছে, তা বুঝতেও পারছেন না। তাই আপনার মঙ্গলের জন্য হিতবাক্য বলেছি। আপনার তা সহ্য হলো না। অসংযমী কামী পুরুষ কখনও কারো হিতবাক্য গ্রহণ করে না। কিন্তু আপনি আমার অগ্রজ, গুরুজন, আপনার শুভকামনায় যা বলেছি সেজন্য ক্ষমা করবেন। আপনার মঙ্গল হোক। আমি চলে যাচ্ছি।[৫] ধর্মজ্ঞ বিভীষণ অবশেষে অধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ত্যাগ করে রাম-লক্ষ্মণের পক্ষে যোগদান করেন।

সকল ভয় থেকে জ্ঞাতিভয়ই বেশি কষ্টদায়ক

সমাজে জ্ঞাতিশত্রু বড় শত্রু। আত্মীয়ের গৌরব, যশ ও শ্রীবৃদ্ধি দেখে অনেকের সহ্য হয় না। গোপনে তারা অপমান ও পরাভবের চেষ্টা করে। তাই বলা হয়েছে, গাভীতে হব্যকব্যের দ্রব্য দুগ্ধ থাকে। স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকে চাপল্য। ব্রাহ্মণে থাকে তপস্যা। আর জ্ঞাতিদের মধ্যে থাকে ভয়, তাদের থেকে আসে ভয়।[৬] এ সম্পর্কে তাই বলা হয়– বন্ধনপাশ হাতে নিয়ে একদল মানুষকে আসতে দেখে পদ্মবনের হস্তীরা বলেছিল, ওসব বন্ধনপাশ অস্ত্রশস্ত্র বা আগুন দেখে আমরা ভয় পাই না। কিন্তু ভয় করি আমাদের স্বার্থপর জ্ঞাতিদের। লোভের বশবর্তী হয়ে একটি হাতি একদল বন্যহাতিকে মানুষের হাতে ধরিয়ে দেয়।[৭] রাবণের সমালোচনা করায় রাবণ বিভীষণকে এ কথাগুলি বলেছিলেন।

কৃতঘ্নের নিষ্কৃতির কোনো বিধান নেই

বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হয়ে প্রত্যুপকার যে করে না, সে কৃতঘ্ন। সে সর্বপ্রাণীর বধ্য। যে গো হত্যা করেছে, সুরাপান করেছে, যে চুরি করেছে এবং যে ব্রত শেষ পর্যন্ত করতে পারে নি, পণ্ডিতেরা তাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতির কোনো বিধান নেই।[৮] রামের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্ব করায় লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এরূপ নীতিবাক্য বলেছিলেন। লক্ষ্মণ আরও বলেছেন: গোহত্যাকারী, সুরাপায়ী, চৌর্যবৃত্তিধারী এবং ব্রত অসমাপ্তকারীর প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, কিন্তু কৃতঘ্নের মুক্তির কোনো উপায় নেই।[৯]

নিসর্গ রক্ষা ও জীবজন্তু সংরক্ষণে সচেতনতা

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাসে। রাজপুত্র ভরত সদলবলে চলেছেন রামচন্দ্রের খোঁজে। যেভাবেই হোক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর মাতৃগণ, মন্ত্রিমণ্ডলী, রাজপুরোহিত বসিষ্ঠ ও বিশাল সৈন্যবাহিনী। অতিথিপরায়ণ গুহকের সহায়তায় তাঁরা গঙ্গা পার হন । অদূরেই ভরদ্বাজ ঋষির তপোবন। ক্রোশমধ্যে তার দূরত্ব। এতক্ষণ সবাইকে নিয়ে চলেছেন ধর্মজ্ঞ ভরত। কিন্তু এখন সবাইকে থামতে বললেন। পরিত্যাগ করলেন তিনি রাজকীয় বেশ। সশ্রদ্ধচিত্তে পরিধান করলেন পট্টবেশ ও উত্তরীয়। কারণ, সামনে ঋষি ভরদ্বাজের শান্ত-স্নিগ্ধ তপোবন। এই তপোবনের স্নিগ্ধতা তিনি নষ্ট করতে চাননি। কেবল রাজপুরোহিত বসিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে বিনীতবেশে তিনি আশ্রমে প্রবেশ করেন। ঋষি বসিষ্ঠ ও রাজপুত্র ভরতকে দেখে এগিয়ে আসেন ঋষি ভরদ্বাজ। তিনি উভয়কে পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফল দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। ধর্মজ্ঞ ভরদ্বাজ অযোধ্যার সৈন্য, কোষ, মিত্র ও মন্ত্রীদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ভরত তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দূরে রেখে এসেছেন। তাই ভরদ্বাজ ঋষি ভরতকে জিজ্ঞাসা করেন– তোমার সৈন্যদের কেন এখানে আনলে না? কেন দূরে রেখে এলে? তখন ভরত তাঁকে বললেন– তারা আশ্রমের বৃক্ষ, জলাশয়, ভূমি এবং পর্ণশালাগুলির যাতে ক্ষতি না করে, সেজন্য আমি একাই এসেছি।[১০] ঋষি বসিষ্ঠ ও ভরত ভরদ্বাজ মুনির শরীরের, যজ্ঞের, শিষ্যদের, আশ্রমের বৃক্ষরাজির, পশু ও পাখিদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। মুনি-ঋষিদের প্রতি রাজকুমার ভরতের বিনয় ও সৌজন্য এখানে লক্ষণীয়। মানুষের পাশাপাশি তপোবনের বৃক্ষরাজি, পশু-পাখির প্রতি তাঁর সমাদর সমান গুরুত্ব পেয়েছে। কেননা কেবল মানুষের মধ্যে নয়, সবকিছুর মধ্যে একই পরমাত্মা বিরাজিত।

স্বার্থপর মানুষের মন্ত্রণা গ্রহণ করা অনুচিত

ভরত-জননী কৈকেয়ী ছিলেন এক মমতাময়ী মা। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর ছিল গভীর স্নেহ। কেননা আমরা জানি, মন্থরার মুখে রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শুনে তিনি আনন্দে তাঁর কণ্ঠহার মন্থরাকে দিয়ে বলেছিলেন: এমন প্রিয় সংবাদে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। তোমাকে আরও কিছু দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কী নেবে বলো? রামের অভিষেক হবে, রাম রাজা হবে, এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে ? আমার কাছে ভরত আর রামে কোনো প্রভেদ নেই।[১১] কিন্তু এর পরের ঘটনা খুবই ভয়ঙ্কর। স্বার্থপর মন্থরার কুমন্ত্রণায় সুন্দরমনা কৈকেয়ীর মনে চরম বিকৃতি লাভ করে। রামায়ণের এই কাহিনির মাধ্যমে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে– সরল, মহৎ, সহানুভূতিশীল ব্যক্তিও কুটিল, স্বার্থপর লোকের সংস্পর্শে ও কুমন্ত্রণায় মুহূর্তের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তিত হয়। এমন কি পাপের পথে পা বাড়িয়ে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাই স্বার্থপর ও কুটিল প্রকৃতির লোকের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

শরণাগতকে রক্ষা করা পরমধর্ম

রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ। তিনি জ্ঞানী, সত্যের পূজারী ও আদর্শবান। সীতাকে রামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি রাবণকে অনেক অনুরোধ করেছেন। কিন্তু রাবণ তাঁর কথা শোনেন নি। অগ্রজের এমন অধর্ম দেখে বিভীষণ লঙ্কা ছেড়ে রামচন্দ্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সুগ্রীবসহ অন্যান্য বানর বিভীষণকে সন্দেহ করেন এবং রামচন্দ্রকে অনুরোধ করেন তাকে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য। তখন শরণাগতবৎসল রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলেন: হে পরন্তপ, কেউ যদি কৃতাঞ্জলি হয়ে দৈন্যের সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করে, সে যদি শত্রুও হয়, তবু তাকে ধর্মরক্ষার জন্যই হত্যা করবে না। শত্রু আর্তই হোক বা দৃপ্তই হোক, সে যদি শত্রুর শরণাগত হয়, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে প্রাণের বিনিময়ে সেই শত্রুকে রক্ষা করা। কেউ যদি ভয়ে, মোহে বা ইচ্ছা করে শরণাগতকে নিজের শক্তি অনুসারে যথাবিধি রক্ষা না করে, তাহলে সে পাপগ্রস্ত হয়, জগতে নিন্দিত হয়। রক্ষাকারীর শরণাগত হয়ে তার চোখের সামনে কেউ যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে সেই অরক্ষিত ব্যক্তি রক্ষাকারীর পুণ্যটুকু নিয়ে চলে যায়। শরণাগতকে রক্ষা না করলে ভীষণ দোষ হয়। 'আমি আপনার শরণ নিলাম' – এই কথা একবার মাত্র বলেও যে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, সকল প্রাণীর আক্রমণ হতে তাকে অভয় দিয়ে থাকি। এ আমার ব্রত।[১২]

পরার্থে আত্মত্যাগে জীবন সার্থক

বনগমনকালে লক্ষ্মণ নিজমাতা সুমিত্রার কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে যা বলেছিলেন, তা নৈতিক শিক্ষার এক আদর্শ নিদর্শন। সুমিত্রাদেবী লক্ষ্মণকে বলেন– আত্মীয়দের প্রতি তুমি খুবই অনুরক্ত। তবুও তোমায় আমি বনবাসের জন্য অনুমতি দিচ্ছি। তোমার দাদা রাম বনে যাচ্ছে। তাকে অনুসরণ না করে তুমি ভুল করো না। তোমার দাদা বিপদেই পড়ুক বা ঐশ্বর্যেই থাকুক, সেই তোমার আশ্রয়। ছোটভাই বড় ভাইয়ের বশীভূত হবে, জগতে এটাই হচ্ছে সজ্জনের ধর্ম। এইই হচ্ছে এ বংশের চিরন্তন সমুচিত সদাচার। দান, দীক্ষা, যজ্ঞ এবং যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনও এই বংশের পরম্পরা। রামচন্দ্রকে দশরথ মনে করবে, সীতাদেবীকে মনে করবে আমি, বনভূমিকে অযোধ্যা মনে করবে। বৎস, সানন্দে এবার এস।[১৩] এখানে লক্ষণীয়, সুমিত্রাদেবীর অপর সন্তান শত্রুঘ্নও তাঁর কাছে থাকেন না। শত্রুঘ্ন থাকেন ভরতের সঙ্গে তাঁর মামাবাড়ি কেকয়রাজ্যে। তবুও তিনি মা হয়ে তাঁর সন্তানকে হাসিমুখে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমনের অনুমতি দিলেন। সন্তানের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ। কিন্তু তাঁর মাতৃস্নেহ ত্যাগে-শান্তিতে-সদাচারে সমুজ্জ্বল। মূলত তিনি সকলের সেবা ও শান্তিবিধানে অনুক্ষণ আত্মনিবেদিত। তাই স্বার্থসুখের আকাঙ্ক্ষা ও পুত্রবিচ্ছেদের শোক অগ্রাহ্য করেও তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁর পুত্রকে কর্তব্যপথে প্রেরণা দান করেছেন।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

রামচন্দ্র বনগমনের পর শোকগ্রস্ত রাজা দশরথ রামজননী শোকক্লিষ্টা কৌসল্যার কাছে এসেছেন। রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে স্মরণ করে দুঃখে বিলাপ করছেন। রামজননী কৌসল্যার অবস্থা তখন বৎসহারা গাভীর মতো। রামের শোকে বিলাপ করতে করতে ধর্মপরায়ণা কৌসল্যার চিত্তে জেগে ওঠে ক্রোধ। শোকক্লিষ্টা ক্রুদ্ধা রামজননী কর্কশবাক্যে রাজা দশরথকে অভিযুক্ত করলেন। তখন রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলি হয়ে কৌসল্যাকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন: দেবী কৌসল্যা, প্রসন্ন হও। এই করজোড়ে বলছি, তুমি নিত্যই অপরের প্রতি স্নেহময়ী ও সহৃদয়া। গুণবানই হোক বা নির্গুণই হোক, স্বামী ধার্মিক নারীদের কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা। তুমি তেমনই ধর্মপরায়ণা নারী। দুঃখে পড়েও অধিক দুঃখিত আমাকে তুমি এইরূপ অপ্রিয়বাক্য বলতে পার না।[১৪] তখন দেবী কৌসল্যা কাঁদতে কাঁদতে রাজা দশরথের অঞ্জলিবদ্ধ হাতদুটি মাথায় তুলে নিয়ে বলেন: আমি মাটিতে পড়ে আপনার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলছি, আপনি প্রসন্ন হোন। আপনার আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত নয়। অথচ আপনি তাই করলেন। দেব,

এতে যে আমি মারা গেলাম। সংসারে সেই স্ত্রী যথার্থ হয় না– যে প্রশংসনীয়, ধীমান পতির দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে এভাবে প্রসাদিত হয়।[১৫] এখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তা অতুলনীয়।

ক্ষমা পরম ধর্ম

লঙ্কা জয়ের পর হনুমান রামচন্দ্রের বিজয় বার্তা শোনাতে সীতাদেবীর কাছে যান। সীতাদেবীর চারদিকে তখন রাক্ষসীরা। তিনি নিরানন্দভাবে বসে আছেন। হনুমান তাঁকে প্রণাম করে রামচন্দ্রের বিজয় বার্তা জানালেন: হে দেবী, আজ বিজয় লাভ হয়েছে। এখন স্বস্থ হও। মনোবেদনা ত্যাগ করো। শত্রু রাবণ নিহত হয়েছে। লঙ্কা আমাদের বশীভূত।[১৬] হনুমান সীতাকে এ সংবাদ দিলে অতি আনন্দে সীতার বাক্স্ফুর্তি হলো না। তখন হনুমান বললেন: দেবী, আপনি কী চিন্তা করছেন? আমার সঙ্গে কথাও বললেন না যে ![১৭] সীতাদেবী তখন সানন্দে বললেন: হে মহাবীর, পৃথিবীতে এমন কোনো ধন-রত্ন দেখি না, যা দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করতে পারি। ত্রিলোকের রাজ্যও তোমার যোগ্য পুরস্কার নয়।[১৮] তারপর হনুমান সীতার প্রতি তর্জনকারিণী রাক্ষসীদের শাস্তি দিতে চাইলেন। হনুমান সীতাকে বললেন– আপনার অনুমতি পেলে আপনাকে যারা পীড়ন করেছে, সেই রাক্ষসীদের আমি শাস্তি দিতে চাই।[১৯]

তখন করুণাময়ী, দীনবৎসলা, ক্ষমাশীলা সীতাদেবী হনুমানকে বললেন: রাজার আশ্রয়ে যারা থাকে, রাজ-আজ্ঞায় তাদের কাজ করতে হয়। তারা তো দাসীমাত্র, পরাধীনা। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তাদের ওপর কে রাগ করবে? পূর্ব জন্মের দুষ্কৃতি এবং ভাগ্যদোষেই আমার এই দুর্গতি। আমার নিজেরই কৃতকর্মের ফল আমি এভাবে পেয়েছি। ভোগও করেছি। হে মহাবীর, এরকম বলো না। দৈবেরই এই পরমাগতি। আমি নিশ্চিত যে, দশা অনুসারে ফল পেতেই হবে। রাবণের দাসীরা দুর্বলা। তাদেরকে আমি ক্ষমা করেছি। রাক্ষস রাবণের দ্বারা আদিষ্ট হয়েই রাক্ষসীরা আমায় পীড়ন করেছে। পুরানো একটি ধর্মকাহিনি শোনো: একবার একটি বাঘ একজন ব্যাধকে তাড়া করে। ব্যাধ তখন আত্মরক্ষার জন্য একটি গাছে চড়ে বসে। গাছের ওপরে ছিল একটি ভল্লুক। বাঘ বার বার ভল্লুককে অনুরোধ করল, ভল্লুক যেন ব্যাধকে গাছের নিচে ফেলে দেয়। তখন ভল্লুক বাঘকে কিছু ধর্মসঙ্গত কথা বলে। – শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাপচারী অন্যের পাপ গ্রহণ করে না। আমার যা প্রতিজ্ঞা তা রক্ষা করতেই হবে। চরিত্র হলো

সজ্জনদের অলঙ্কার। সাধুদের কাজ হলো– পাপকর্মা হোক বা শুভকর্মা হোক অথবা বধের যোগ্য হোক, তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা। কে নেই যে অপরাধ করে না? পাপীরা নিষ্ঠুর কর্ম করলেও তাদের কখনও অমঙ্গল করবে না।[২০]

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন শেষ। অপরূপ সাজে সজ্জিত অযোধ্যা নগরী। সবার মনে আনন্দ। কিন্তু দুর্মতি মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী কীভাবে রাজা দশরথকে বরদানে মোহগ্রস্ত করেন, তা প্রত্যেক রামায়ণ পাঠকের কাছে পরিজ্ঞাত। রাজা দশরথকে পূর্ব প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করে কৈকেয়ী চেয়ে নিলেন দুটি বর। প্রথম বর– রামচন্দ্রের নয়, ভরতের হবে রাজ্যাভিষেক। দ্বিতীয় বর– চৌদ্দ বছরের জন্য রামচন্দ্রের বনবাসে নির্বাসন। কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় রাজা দশরথ শোকে মুহ্যমান। শোকগ্রস্ত রাজা রামচন্দ্রকে বললেন: বৎস রাম, কৈকেয়ীকে বরদানে আমি মোহগ্রস্ত হয়েছি। আমাকে জোর করে সরিয়ে তুমিই অযোধ্যার রাজা হও।[২১] কিন্তু রামচন্দ্রের কাছে সত্যই বড় তপস্যা। তাই তিনি তাঁর পিতাকে বলেন– আমি রাজ্য চাই না। সুখ চাই না। এমন কি পৃথিবীও চাই না। কামনার এইসব বস্তু চাই না। স্বর্গ চাই না, এমন কি জীবনও চাই না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমি মিথ্যা থেকে মুক্ত করে সত্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এই আমি আপনার সামনে সত্য ও পুণ্যের নামে শপথ করে বলছি।[২২] পিতৃসত্য রক্ষায় রামচন্দ্র সানন্দে বনে গমন করেছিলেন।

বনবাসে অবস্থানকালে ভরত রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। ভরতের পক্ষে ঋষি জাবালি অনেক যুক্তি দিয়ে রামচন্দ্রকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, রামচন্দ্রের অযোধ্যায় ফিরে যাওয়া উচিত। জাবালির যুক্তিকে খণ্ডন করে রামচন্দ্র যে মত স্থাপন করেন, তা ছিল সম্পূর্ণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রামচন্দ্র সত্যের স্বরূপকে কীভাবে উপলব্ধি করেছেন, তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে প্রদর্শিত হয়েছে।– সত্যই ঈশ্বর। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। সব কিছুর মূলে রয়েছে সত্য।[২৩]

সত্য সত্যের দ্বারা রক্ষিত হয়

মিথ্যা দ্বারা কখনও সত্য রক্ষিত হয় না। সত্য দ্বারাই সত্য রক্ষিত হয়। রামচন্দ্র বলেছেন– আমি সত্যকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করি। এই সত্য রক্ষার ভার বহনের জন্যই সৎপুরুষেরা জীবনের সব

কিছু আহরণ করেন। সত্যের জন্যই তাঁরা অভিনন্দিত হন।[২৪] আমি পিতৃনির্দেশ কেন পালন করব না? আমি সত্যকে আশ্রয় করে সত্য পালন করব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।[২৫] যদি চন্দ্র থেকে জ্যোৎস্না চলে যায়, হিমালয় যদি হিম ত্যাগ করে, যদি সমুদ্র তটভূমি অতিক্রম করে, তবুও আমি পিতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না।[২৬] সত্যকে জীবনের পরম ধর্ম মেনেই রামচন্দ্র তাঁর জীবনে সমস্ত নীতি অনুসরণ করেছেন। সমাজ ও জীবনকে সত্যের কঠোর শাসনে বেঁধেছেন। সত্যের বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে গিয়ে তিনি সানন্দে দুঃখকে বরণ করেছেন। এই সত্য নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে তাঁর জীবনে বার বার এসেছে। যেমন, লক্ষ্মণ ত্যাগ।

রামচন্দ্রের জীবনের শেষ দিক। একদিন ছদ্মবেশে মহাকাল ঋষিরূপ ধরে এলেন রামচন্দ্রের কাছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত গোপন কথা আছে। ছদ্মবেশী মহাকাল রামচন্দ্রকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন, তাঁদের দুজনের বৈঠকের সময় কেউ তাঁদের সামনে আসতে পারবে না। যে ভেতরে প্রবেশ করবে, তাকে হত্যা করতে হবে। রামচন্দ্র সম্মত হলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি নিজে দ্বারে পাহারা দাও। কাউকে ভেতরে আসতে দিও না। যে ভেতরে আসবে, তাকে হত্যা করা হবে।

ছদ্মবেশী মহাকাল ও রামচন্দ্রের বৈঠক চলছে। একটু পরে ঋষি দুর্বাসা এলেন দ্বারদেশে। তিনি পাহারারত লক্ষ্মণকে বললেন, এই মুহূর্তেই আমি রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করব। তাঁকে আমার আগমন বার্তা পৌঁছে দাও। তখন লক্ষ্মণ তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। লক্ষ্মণের কথা শুনে ঋষি দুর্বাসা ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন– এখনই রামচন্দ্রকে সংবাদ পাঠাও। বিলম্ব করলে তোমাদের রাজ্য, তোমরা সবাই সবংশে ভস্ম হয়ে যাবে। তখন লক্ষ্মণ ভাবলেন, সকলের বিনাশ না হয়ে বরং আমার বিনাশ হোক। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে ঋষি দুর্বাসার আগমনের বার্তা জানালেন। লক্ষ্মণকে দেখে রামচন্দ্র বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়ল, মহাকালের কাছে প্রতিজ্ঞার কথা। তখন শোকে-দুঃখে করুণ-ম্লান হলো তাঁর মুখখানি। রামচন্দ্র ভাবলেন, মহাকাল তাঁর জীবনে একি কঠোর পরীক্ষা নিতে এলেন ! তিনি কি ভ্রাতৃহন্তা হবেন? না কি সত্যভ্রষ্ট? তখন ঋষি বসিষ্ঠ তাঁকে একটা সমাধান দিলেন। তিনি বললেন– হে পুরুষোত্তম, তুমি লক্ষ্মণকে ত্যাগ করো। নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না। কেননা, অঙ্গীকার বিনষ্ট হলে ধর্ম নষ্ট হয়।[২৭] আজীবন সত্যের পূজারী রামচন্দ্র এবার সত্য রক্ষার্থে নিজেকেই

বলি দিলেন। লক্ষ্মণ তাঁর আত্মসম, দ্বিতীয় প্রাণ। সেই প্রাণাধিক ভ্রাতাকে তিনি বললেন– সৌমিত্রি, ধর্মের বিপর্যয় করা উচিত নয়। তাই তোমাকে আমি ত্যাগ করছি। কেননা, সাধুজনের পক্ষে নিধন অথবা পরিত্যাগ উভয়ই সমান।[২৮]

পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অবশ্য পালনীয়

কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা অবশ্যই পালন করা উচিত। মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যার রাজসভায় আগমন করলে রাজা দশরথ তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মহর্ষি যা নির্দেশ দিবেন, তিনি তা সম্পূর্ণরূপে পালন করবেন। কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার্থে রামচন্দ্রকে কামনা করলেন। তখন রাজা দশরথ রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য সবকিছু মহর্ষিকে দিতে চাইলেন। এ সময় মহর্ষি বসিষ্ঠ রাজা দশরথকে বললেন– মহারাজ, আপনি ধর্মের অপরমূর্তি। আপনার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে না করলে ইষ্টাপূর্তের বিনাশ হয়। তাই আপনি রামকে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে ধর্ম পালন করুন।[২৯] রাজা দশরথ তখন পূর্ব-প্রতিশ্রুতি পালনার্থে তাঁর প্রাণপ্রিয় দুই পুত্র রাম-লক্ষ্মণকে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

বনবাসকালে রামচন্দ্র রাক্ষসদের দ্বারা নিপীড়িত ঋষিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি রাক্ষসদের বধ করে ধর্মপ্রাণ ঋষিদের রক্ষা করবেন। কিন্তু সীতাদেবী বনবাসকালে রামচন্দ্রকে অহিংস ধর্ম পালনের অনুরোধ করেন। তিনি রামচন্দ্রকে বলেন– হে বীর, শত্রুতা না করলে দণ্ডকাবাসী রাক্ষসদের হত্যার বুদ্ধি তুমি করো না। বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়।[৩০] তখন রামচন্দ্র সীতাকে বলেন– হে সীতা, এই দণ্ডকারণ্যবাসীদের আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীবন থাকতে তা আমি ফিরিয়ে নিতে পারব না। আমি তোমাকে, লক্ষ্মণকে এমন কি আমার প্রাণকেও ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু মুনিদের কাছে প্রদত্ত অভীষ্ট সত্য তথা প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ করতে পারি না। বিশেষত ব্রাহ্মণদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ত্যাগ করতে পারব না। ঋষিদের রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য।[৩১]

লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবকে বলেন– যে রাজা উপকারী মিত্রদের উপকার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন করেন না, তার চেয়ে অধিক নৃশংস আর নেই। একটি অশ্বদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন না

করলে তাকে শত অশ্বহত্যার পাপে পাপী হতে হয়। একটি গাভী দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেটি পালন না করলে সহস্র গাভী হত্যার পাপ হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেটি পালন না করলে তা আত্মহত্যা এবং স্বজনবধের পাপভাগী হতে হয়।[৩২]

গুরুর প্রতি বিনয় ব্যবহার

একজন আদর্শ ব্যক্তি সব সময় গুরুর প্রতি বিনয়ী হন। রামায়ণে গুরুর প্রতি শিষ্যের কেমন আচরণ হওয়া উচিত, গুরুকে কতটা মর্যাদা দান করা উচিত, রামচন্দ্র তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিশ্বামিত্র ছিলেন রামচন্দ্রের অস্ত্রগুরু। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে রামচন্দ্র তপোবনবাসীদের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করার জন্য তাড়কাবধ করেছিলেন। তাড়কাবধের পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বিশ্বামিত্রের চরণে প্রণাম করে বলেন– হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার ভৃত্যরূপে আমরা দুজন উপস্থিত হয়েছি। আজ্ঞা করুন, আপনার কোন আদেশ আমরা পালন করব? [৩৩] রামচন্দ্রের এ উক্তিতে গুরুজনের প্রতি বিনয়-আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। গুরুর প্রতি রামচন্দ্রের এরূপ বিনয়-আচরণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

কতিপয় নীতিবাক্য

পরাধীনতার কষ্ট

পরাধীনতাকে ধিক্। পরাধীন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো প্রাণত্যাগও করতে পারে না।[৩৪] অশোক বনে রাক্ষসীদের তর্জনগর্জন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শোকাচ্ছন্ন ক্রন্দনরত সীতাদেবী আপনমনে এ উক্তিটি করেছিলেন।

শোকের কুফল

হনুমানের কাছ থেকে সীতার সংবাদ জ্ঞাত হয়ে রামচন্দ্র আনন্দিত হলেন, কিন্তু কীভাবে সুবিশাল সমুদ্র পার হয়ে সীতাকে উদ্ধার করবেন তা ভেবে দুঃখ করতে লাগলেন। তখন বানররাজ সুগ্রীব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেমন সৌহৃদ্য ভুলে যায়, আপনিও তেমনি শোক ভুলে যান। যার

উৎসাহ নেই, যে দীন, যে নিজেকে শোকে ব্যাকুল করে ফেলে সে সর্বপ্রকারেই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দুঃখ পেয়ে থাকে।[৩৫]

অন্তরের ভাব গোপন করা যায় না

বাইরের আকার দ্বারা অনেক কিছু ঢেকে ফেললেও অন্তরের ভাবকে গোপন করা যায় না। মানুষের অন্তর্গত ভাব জোর করেই বেরিয়ে আসে।[৩৬] বিভীষণ চারজন অনুচরসহ রামচন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা করলে সুগ্রীবসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় বানর তাদের রাবণের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান হনুমানের তা মনে হয় নি। কেননা তিনি লক্ষ করেন, বিভীষণের কথা বলার সময় তার মুখে কোনো দুষ্টভাব প্রকাশ পায় নি। তার মুখ ছিল প্রসন্ন। হনুমানের মনে হয়েছে কোনো শঠ ব্যক্তি নিঃশঙ্কভাবে তাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পারে না। এভাবে বিভীষণের সততার বিষয় উপস্থাপন করতে গিয়ে হনুমান রামচন্দ্রকে উপর্যুক্ত কথাগুলি বলেন।

স্বভাবকে সহজে অতিক্রম করা যায় না

মানুষের স্বভাব সহজাত। অনেকটা অপরিবর্তনীয়। দ্বিধা ভেঙে যাবে, তবুও কারও কাছে নত হবো না। এ আমার সহজাত দোষ। স্বভাবকে সহজে অতিক্রম করা যায় না।[৩৭] রাবণের মাতামহ মাল্যবান রামচন্দ্রের পরাক্রম, বলবীর্যের প্রশংসা করে তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের জন্য রাবণকে অনুরোধ করেন। তখন আত্মবিশ্বাসী রাবণের মনে হলো– যুদ্ধে দেবতারাও যার সামনে দাঁড়াতে পারে না, সেই রাক্ষসরাজ কেন যুদ্ধকে ভয় পাবে ? আত্ম অহঙ্কারী, অত্যন্ত দৃঢ়চেতা রাবণ মাল্যবানকে তখন উপর্যুক্ত কথাগুলি বলেন।

নীচব্যক্তির কুকর্মের ফলে তাঁর বংশ ধ্বংস হয়

কালের পাশে বশীভূত হয়ে একজন পাপ করে। সেই নীচব্যক্তির নিজের কুকর্মের দ্বারা তার কুলই ধ্বংস হয়ে যায়।[৩৮] বানরবাহিনীর সঙ্গে সুবেল পর্বতে আরোহণ করে রামচন্দ্র রাক্ষসদের আবাসভূমি দেখেন। তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে বলেন, দুরাত্মা রাবণের একার পাপের ফলে অনেক নিরীহ রাক্ষস মারা যাবে। রাবণের এই গর্হিত কাজের কুফল ভোগ করবে সাধারণ প্রজা। – একথা ভেবেই রামচন্দ্র উপর্যুক্ত উক্তিটি করেন।

ধর্মের প্রতি অনুরক্তকারীদের বিপদ হয় না

যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণের দিকে ধনুর্বাণ নিক্ষেপের জন্য বিস্ফারিত করলে ধনুর টঙ্কার শুনে কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে রামচন্দ্রের দিকে ছুটে যান। তখন রামচন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য বিভীষণ গদা হাতে নিয়ে সবেগে কুম্ভকর্ণের সামনে ছুটে গেলেন। বিভীষণকে দেখে কুম্ভকর্ণ তাকে সত্বর প্রহার করতে বলেন। কেননা ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্মানের। কুম্ভকর্ণ বিভীষণকে বলেন– রাক্ষসদের জগতে তুমিই একমাত্র সত্য এবং ধর্মকে রক্ষা করেছ। ধর্মে যারা অনুরক্ত, তাঁদের কখনও বিপদ হয় না।[৩৯]

কেবল কথাতেই কেউ সৎপুরুষ হয় না

যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণের ধনুর ভীতিদায়ক শব্দ শুনে রাবণপুত্র অতিকায় গর্বভরে লক্ষ্মণকে বলেন– তুমি তো ছেলেমানুষ ! যুদ্ধে বীরত্বপ্রকাশে তুমি বিচক্ষণ নও। যমের মতো ভয়াবহ আমার সঙ্গে কেন তুমি যুদ্ধ করতে চাইছ? তখন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন– ওরে দুরাত্মা, কেবল বাক্যের দ্বারাই তুমি প্রধান হতে পার না। কেবল কথাতেই কেউ সৎপুরুষ হয় না।[৪০]

ধর্ম হতে বিচ্যুতকারীকে ত্যাগে সুখলাভ

বিভীষণ লক্ষ্মণকে হোমের কর্মস্থলে নিয়ে গেলে ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন– রাক্ষসকুলে জন্মে তুমি নিজের জাতির প্রতি বিরুদ্ধতা করেছ। হে দুর্মতি, তুমি ধর্মকে দূষিত করেছ। তোমার জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, সৌহৃদ্য, জাতিপ্রেম নেই। তুমি নিন্দনীয়। তখন বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে বলেন– ধর্ম হতে যে বিচ্যুত, পাপে যে সংকল্পবদ্ধ, তাকে ত্যাগ করলে সুখলাভ হয়।[৪১]

সমগ্র রামায়ণে নৈতিক আদর্শের অনুশীলন ও সংরক্ষণ লক্ষণীয় এবং অনুকরণীয়।

তথ্যসূত্র :

১. ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো যে বুদ্ধ্যা কোপমুখিতম্ ।
নিরুদ্ধন্তি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নিমিবাম্ভসা ॥
ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাৎ গুরূনপি।
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষিপেৎ ॥

বাচ্যাবাচ্যং প্রকুপিতো ন বিজানাতি কর্হিচিৎ।
নাকার্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৫৫/৩-৬

২. সুনীতং হিতকামেন বাক্যমুক্তং দশানন।
ন গৃহ্ণন্ত্যকৃতাত্মনঃ কালস্য বশমাগতাঃ ॥
সুলভাঃ পুরুষাঃ রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/২০-২১

৩. বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছত্রুসেবিনা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/২

৪. ধর্মাৎ প্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিশ্চয়ম্ ।
ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা ॥
পরস্বহরণে যুক্তং পরদারাভিমর্শকম্ ।
ত্যাজ্যমাহুর্দুরাত্মানং বেশ্ম প্রজ্বলিতং যথা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৮৭/২১-২২

৫. স ত্বং ভ্রান্তো ঽসি মে রাজন্ ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি।
জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্মপথে স্থিতঃ।
ইদং হি পরুষং বাক্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্য তে ॥
সুনীতং হিতকামেন বাক্যমুক্তং দশানন।
ন গৃহ্ণন্ত্যকৃতাত্মানঃ কালস্য বশমাগতাঃ ॥
তন্মর্ষয়তু যচ্চোক্তং গুরুত্বাদ্ধিতমিচ্ছতা।
আত্মানং সর্বথা রক্ষ পুরীঞ্চেমাং সরাক্ষসাম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/১৯-২০, ২৫

৬. বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্ ।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/৯

৭. নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ॥
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/৭

৮. পূর্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎপ্রতি করোতি যঃ।
কৃতঘ্নঃ সর্বভূতানাং স বধ্যঃ প্লবগেশ্বরঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৪/১০

৯. গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্নির্হিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৪/১২

১০. তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা।

ন হিংস্যুরিতি তেনাহমেক এবাগতস্ততঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৯১/৯

১১. ইদং তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্ ।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে ॥
রামে বা ভরতে বঽহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজেঽভিষেক্ষ্যতি ॥
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচেঽমৃতম্ ॥
তথা হ্যবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৭/৩৪-৩৬

১২. বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্ ।
ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপ ॥
আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ ।
অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা ॥
ন চেদ্ভয়াদ্ বা মোহাদ্ বা কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি।
স্বয়া শক্ত্যা যথান্যায়ং তৎপাপং লোকগর্হিতম্ ॥
বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ ।
আদায় সুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ ॥
এবং দোষো মহানত্র প্রপন্না নামরক্ষণে।
অস্বর্গ্যং চাযশস্যঞ্চ বলবীর্যবিনাশনম্ ॥
করিষ্যামি যথার্থং তু কণ্ডোর্বচনমুত্তমম্ ।
ধর্মিষ্ঠঞ্চ যশস্যঞ্চ স্বর্গং স্যাত্তু ফলোদয়ে ॥
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে ।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৮/২৭-৩৩

১৩. রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্ ।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০/৯

১৪. প্রসাদয়ে ত্বাং কৌসল্যে রচিতোঽয়ং ময়াঞ্জলিঃ।
বৎসলা চানৃশংসা চ ত্বং হি নিত্যং পরেষ্বপি॥
ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্নির্গুণোঽপি বা।
ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্ ॥
সা ত্বং ধর্মপরা নিত্যং দৃষ্টলোকপরাবরা।
নার্হসে বিপ্রিয়ং বক্তুং দুঃখিতাপি সুদুঃখিতম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬২/৭-৯

১৫. প্রসীদ শিরসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে।
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং ন হি ত্বয়া ॥
নৈষা হি সা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন ধীমতা।
উভয়োর্লোকয়োর্লোকে পত্যা যা সংপ্রসাদ্যতে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬২/১২-১৩

১৬. লব্ধোঽয়ং বিজয়ঃ সীতে স্বস্থা ভব গতজ্বরা।
রাবণশ্চ হতঃ শত্রুর্লঙ্কা চৈব বশীকৃতা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৩/১০

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ততোঽব্রবীদ্ধরিবরঃ সীতামপ্রতিজল্পতীম্ ।
কিং ত্বং চিন্তয়সে দেবি কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৩/১৫

১৮. ন হি পশ্যামি সদৃশং চিন্তয়ন্তী প্লবঙ্গম।
আখ্যানকস্য ভবতো দাতুং প্রত্যভিনন্দনম্ ॥
ন হি পশ্যামি তৎ সৌম্য পৃথিব্যাং তব কিঞ্চন।
সদৃশং যৎপ্রিয়াখ্যানে তব দত্ত্বা ভবেৎ সুখম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৩/১৮-১৯

১৯. ইমাস্তু খলু রাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে।
হন্তুমিচ্ছামি তাঃ সর্বা যাভিস্ত্বং তর্জিতা পুরা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৩/৩০

২০. পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি বা।
কার্যং কারুণ্যমার্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি ॥
লোকহিংসাবিহারাণাং ক্রূরাণাং পাপকর্মণাম্ ।
কুবর্তামপি পাপানি নৈব কার্যমশোভনম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৩/৪৫-৪৬

২১. অহং রাঘব কৈকেয়্যা বরদানেন মোহিতঃ।
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/২৬

২২. নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্ ।
নৈব সর্বানিমান্ কামান্ন স্বর্গং ন চ জীবিতুম্ ॥
ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি নানৃতং পুরুষর্ষভ।
প্রত্যক্ষং তব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/৪৭-৪৮

২৩. সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১৩

২৪. প্রত্যগাত্মমিমং ধর্মং সত্যং পশ্যাম্যহং ধ্রুবম্।
ভারঃ সৎপুরুষৈশ্চীর্ণস্তদর্থমভিনন্দ্যতে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১৯

২৫. সোঽহং পিতুর্নিদেশং তু কিমর্থং নানুপালয়ে।
সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যং সত্যেন সময়ীকৃতম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯/১৬

২৬. লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১১২/১৮

২৭. ত্যজৈনং বলবান্ কালো মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।
প্রতিজ্ঞায়াং হি নষ্টায়াং ধর্মো হি বিলয়ং ব্রজেৎ ॥ উত্তরকাণ্ড, ১০৬/৯

২৮. বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্মবিপর্যয়ঃ।

ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্ ॥ উত্তরকাণ্ড, ১০৬/১৩

২৯. ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব নাধর্মং বোঢুমর্হসি ॥
প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ।
ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাদ্ রামং বিসর্জয় ॥ আদিকাণ্ড, ২১/৭-৮

৩০. বুদ্ধির্বৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্ ।
অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৯/২৫

৩১. ঋষীণাং দণ্ডকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাত্মজে।
সংশ্রুত্য চ ন শক্ষ্যামি জীবমানঃ প্রতিশ্রবম্ ॥
মুনীনামন্যথাকর্তুং সত্যমিষ্টং হি মে সদা।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্ ॥
ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ।
তদবশ্যং ময়া কার্যমৃষীণাং পরিপালনম্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১০/১৭-১৯

৩২. যস্তু রাজা স্থিতেঽধর্মে মিত্রাণামুপকারিণাম্ ।
মিথ্যা প্রতিজ্ঞাং কুরুতে কো নৃশংসতরস্ততঃ॥
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং তু গবানৃতে।
আত্মানং স্বজনং হন্তি পুরুষঃ পুরুষানৃতে ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৪/৮-৯

৩৩. ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৩১/৪

৩৪. ধিগস্তু খলু মানুষ্যং ধিগস্তু পরবশ্যতাম্।
ন শক্যং যৎ পরিত্যক্তুমাত্মচ্ছন্দেন জীবিতম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ২৫/২০
মৈবং ভূস্ত্যজ সন্তাপং কৃতঘ্ন ইব সৌহৃদম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ২/২

৩৫. নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্যাকুলাত্মনঃ।
সর্বথা ব্যবসীদন্তি ব্যসনঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ২/৬

৩৬. আকারশ্ছাদ্যমানোঽপি ন শক্যো বিনিগূহিতুম্।
বলাদ্ধি বিবৃণোত্যেব ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৭/৬৪

৩৭. দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ন্তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩৬/১১

৩৮. একো হি কুরুতে পাপং কালপাশবশং গতঃ।
নীচেনাত্মাপচারেণ কুলং তেন বিনশ্যতি ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩৮/৭

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. ত্বমেকো রক্ষসাং লোকে সত্যধর্মাভিরক্ষিতা।
নাস্তি ধর্মাভিরক্তানাং ব্যসনন্তু কদাচন ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৭/১৪৬

৪০. ন বাক্যমাত্রেণ ভবান্ প্রধানো ন কথনাৎ সৎপুরুষা ভবন্তি।
ময়ি স্থিতে ধন্বিনি বাণপাণৌ নিদর্শয়স্বাত্মবলং দুরাত্মন্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৭১/৫৮

৪১. ধর্মাৎ প্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিশ্চয়ম্ ।
ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৮৭/২১

Dhaka University Institutional Repository

অতিথি সেবা

অতিথিসেবা বা অতিথি সংস্কার সুপ্রাচীন ভারতের একটি নন্দিত এবং ধর্মীয় কৃত্য হিসেবে গৃহীত রীতি। অতিথিকে দেবতাজ্ঞান করার কথা উচ্চারিত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে – 'অতিথিদেবো ভব'। রামায়ণের যুগেও এই অতিথিসেবা আচরিত হয়েছে পরম শ্রদ্ধায়। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেক করা হলো।

অতিথি অর্চনার বিধি

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমের নিকটে কয়েকজন রূপবতী গণিকার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের দেখা হয়। রূপবতীরা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন– কাছেই আমাদের আশ্রম। ওখানে চলুন। আতিথ্যের বিধি অনুসারে আমি আপনাদের সকলের অর্চনা করব।[১] ঋষির আমন্ত্রণে সুন্দরীরা আশ্রমদর্শনে এলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বিধি অনুসারে প্রথমে তাদের অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। তারপর পথক্লান্তি দূর করার জন্য তাদের পা ধোয়ার জল দিলেন। আহারের জন্য ফল-মূল প্রভৃতি দিয়ে তাদের অর্চনা করলেন।[২] এখানে লক্ষণীয়, যিনি অতিথি অর্চনা করলেন তিনি একজন পুরুষ এবং অতিথিরা নারী। ঋষ্যশৃঙ্গ এখানে স্ত্রী-পুরষ ভেদাভেদ না করে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে অতিথির অর্চনা করেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের অবশ্য নারী-পুরুষ ভেদাভেদের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না।

রামায়ণে অতিথিসেবার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কথা দূরে থাক, বলা হয়েছে যে, কোনো তপস্বী যদি অতিথির প্রতি অন্যায় আচরণ করেন, তাহলে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো তাঁকে পরলোকে নিজের মাংস নিজেকেই খেতে হয়।[৩]

ব্রাহ্মণরূপী রাবণকে সীতার দ্বারা অতিথি সৎকার

রাবণ ব্রাহ্মণের বেশে সীতার কাছে এলে সীতা তাঁকে ব্রাহ্মণ মনে করে অতিথি সৎকার করেছিলেন। প্রথমে পা ধোয়ার জল দিয়ে আমন্ত্রণ করে আসন এনে বসতে দিয়েছেন। এরপর কুশল জিজ্ঞাসা করে সীতাদেবী ব্রাহ্মণরূপী রাবণকে বলেন– হে ব্রাহ্মণ, এই যে কুশের আসন। এতে আপনি বসুন। এই

পাদ্য গ্রহণ করুন। আর বনজাত এই তণ্ডুলের সিদ্ধ অন্ন আপনার জন্য নিবেদন করলাম। আপনি ধীরে-সুস্থে ভোজন করুন ।[৪]

রাজগৃহে মুনি-ঋষিদের আগমনে নৃপতি কর্তৃক অভিনন্দন ও সংবর্ধনা

মুনি-ঋষিরা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রাজগৃহে কোনো ঋষির আগমনকে সৌভাগ্য মনে করা হতো। বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদে স্বয়ং রাজা দশরথ সভাসদ ও পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে সানন্দে ঋষি বিশ্বামিত্রকে অভিনন্দন ও সংবর্ধনা জানিয়েছেন। সশ্রদ্ধ চিত্তে রাজা দশরথ ঋষি বিশ্বামিত্রকে অর্ঘ্য প্রদান করে বিনীতভাবে বলেন– যেমন অমৃতপ্রাপ্তি, জলহীন দেশে বর্ষণ, যেমন শাস্ত্রসম্মত যোগ্য পত্নীতে অপুত্রকদের পুত্র জন্ম, হে মহর্ষি, সেরকমই মনে হচ্ছে আপনার আগমন। হে মহামুনি, আপনাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আনন্দের সঙ্গে আপনার কোন কাজ সম্পাদন করব ?[৫]

বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশাল রাজ্যে উপস্থিত হলে বিশালরাজ সুমতি উপাধ্যায় ও বন্ধুদের নিয়ে মহর্ষিকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বিশেষভাবে অর্চনা করে বিশালরাজ বলেন– আমার রাজ্যে আপনি এসেছেন, হে মুনি, আমি ধন্য। আপনার দর্শনে আমি অনুগৃহীত। আমার রাজ্যে আপনি এসেছেন বলে মনে হচ্ছে, আমার চেয়ে অধিকতর ধন্য আর কেউ নেই।[৬]

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র মিথিলায় গমন করলে জনকরাজ কুলপুরোহিত শতানন্দকে অগ্রবর্তী করে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। ধর্মীয় বিধি অনুসারে রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অর্ঘ্য দান করেন। রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রকে বলেন– আপনাকে দেখেই বুঝতে পারলাম, দেবগণ আমার যজ্ঞকে পূর্ণ করেছেন। আপনার দর্শনেই যজ্ঞের সুফল আমি লাভ করলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আজ আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হলাম।[৭]

ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের সপত্নীক অযোধ্যায় আগমন উপলক্ষে সমস্ত অযোধ্যা নগরীকে সজ্জিত করা হয়েছিল। ধূপ জ্বালানো হয়েছিল। জলসিঞ্চন করে পথের ধূলিরাশিকে সিক্ত করা হয়েছিল। পতাকার

দ্বারা অযোধ্যা নগরীকে শোভিত করা হয়েছিল। শঙ্খ ও দুন্দুভির মঙ্গলধ্বনি বাজিয়ে রাজা দশরথ শাস্ত্রবিধান অনুসারে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন।[৮]

ভরদ্বাজ ঋষি কর্তৃক রাজপুত্র রাম-লক্ষ্মণের সংবর্ধনা

প্রজ্ঞাবান মুনি-ঋষিদের আগমনে রাজা যেমন সশ্রদ্ধ আয়োজন করতেন, মহাত্মা ঋষিগণও তাঁদের আশ্রমে রাজা কিংবা রাজপুত্রদের আগমনে অভ্যর্থনা জানাতেন। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাসকালে মহর্ষি ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে আগমন করলে ধর্মপ্রাণ ঋষি তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁদের জন্য ধেনু ও জল আনিয়েছিলেন। তাঁদের নানাবিধ অন্ন, পানীয়, বন্য ফল-মূল দিয়েছিলেন । তাঁদের থাকার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৯]

নিষাদরাজ গুহের রাম-লক্ষ্মণকে অভ্যর্থনা

বনবাসে যাওয়ার পথে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা গঙ্গার তীরে পৌঁছালে তাঁদেরকে নিষাদরাজ গুহ সাদরে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। তিনি বর্ষীয়ান। তবুও তিনি পায়ে হেঁটে এসেছিলেন অমাত্য ও আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়ে। নিষাদরাজ রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন– রাম, অযোধ্যা যেমন আপনার, তেমনি এই স্থানও আপনার বলে জানবেন। বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি ? হে মহাবীর, এই রকম প্রিয় অতিথিকে কে পেতে পারে? তারপর অনেক অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ও অর্ঘ্য দিয়ে তিনি রামচন্দ্রকে নিবেদন করে বলেন– হে বীর, আপনাকে স্বাগত জানাই। এই সম্পূর্ণ রাজ্য আপনারই। আমরা আপনার ভৃত্য মাত্র। আপনিই প্রভু। আপনিই আমাদের শাসন করুন।[১০] নিষাদরাজ গুহের এমন আন্তরিক অতিথিপরায়ণা সত্যিই প্রশংসনীয়। রাজপুত্র ভরত যখন তাঁর মাতৃগণ, অমাত্যগণ ও বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ নিষাদরাজ্যে পৌঁছেছিলেন তখন নিষাদরাজ গুহ আন্তরিকভাবে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গুহকের সার্বিক সহযোগিতায় ভরত সসৈন্য বিশাল গঙ্গা পার হয়েছিলেন।

দণ্ডকারণ্যে তপস্বীদের আশ্রমে

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা দণ্ডকারণ্যে তপস্বীদের আশ্রমে পৌঁছালে মহাভাগ ঋষিরা বিধি অনুসারে সৎকার করে তাঁদের জলদান করেছিলেন। তাঁরা পরম আনন্দের সঙ্গে ফলমূল, পুষ্প, বন্য আহার্যের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে অর্চনা করে মঙ্গল আশীর্বাদ করেছিলেন।[১১]

সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে

রামচন্দ্র-সীতা-লক্ষ্মণ যখন সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করেন তকন মুনি তাঁদের আন্তরিক বাক্যে সংবর্ধনা করেছিলেন। মুনি তাঁদের অত্যন্ত সমাদর করে তপস্বীদের যোগ্য শুদ্ধ অন্নদ্বারা অতিথি সৎকার করেছিলেন।[১২]

অগস্ত্য মুনির আশ্রমে

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অগস্ত্য মুনির আশ্রমে প্রবেশ করলে মুনি তাঁদের সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে আসন ও জলের দ্বারা অর্চনা করেন, তারপর কুশল জিজ্ঞাসা করে উপবেশন করতে বলেছিলেন। এরপর বাণপ্রস্থ ধর্মানুসারে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে অতিথিদের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে আহার্য দান করেছিলেন।

কার্তবীর্যার্জুন কর্তৃক পুলস্ত্যের সংবর্ধনা

কার্তবীর্যার্জুন পুলস্ত্যপৌত্র রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করলে মহর্ষি পুলস্ত্য কার্তবীর্যাজুনের রাজধানী মাহিষ্মতীপুরীতে এসেছিলেন। রাজা অর্জুন ঋষি পুলস্ত্যকে তাঁর রাজ্যে সমাগত দেখে সসম্ভ্রমে তাঁর বন্দনা করেন। তিনি মহর্ষি পুলস্ত্যকে মধুপর্ক, পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করে বলেন– হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনার দর্শন সুদুর্লভ। আমরা আজ আপনাকে দর্শন করলাম। তাই মাহিষ্মতীপুরী আপনার আগমনে আজ অমরাবতীতুল্য। হে দেব, আজ আমি দেববন্দনীয় আপনার চরণ বন্দনা করলাম। তাই আজ আমার তপস্যা সিদ্ধ, জন্ম সফল এবং ব্রত সুসম্পন্ন হলো। আদেশ করুন, আপনার কোন কাজ আমরা সুসম্পন্ন করব ?[১৩] এখানে উল্লেখ্য, রাজা কার্তবীর্যার্জুন রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করেন। মহর্ষি পুলস্ত্য রাবণের পিতামহ। কিন্তু কার্তবীর্যার্জুন সশ্রদ্ধায় শত্রুর পিতামহকে অতিথির মর্যাদায় সমাদর ও সৎকার করেছেন।

সমগ্র রামায়ণে অতিথিসেবাকে একটি সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে এবং এই আদর্শকে সমুন্নত রাখার সতত প্রয়াস সর্বত্র পরিদৃষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. ইহাশ্রমপাদেঽস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ।
করিষ্যে বেঽত্র পূজাং বৈ সর্বেষাং বিধিপূর্বকম্ ॥ আদিকাণ্ড, ১০/১৫

২. গতানাং তু ততঃ পূজামৃষিপুত্রশ্চকার হ।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলঞ্চ নঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১০/১৭

৩. অন্যথা খলু কাকুৎস্থ তপস্বী সমুদাচরন্ ।
দুঃসাক্ষীব পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১২/২৯

৪. ইয়ং বৃষী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতামিদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি।
ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৬/৩৬

৫. উবাচ পরমোদারো হৃষ্টস্তমভিপূজয়ন্।
যথামৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে ॥
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাঽপ্রজস্য বৈ ।
প্রণষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ ॥
তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।
কঞ্চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১৮/৫০-৫২

৬. ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতেঽস্মি যস্য যে বিষয়ং মুনে।
সংপ্রাপ্তো দর্শনং চৈব নাস্তি ধন্যতরো মম ॥ আদিকাণ্ড, ৪৭/২২

৭. দৃষ্ট্বা স নৃপতিস্তত্র বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।
অদ্য যজ্ঞসমৃদ্ধির্মে সফলা দৈবতৈঃ কৃতা ॥
অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্দর্শনান্ময়া।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতেঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব ॥ আদিকাণ্ড, ৫০/১৩-১৪

৮. ধূপিতং সিক্তসংমৃষ্টং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ পৌরাস্তে শ্রুত্বা রাজানমাগতম্ ॥
তথা চক্রুশ্চ তৎসর্বং রাজ্ঞা যৎপ্রেষিতং তদা।
ততঃ স্বলঙ্কৃতং রাজা নগরং প্রবিবেশ হ ॥
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্হ্রাদৈঃ পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভম্ ।
ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা বৈ নাগরা দ্বিজম্ ॥ আদিকাণ্ড, ১১/২৫-২৭

৯. নানাবিধানন্নরসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্ ।
তেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসং চৈবাভ্যকল্পয়ৎ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৪/১৮

১০. ঈদৃশং হি মহাবাহো কঃ প্রাপ্স্যত্যতিথিং প্রিয়ম্ ।
ততো গুণবদন্নাদ্যমুপাদায় পৃথগ্বিধম্ ॥
অর্ঘ্যং চোপানয়চ্ছীঘ্রং বাক্যং চেদমুবাচ হ।
স্বাগতং তে মহাবাহো তবেয়মখিলা মহী ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০/৩৭-৩৮

১১. ততো রামস্য সৎকৃত্য বিধিনা পাবকোপমাঃ।
আজহ্রুস্তে মহাভাগাঃ সলিলং ধর্মচারিণঃ ॥
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানা মুদা পরময়া যুতাঃ।
মূলং পুষ্পং ফলং সর্বমাশ্রমঞ্চ মহাত্মনঃ ॥
এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈরন্যৈশ্চ রাঘবম্ ।
বন্যৈশ্চ বিবিধাহারৈঃ সলক্ষ্মণমপূজয়ন্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১/১৬-১৭, ২২

১২. ততঃ শুভং তাপসযোগ্যমন্নং স্বয়ং সুতীক্ষ্ণঃ পুরুষর্ষভাভ্যাম্ ।
তাভ্যাং সুসৎকৃত্য দদৌ মহাত্মা সন্ধানিবৃত্তৌ রজনীং সমীক্ষ্য ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৭/২৪

১৩. ততস্তমৃষিমায়ান্তমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্ ।
অর্জুনো দৃশ্য সম্ভ্রান্তো ববন্দেন্দ্র ইবেশ্বরম্ ॥
স তস্য মধুপর্কং গাং পাদ্যমর্ঘ্যং নিবেদ্য চ।
পুলস্ত্যমাহ রাজেন্দ্রো হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা ॥
অদ্যৈবমমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃতা।
অদ্যাহন্তু দ্বিজেন্দ্র ত্বাং যস্মাৎ পশ্যামি দুর্দৃশম্ ॥
অদ্য মে কুশলং দেব অদ্য মে কুশলং ব্রতম্ ।
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ॥
যৎ তে দেবগণৈর্বন্দ্যৌ বন্দেঽহং চরণৌ তব।
ইদং রাজ্যমিমে পুত্রা ইমে দারা ইমে বয়ম্ ।
ব্রহ্মন্ ! কিং কুর্মঃ কিং কার্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্ ॥ উত্তরকাণ্ড,৩৩/৮-১২

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক মতবাদ

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষের মানুষ নানা মত ও পথে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসে ইহজাগতিকা, পরজাগতিকা দুই-ই আছে। আছে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরে অবিশ্বাস। আবার একই বিশ্বাসের মধ্যে আছে নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা। এ সকল মত-পথকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কালে গড়ে উঠেছে নানা দার্শনিক সম্প্রদায়। কেমন ছিল রামায়ণের যুগের মানুষের বিশ্বাস, দর্শন? এ বিষয়গুলি এখানে আলোচ্য।

বস্তুবাদ

রামায়ণের যুগে অধিকাংশ মানুষ ছিল ধর্মপ্রাণ। পরমেশ্বরে তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তখন কিছু লোক ছিল বস্তুবাদী, ইহজগৎই ছিল তাদের কাছে একমাত্র বাস্তবতা। জাবালি চরিত্রে চার্বাক দর্শন বা বস্তুবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। পিতৃসত্য পালনার্থে রামচন্দ্র ভরতের সঙ্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত জানালে মহর্ষি জাবালি রামচন্দ্রকে যা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, সে বক্তব্য ছিল বস্তুবাদী। মহর্ষি জাবালির বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো: যারা প্রত্যক্ষ ভোগাদি ত্যাগ করে কেবল ধর্ম নিয়েই থাকে, তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। অন্যদের জন্য নয়। তারা এই জীবনে দুঃখ পেয়ে মৃত্যুর পরেও আবার দুঃখ পায়। যে মানুষ অষ্টকাদি পিতৃদৈবত শ্রাদ্ধ করে তাতে কেবল অন্ন নষ্ট হয়। মৃত ব্যক্তি কি কিছু খেতে পারে? এখানে কেউ খেলে অন্যের দেহে যদি তা যায়, তাহলে প্রবাসগামী ব্যক্তির জন্যও গৃহে শ্রাদ্ধ হতে পারে। তখন পথে তার আর খাবার প্রয়োজন হবে না। চালাক মেধাবী ব্যক্তিরাই দানযজ্ঞ ইত্যাদির ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন– যজ্ঞ করো, দান করো, দীক্ষা নাও, তপস্যা করো, ত্যাগ করো। মূলত পরলোক বলে কিছু নেই। যা প্রত্যক্ষ তাই গ্রহণ করো। পরোক্ষকে পেছনে রাখো। জাবালি রামচন্দ্রকে বাস্তববোধে উজ্জীবিত হয়ে ভরতের নিবেদিত প্রস্তাবিত রাজ্য গ্রহণ করতে বলেন।[১]

ন্যায় দর্শন

বস্তুবাদী বক্তব্য ব্যতিরেকে নৈয়ায়িক যুক্তিও সেখানে দৃষ্ট। সীতা হরণকালে জটায়ু রাবণকে বলেছে– যেমন ন্যায় দর্শনের হেতুবাদের দ্বারা চিরন্তন বেদশ্রুতিকে ব্যর্থ করা যায় না, তেমন আমার চোখের

সামনে সীতাকে তুমি জোর করে হরণ করতে পার না।[২] এখানে সেকালে ন্যায়দর্শন চর্চার একটা স্বাভাবিক পরিমণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়, যা কথাচ্ছলে উপমায় এসেছে।

কর্মফল

সকল মানুষের কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস ছিল। যে যেমন কর্ম করে, তাকে তেমন কর্মফল ভোগ করতে হয়। এই বিশ্বাস রামায়ণের প্রধান চরিত্র রামচন্দ্র হতে আরম্ভ করে দশরথ, কৌসল্যা, সীতা, হনুমান, জটায়ু, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, মন্দোদরী সবার ছিল। সবাইকে কর্মফলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। রামচন্দ্রের বনগমনের পর পুত্রশোকে বিধ্বস্ত হয়েছেন কৌসল্যা ও দশরথ। দশরথ শোকের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন, তাঁরই পূর্বকৃত পাপকর্ম মুনিকুমারের জীবন বিনাশের কারণে জীবনে নেমে এসেছে পুত্রশোক। তিনি সে কর্মফলের কথা বিশ্বাস করে রাণী কৌসল্যাকে বলেন– হে কল্যাণী, মানুষ ভালো ও মন্দ যা যা করে, সে অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করে। সম্যক্ মোহবশত বালক যেমন বিষ খায়, তেমনি আমার নিজকৃত পাপকর্মফলে এই দুঃখ উপস্থিত হয়েছে।[৩]

পঞ্চবটীতে অবস্থানকালে খরের সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধের সময় রামচন্দ্র খরকে বলেন– যথাকালে বৃক্ষ যেমন ঋতুজনিত ফুল পর্যায়ক্রমে পেয়ে থাকে, তেমনি পাপকর্তা অবশ্যই পাপের ফল পেয়ে থাকে। ওরে রাক্ষস, বিষমিশ্রিত অন্নভোজনের ফল পেতে যেমন বিলম্ব হয় না, তেমনি জগতে পাপকর্মের ফল পেতে দেরি হয় না।[৪] সীতাদেবীকে হরণকালে সীতাদেবী রাবণকে সতর্ক করে বলেন– তোমার চেতনা কালের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। তাই তুমি এই পাপকর্ম করছ। রামের কাছ থেকে এই পাপকর্মের ফল তুমি পাবে। তোমার বিনাশ হবে।[৫] সীতা হরণের পর রামচন্দ্র বিলাপ করে লক্ষ্মণকে বলেন– মনে হয় পৃথিবীতে আমার মতো পাপকর্মকারী দ্বিতীয় কেউ নেই। পূর্বে আমি নিশ্চয়ই অনেক পাপকর্ম করেছি। সেই কর্মফলে আমি দুঃখের পর দুঃখে প্রবেশ করছি। একের পর এক শোক এসে আমার হৃদয় ও মনকে বিদীর্ণ করছে।[৬] রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরী বিলাপ করে বলেন– যারা সৎকর্ম করে, তারা শুভফল লাভ করে। আর যারা পাপকর্ম করে, তারা অশুভ ফল ভোগ করে। বিভীষণ সৎকর্মের ফল পেল। আর তুমি পাপকর্মের ফল লাভ করলে।[৭]

ক্ষণস্থায়ী জগৎ

জগতের স্থায়িত্বে সে যুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল না। তাদের কাছে এ জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী। এ সম্পর্কে রামচন্দ্র ভরতকে বলেছেন– পৃথিবীতে সবকিছুই পরিণামে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সম্যগ্‌ভাবে যার সমুন্নতি হয়েছে, পরিণামে তারও পতন হবে। সকল মিলনেরই অন্তে রয়েছে বিচ্ছেদ। জীবনের পরিণামে মৃত্যু। যেমন ফল পেকে গেলে গাছ থেকে পড়ে যাওয়া ছাড়া ভয় নেই, তেমনি যে মানুষ জন্মেছে, তার মরণ ছাড়া আর কোনো ভয় নেই। ছয় স্তম্ভযুক্ত গৃহ যেমন একদিন জীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, তেমনি মানুষও জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হয়। যে রাত চলে যায়, সে তো আর ফেরে না। যমুনার পূর্ণ জলরাশি সমুদ্রের দিকেই চলে যায়। আর গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণ যেমন দ্রুত জলকে শোষণ করে, তেমনি চলিষ্ণু দিবারাত্র সকল প্রাণীরই আয়ুকে ক্ষয় করছে। মৃত্যু জীবমাত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে চলে। জীবের সঙ্গেই উপবেশন করে। জীবের সঙ্গে দীর্ঘপথ চলে তারই সঙ্গে নিবৃত্ত হয়। দিনে সূর্য উঠলে এবং অস্ত গেলে মানুষ আনন্দিত হয়। কিন্তু নিজের জীবনের ক্ষয় মানুষ বুঝতে পারে না।[৮]

দুঃখ পাওয়া মানুষের জীবনে সাধারণ ঘটনা

সুখ-দুঃখ নিয়েই মানব জীবন। সুখের পরে দুঃখ কিংবা দুঃখের পরে সুখ – এই তো জীবনের ধর্ম। সীতা হরণের পর লক্ষ্মণ শোক-সন্তপ্ত রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– কোন প্রাণীর না আপদ আসে? হে রাজা, আপদ আগুনের মতো সবাইকে স্পর্শ করে। ক্ষণকাল পরে আবার চলেও যায়। দুঃখ পাওয়া মানুষের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা। নহুষের পুত্র যযাতি ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন। নীতিহীন হওয়ায় দুঃখ তাকে স্পর্শ করেছিল। মহর্ষি বসিষ্ঠের একদিনেই শতপুত্র জন্মেছিল, আবার একদিনেই সকলে মারা গিয়েছিল। এ জগতে সবারই যিনি মাতা, সবাই যাঁকে নমস্কার করে– সেই বসুন্ধরারও কম্পন দেখা যায়।[৯]

সবাই দৈবের অধীন

এ সংসারে সবাই দৈবের অধীন। বনগমনকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– আমার রাজ্যলাভ, নিবৃত্তি এবং নির্বাসনে দৈবই কারণ। মাতা কৈকেয়ী স্বীয় পুত্র ভরত ও আমাকে সমান স্নেহ করেন। এখন তিনিই আমার অভিষেক নিবৃত্তির এবং নির্বাসনের জন্য যে তীব্র দুর্বাক্য বলেছেন, তা

দৈব কারণ ছাড়া আর কিছুই মনে করছি না।[১০] লক্ষ্মণ আবার রামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– যা চিন্তার অতীত এবং কোনো প্রাণীর দ্বারাই যার প্রতিবিধান করা যায় না, তাই হলো দৈব। দেহধারী মানুষ এবং সাধারণ প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, দেবতা এবং অত্যন্ত মহান প্রাণীরাও দৈবের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেন না।[১১] জগতে বিধাতাই সব কিছু ঠিক করে রেখেছেন। বিধাতার দ্বারা ব্যবস্থাপিত সুখ-দুঃখ মানুষ অতিক্রম করতে পারে না। ত্রিলোক তাঁরই বশীভূত। তাঁর বিহিত বিধান কেউ অতিক্রম করতে পারে না।[১২] বালীর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী তারাকে সান্ত্বনা দিয়ে রামচন্দ্র একথা বলেন।

জীবনের সর্বত্রই কালের একটি প্রভাব আছে

কাল বিবেচনা না করে কাজ করলে ক্ষতি হয়। জটায়ু রামচন্দ্রকে বলেছেন– রাবণ যে মুহূর্তে সীতাকে নিয়ে গেছে, সেই মুহূর্তকে বলা হয় বিন্দ। সেই সময় ধন হারিয়ে গেলে ধনস্বামী সত্বর সেটি খুঁজে পায়। হে রাম, ঐ মুহূর্তটি যে বিন্দ, রাবণ তা জানতে পারে নি। বড়শি গিলে ফেললে মাছ যেমন দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি তোমার প্রিয়া জানকীকে হরণ করে রাবণও দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৩] এখানে বিন্দ বিশেষ একটি মুহূর্ত। রাবণকে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের সম্মুখীন দেখে বিভীষণ তাঁকে এই কালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাল বিবেচনা না করে কাজের ফলে রাবণের ধ্বংস অনিবার্য। কালের বশীভূত হলে বীর, বলবান এবং অস্ত্রনিপুণ মানুষেরাও যুদ্ধে বালুকার তৈরি সেতুর মতো ধ্বংস হয়ে যায়।[১৪] দেশকাল বিচার করে কাজ না করলে ফলটি বিপরীত হয়ে যায়। সংস্কারবিহীন অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দিলে তা যেমন দুঃখেরই কারণ হয়ে থাকে।[১৫] কুম্ভকর্ণ রাবণকে একথা বলেন তাঁর কুকর্মের পরিণতি সম্পর্কে। তিনি আরও বলেন– নীতিজ্ঞ ব্যক্তি কাল বিচার করে ধর্ম, অর্থ এবং কাম সবই সেবা করেন। কিংবা কাল বিবেচনা করেই তিনটি দ্বন্দ্ব তথা ধর্ম-অর্থ, অর্থ-ধর্ম এবং কাম-অর্থ সেবা করা উচিত।[১৬]

কালই মানুষের পরম আশ্রয়

কাল নিজেও কালকে অতিক্রম করতে পারে না। ক্ষীণও হয় না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে কাল তার বন্ধুত্বের জন্য কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় না। কালের কাছে বন্ধুত্ব নেই। নেই কোনো হেতু ও পরাক্রম। মিত্র ও জ্ঞাতির কোনো সম্বন্ধ কালের সঙ্গে নেই। তার কারণ সে নিজেরও বশে নেই। সজ্জনেরা তাই

বলেন– সবকিছু কালের পরিণাম। ধর্ম, অর্থ এবং কাম কালের ক্রম অনুসারে সাজানো থাকে।[১৭] বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে রামচন্দ্র এরূপভাবে নিয়তি ও কালের পরিণাম সম্পর্কে বলেছেন।

উৎসাহই কার্যসাফল্যের পরমশক্তি

উৎসাহই পরম শক্তি। উৎসাহের চেয়ে অধিকতর শক্তি আর কোনো কিছুই নেই। উৎসাহী ব্যক্তিরা কখনো অবসন্ন হন না। সীতা হরণের পর শোকাহতচিত্ত রামকে লক্ষ্মণ বোঝালেন, একমাত্র উৎসাহকে আশ্রয় করেই আমরা জানকীকে ফিরে পাব।[১৮] উৎসাহই ঐশ্বর্যের মূল। উৎসাহেই পরম সুখ। উৎসাহই সকল অভীষ্ট বিষয়ে সকলকে প্রবর্তিত করে। জীব যে কাজ করে থাকে, উৎসাহ সেই কাজকেই সফল করে থাকে।[১৯] সীতাকে লঙ্কায় খোঁজ করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে এই উৎসাহের কথা হনুমান বলেছেন। লঙ্কায় পৌঁছে বিভিন্ন জায়গায় সীতাকে অন্বেষণ করে না পেয়ে হনুমান প্রথমে বিষাদগ্রস্ত হন। কিন্তু হনুমান ভেঙ্গে না পড়ে উৎসাহের সাথে আবার সীতা অন্বেষণ শুরু করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। যার উৎসাহ নেই, যে দীন, যে নিজেকে শোকে ব্যাকুল করে ফেলে সে সর্বপ্রকারেই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দুঃখ পেয়ে থাকে।[২০] সীতার জন্য শোকাকুল রামচন্দ্রকে উৎসাহিত করার জন্য সুগ্রীব একথা বলেছেন।

বীর্যহীন, ক্লীব মানুষেরা দৈবকে অনুসরণ করে

সবকিছু যেমন দৈবাধীন তেমনি পুরুষকারকেও অস্বীকার করা হয় নি। যথাসময়ে পুরুষকার প্রদর্শন করা উচিত। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বনগমনের বিরুদ্ধে দৈবকে অস্বীকার করে পুরুষকার প্রদর্শনের কথা বলেছেন।– যাঁরা বীর এবং আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন, তাঁরা কখনো দৈবকে উপাসনা করেন না। যিনি পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে প্রতিহত করতে সমর্থ, দৈবের দ্বারা বিপন্ন হলেও সেই ব্যক্তি নিরুৎসাহ হন না।[২১]

কর্মফল ভোগ

সবাইকে কর্মফল ভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগের কথা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। কুবের দুর্মতি রাবণকে উপদেশ দিয়েছেন– যে মাতা-পিতা, ব্রাহ্মণ ও আচার্যকে অবমাননা করে, সে যমের বশীভূত

হয়ে সেইমতো কৃতকর্মের ফলভোগ করে। অনিত্য এই শরীর পেয়ে যে তপস্যার ফল অর্জন করে না, সেই মূঢ় ব্যক্তি মৃত্যুর পরে যখন তার কৃতকর্মের ফল পায়, তখন সে অনুশোচনাক্লিষ্ট হয়। রাজ্য, সম্পদ তথা ধন এবং সুখলাভ ধর্ম থেকেই হয়। অধর্ম থেকে কেবল দুঃখ লাভই হয়ে থাকে। তাই সুখের নিমিত্ত তুমি ধর্মাচরণ করো। পাপাচার থেকে বিরত হও। পাপের পরিণাম কেবলই দুঃখ। জগতে তা নিজেকেই ভোগ করতে হয়। তাই যে মূঢ় পাপ কার্য করে, প্রকারান্তরে সে নিজেকেই হত্যা করে। স্বেচ্ছামাত্র কোনো দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরই শুভবুদ্ধির উদয় হয় না। সে যেমন কর্ম করে, তেমন ফলই লাভ করে। সংসারে মনুষ্যগণ সমৃদ্ধি, মনোহর রূপ, বল, পুত্র-কন্যা, বৈভব ও বীরত্ব পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই লাভ করে।[২২]

অর্থই মানুষকে সুখ এনে দেয়

অর্থই অনর্থের মূল, এ কথা বহুশ্রুত। কিন্তু বাস্তবতা বড় কঠিন। অর্থ না থাকলে কিছু হয় না। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে বলা হচ্ছে যার অর্থ আছে, তার বন্ধু আছে। যার অর্থ আছে তার মিত্রও আছে। অর্থশালী ব্যক্তিই পণ্ডিত, সেই পুরুষ। যার অর্থ আছে সে পরাক্রমী। সেইই বুদ্ধিমান। ভাগ্যবান সে। যার অর্থ আছে সেই অধিক গুণবান। যার অর্থ আছে– ধর্ম, কাম ও অর্থ এই ত্রিবর্গ তার অনুকূল। ধন নেই যার, সে চেষ্টা করলেও অর্থ কামাদি লাভ করতে পারে না।[২৩] ইন্দ্রজিতের দ্বারা মায়াসীতা বধ হলে, সীতাদেবীর শোকে রামচন্দ্র মূর্ছা যান। লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নব উদ্যমে যুদ্ধ করার জন্য এ কথাগুলি বলেন। অর্থ না থাকলে শুধু ধর্ম দিয়ে যে মানুষের কোনো কাজ হয় না এবং ধর্মীয় অনুশাসনের ভিতই নড়বড়ে হয়ে যায়, একথা লক্ষ্মণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই লঙ্কাযুদ্ধের এক শোচনীয় মুহূর্তে লক্ষ্মণের এ আক্ষেপময় বাক্যগুলি জাগতিক দর্শনকেই সমর্থন করে।

এভাবে নানা দিক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই– রামায়ণের যুগের মানুষের বিবিধ বিশ্বাস, মত-পথ, দর্শন ছিল। এটাই স্বাভাবিক। অবস্থানুযায়ী তাঁরা সবকিছু বিচার করেছেন এবং জীবনের নানা সঙ্কট থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১. অর্থ-ধর্মপরা যে তাংস্তান্ শোচামি নেতরান্ ।
তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে ॥
অষ্টকাপিতৃদৈবত্যমিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিমশিষ্যতি ॥
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি ।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যশনং ভবেৎ ॥
দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥
স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে ।
প্রত্যক্ষং যৎ তদা তিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু ॥
সতাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্বলোকনিদর্শিনীম্ ।
রাজ্যং ত্বং প্রতিগৃহ্লীষ্ব ভরতেন প্রসাদিতঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৮/১৩-১৮

২. ন শক্তস্ত্বং বলাদ্ধর্তুং বৈদেহীং মম পশ্যতঃ ।
হেতুভির্ন্যায়সংযুক্তৈর্ধ্রুবাং বেদশ্রুতিমিব ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৫০/২২

৩. যদাচরতি কল্যাণি শুভং বা যদি বাঽশুভম্ ।
তদেব লভতে ভদ্রে কর্তা কর্মজমাত্মনঃ ॥
তদিদং ম্ঽনুসংপ্রাপ্তং দেবি দুঃখং স্বয়ংকৃতম্ ।
সম্মোহাদিহ বালেন যথা স্যাদ্ভক্ষিতং বিষম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৩/৬, ১২

৪. অবশ্যং লভতে কর্তা ফলং পাপস্য কর্মণঃ ।
ঘোরং পর্যাগতে কালে দ্রুমঃ পুষ্পমিবার্তবম্ ॥
ন চিরাৎ প্রাপ্যতে লোকে পাপানাং কর্মণাং ফলম্ ।
সবিষাণামিবান্নানাং ভুক্তানাং ক্ষণদাচর ॥ অরণ্যকাণ্ড, ২৯/৮-৯

৫. ত্বং কর্ম কৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ ।
জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদ্ ব্যসনমাপ্নুহি ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৯/২৮

৬. ন মদ্বিধো দুষ্কৃতকর্মকারী মন্যে দ্বিতীয়োঽস্তি বসুন্ধরায়াম্ ।
শোকানুশোকো হি পরম্পরায়া মামেতি ভিন্দন্ হৃদয়ং মনশ্চ ॥
পূর্বং ময়া নূনমভীপ্সিতানি পাপানি কর্মাণ্যসকৃৎকৃতানি ।
তত্রায়মদ্যাপতিতো বিপাকো দুঃখেন দুঃখং যদহং বিশামি ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬৩/৩-৪

৭. শুভকৃচ্ছুভমাপ্নোতি পাপকৃৎ পাপমশ্নুতে ।
বিভীষণঃ সুখং প্রাপ্তস্ত্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১১/২৬

৮. সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥

যথা ফলানাং পক্বানাং নান্যত্র পতনাদ্ ভয়ম্ ।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ ভয়ম্ ॥
যথাগারং দৃঢস্থূণং জীর্ণং ভূত্বাঽবসীদতি।
তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ ॥
অত্যেতি রজনী যাতু সা ন প্রতিনিবর্ততে।
যাত্যেব যমুনাপূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্ ॥
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ুংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৫/১৬-২০

৯. আশ্বসিহি নরশ্রেষ্ঠ প্রাণিনঃ কস্য নাপদঃ।
সংস্পৃশন্ত্যগ্নিবদ্ রাজন্ ক্ষণেন ব্যপযান্তি চ ॥
দুঃখিতো হি ভবাঁল্লোকাংস্তেজসা যদি ধক্ষ্যতে।
আর্তঃ প্রজা নরব্যাঘ্র ক্ব নু যাস্যন্তি নির্বৃতিম ॥
লোকস্বভাব এবৈষ যযাতির্নহুষাত্মজঃ ।
গতঃ শক্রেণ সালোক্যমনয়স্তং সমস্পৃশৎ ॥
মহর্ষির্যো বসিষ্ঠস্তু যঃ পিতুর্নঃ পুরোহিতঃ ।
অহ্না পুত্রশতং জজ্ঞে তথৈবাস্য পুনর্হতম্ ॥
যা চেয়ং জগতো মাতা সর্বলোকনমস্কৃতা।
অস্যাশ্চ চলনং ভূমের্দৃশ্যতে কোশলেশ্বর ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬৬/৬-১০

১০. কৈকেয্যাঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মম বেদনে।
যদি ত্বয়া ন ভাবেঽয়ং কৃতান্তবিহিতো ভবেৎ ॥
জানামি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমান্তরম্ ।
ভূতপূর্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সুতেঽপি বা ॥
সোঽভিষেকনিবৃত্ত্যর্থৈঃ প্রবাসার্থৈশ্চ দুর্বচৈঃ ।
উগ্রৈর্বাক্যৈরহং তস্যা নান্যদ্দৈবাৎ সমর্থয়ে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ২২/১৬-১৮

১১. সুমহান্ত্যপি ভূতানি দেবাশ্চ পুরুষর্ষভ।
ন দৈবস্য প্রমুঞ্চন্তি সর্বভূতানি দেহিনঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬৬/১২

১২. মা বীরভার্যে বিমতিং কুরুষ্ব লোকে হি সর্বো বিহিতো বিধাত্রা।
তং চৈব সর্বং সুখদুঃখযোগং লোকেঽব্রবীত্তেন কৃতং বিধাত্রা ॥
ত্রয়েঽপি লোকা বিহিতং বিধানং নাতিক্রমন্তে বশগা হি তস্য। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৪/৪২-৪৩

১৩. যেন যাতি মুহূর্তেন সীতামাদায় রাবণঃ।
বিপ্রনষ্টং ধনং ক্ষিপ্রং তৎস্বামী প্রতিপদ্যতে ॥
বিন্দো নাম মুহূর্তেঽসৌ ন চ কাকুৎস্থ সোঽবুধৎ।
ত্বৎপ্রিয়াং জানকীং হৃত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
ঋষবদ্বড়িশং গৃহ্য ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬৮/১২-১৩

১৪. শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ নরা রণে।
কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/২৪

Dhaka University Institutional Repository

১৫. দেশ-কালবিহীনানি কর্মাণি বিপরীতবৎ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতেষ্বিব ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/৬

১৬. ধর্মমর্থং হি কামং বা সর্বান্ বা রক্ষসাং পতে।
ভজেত পুরুষঃ কালে ত্রীণি দ্বন্দ্বানি বা পুনঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/৯

১৭. ন কর্তা কস্যচিৎ কশ্চিন্নিয়োগে নাপি চেশ্বরঃ।
স্বভাবে বর্ততে লোকস্তস্য কালঃ পরায়ণম্ ॥
ন কালঃ কালমত্যেতি ন কালঃ পরিহীয়তে।
স্বভাবঞ্চ সমাসাদ্য ন কিঞ্চিদতিবর্ততে ॥
ন কালস্যাস্তি বন্ধুত্বং ন হেতুর্ন পরাক্রমঃ।
ন মিত্রজ্ঞাতিসম্বন্ধঃ কারণং নাত্মনো বশঃ ॥
কিং তু কালপরীণামো দ্রষ্টব্যঃ সাধু পশ্যতা।
ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ কালক্রমসমাহিতাঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৫/৫-৮

১৮. উৎসাহো বলবানার্য নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্ ।
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥
উৎসাহবন্তঃ পুরুষা নাবসীদন্তি কর্মসু।
উৎসাহমাত্রমাশ্রিত্য প্রতিলপ্স্যাম জানকীম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১/১২১-১২২

১৯. অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলমনির্বেদঃ পরং সুখম্ ।
ভূয়স্তত্র বিচেষ্যামি ন যত্র বিচয়ঃ কৃতঃ ॥
অনির্বেদো হি সততং সর্বার্থেষু প্রবর্তকঃ।
করোতি সফলং জন্তোঃ কর্ম যচ্চ করোতি সঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১২/১০-১১

২০. নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্যাকুলাত্মনঃ।
সর্বথা ব্যবসীদন্তি ব্যসনঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ২/৬

২১. বিক্লবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্যুপাসতে ॥
দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্ ।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ২৩/১৬-১৭

২২. মাতরং পিতরং বিপ্রমাচার্যঞ্চাবমন্যতে।
স পশ্যতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ ॥
অধ্রুবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোর্জনম্ ।
স পশ্চাত্তপ্যতে মূঢ়ো মৃতো গত্বাত্মনো গতিম্ ॥
ধর্মাদ্ রাজ্যং ধনং সৌখ্যমধর্মাদ্দুঃখমেব চ ।
তস্মাদ্ধর্মং সুখার্থায় কুর্যাৎ পাপং বিসর্জয়েৎ ॥
পাপস্য হি ফলং দুঃখং তদ্ ভোক্তব্যমিহাত্মনা ।
তস্মাদাত্মাপঘাতার্থং মূঢ়ঃ পাপং করিষ্যতি ॥
কস্যচিন্ন হি দুর্বুদ্ধেশ্ছন্দতো জায়তে মতিঃ ।
যাদৃশং কুরুতে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে ॥ উত্তরকাণ্ড, ১৫/২১-২৫

Dhaka University Institutional Repository

২৩. যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥
যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্ ।
যস্যার্থাঃ স মহাভাগো যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ ॥
যস্যার্থা ধর্মকামার্থাস্তস্য সর্বং প্রদক্ষিণম্ ।
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যো বিচিন্বতা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৮৩/৩৫-৩৬, ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতি-অস্থিতি, সফলতা-অসফলতার ওপর একটি সমাজ তথা রাষ্ট্রের দৃঢ়তা এবং দুর্বলতা নির্ভর করে। অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরই মানুষের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। রামায়ণের যুগে অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল বলে অনুমিত। রামরাজ্যে সমৃদ্ধি ও শান্তির কোনো অভাব ছিল না। রাবণের লঙ্কা নগরী অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি স্বচ্ছল ছিল। রাজা দশরথের রাজ্য পরিচালনাকালে অযোধ্যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থাকলেও একেবারে দারিদ্রমুক্ত ছিল না। রামচন্দ্র বনগমনকালে তাঁর দান গ্রহণ করতে গর্গবংশীয় ত্রিজট নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। তিনি বনে মাটি খুঁড়ে মূলাদি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর পরিধেয় ছিল ছিন্ন বস্ত্র। উল্লেখ্য, রামচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে তিনি নির্বিঘ্নেই এসেছিলেন। কেউ তাঁকে বাধা দেয় নি। রামচন্দ্রকে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন– হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমি নির্ধন। আবার আমার অনেক পুত্র। বনে মাটি খুঁড়ে কন্দমূলাদি সংগ্রহ করে তার দ্বারাই আমি জীবিকা নির্বাহ করি।[১] ব্রাহ্মণ, বন্ধু, ভৃত্যদের সঙ্গে রামচন্দ্র দরিদ্র ও ভিক্ষুকদেরও সম্মান, দান ও সমাদর করেছেন।[২] রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় গরিব ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। দরিদ্র দ্বিজকে তিনি পরিধানের উত্তম অলঙ্কার দান করেন।[৩] উত্তরকাণ্ডে সর্বার্থসিদ্ধ নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি অসময়ে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে ভিক্ষা না পেয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।[৪]

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি মূলত কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি। জনকশাসিত মিথিলা রাজ্য কৃষিক্ষেত্রে উৎকর্ষসাধনে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। রাজর্ষি জনক স্বয়ং স্বহস্তে হলকর্ষণ করতেন। রামচন্দ্র ভরতকে রাজনৈতিক উপদেশ দিতে গিয়ে প্রশ্ন করেছেন– কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য দ্বারা রাজ্য সমৃদ্ধ হচ্ছে তো? চাষী এবং গয়লাদের প্রতি তুমি দয়ালু আছ তো? বাণিজ্যের সাথে যারা যুক্ত তারা সুখে আছে তো?[৫] মূলত রাজা বণিকদের সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা করে দিতেন। বাণিজ্যের উন্নতি রাজার সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি রাষ্ট্রের কোনো অপব্যবস্থায় বণিকের উন্নতি প্রতিহত হতো, তাহলে এর জন্য রাজা দায়ী হতেন। রাজসভায় বণিকদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। রাজ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বণিকদের রাজসভায় নিমন্ত্রণ করা হতো। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় অযোধ্যার বণিকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। শুধু বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা না করে সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর জলদ্বারা চাষাবাদ করা হতো। এ প্রসঙ্গে রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করেছেন, বৃষ্টির জন্য বসে না থেকে নদীর জলেই কৃষিকার্যাদি হচ্ছে তো ?[৬]

সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশুপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রামায়ণের যুগে পশুপালনকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো। গরু, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর নিরাপদ আশ্রয় ও তাদের সেবার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।[৭] অযোধ্যা অশ্ব ও হস্তিসম্পদে পূর্ণ ছিল এবং সে অশ্ব ও হস্তী উন্নত জাতের ছিল। কম্বোজ, বাহ্লীক, বনায়ু এবং সিন্ধুদেশজাত উত্তমশ্রেণির অশ্ব ছিল অযোধ্যায়। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য উন্নত ছিল অযোধ্যার অশ্বগুলি।[৮] বিন্ধ্যাচল এবং হিমালয়জাত অতি শক্তিশালী মদমত্ত হস্তীদ্বারা পূর্ণ ছিল অযোধ্যানগরী। ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন, বামন প্রভৃতি প্রখ্যাত হস্তিবংশে জাত ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ এবং ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ, মৃগমন্দ্র প্রভৃতি হস্তীর দ্বারা অযোধ্যা নগরী পরিপূর্ণ ছিল।[৯] এর দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, দশরথের শাসনকালে বিভিন্ন রাজ্য থেকে অযোধ্যায় পশু আমদানি করা হতো।

রামায়ণে গ্রাম ও জনপদের বর্ণনা খুব বেশি নেই। বরং কয়েকটি বৃহৎ নগর অযোধ্যা, মিথিলা, লঙ্কার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলত সে যুগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন আকারের নগরের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অযোধ্যা, মিথিলা, লঙ্কা এ নগরগুলি বিশ্বজনীনশহর (কসমোপলিটন সিটি) হিসেবে বিকাশ লাভ করেছিল। বিশেষ করে অযোধ্যা ও লঙ্কানগরী ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। উভয় নগরীতে বাস্তুবিদ্যার মনোরম নিদর্শন পরিলক্ষিত। 'নগরায়ণ' পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রামে কৃষিবিস্তার এবং নগরে সাধারণত বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। কোশলরাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম ও জনপদে এবং মিথিলায় কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। অযোধ্যানগরে অনেক ধনী বণিকের বাস ছিল। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে অযোধ্যার বণিকেরা রাজকীয়ভাবে তাঁদের বিপণীগুলি নানা মূল্যবান পণ্যে সজ্জিত করেছিলেন।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১. স রামমাসাদ্য তদা ত্রিজটো বাক্যমব্রবীৎ।
নির্ধনো বহুপুত্রোঽস্মি রাজপুত্র মহাবল ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩২/৩৪

২. দ্বিজঃ সুহৃদ্ভৃত্যজনোঽথবা তদা দরিদ্রভিক্ষাচরণশ্চ যো ভবেৎ।
ন তত্র কশ্চিন্ন বভূব তর্পিতো যথার্হসম্মানদানসংভ্রমৈঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩২/৪৫

৩. জাম্বুনদং কোটিসংখ্যং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তদা।
দরিদ্রায় দ্বিজায়াথ হস্তাভরণমুত্তমম্ ॥ আদিকাণ্ড, ১৪/৫৪

৪. ময়া দত্তপ্রহারোঽয়ং ক্রোধেনাবিষ্টচেতসা।
ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতভৈক্ষকে ॥ উত্তরকাণ্ড, প্রক্ষিপ্ত ১২/২৮

৫. কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্বে কৃষি গোরক্ষজীবিনঃ।
বার্তায়াং সংস্থিতস্তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৪৭

৬. অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জিতঃ।
পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৪৫

৭. প্রহৃষ্টনরনারীকঃ সমাজোৎসবশোভিতঃ।
সুকৃষ্টসীমাপশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জিতঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৪৪

৮. কাম্বোজবিষয়ে জাতৈর্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ।
বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৬/২২

৯. বিন্ধ্যপর্বতজৈর্মত্তৈঃ পূর্ণা হৈমবতৈরপি।
মদান্বিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্বতোপমৈঃ ॥
ঐরাবতকুলীনৈশ্চ মহাপদ্মকুলৈস্তথা।
অঞ্জনাদপি নিষ্ক্রান্তৈর্বামনাদপি চ দ্বিপৈঃ ॥
ভদ্রৈর্মন্দ্রৈর্মৃগৈশ্চৈব ভদ্রমন্দ্রমৃগৈস্তথা।
ভদ্রমন্দ্রৈর্ভদ্রমৃগৈর্মৃগমন্দ্রৈশ্চ সা পুরী ॥ আদিকাণ্ড, ৬/২৩-২৫

১০. নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ।
কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধেষু শ্রীমৎসু ভবনেষু চ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬/১২

Dhaka University Institutional Repository

বৃত্তি

জীবন-জীবিকার জন্য মানুষকে নানা পেশা বা বৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। বিভিন্ন বৃত্তির সমন্বয়েই একটি সমাজের পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ভারতে সমাজের লোকেরা নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল, রামায়ণে তার পরিচয় মেলে। রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনগমনকালে ভরতের সঙ্গে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত প্রজারা তাঁর অনুগমন করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন মণিকার, শুভকর্মকারী কুম্ভকার, সূত্রকর্মনিপুণ পরিমাপক, শস্ত্রনির্মাণকারী, ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে পাখা প্রভৃতি নির্মাণকারী, করাতকর্মী, মণিমুক্তাদি ছিদ্র করতে পারে এমন সব শিল্পী, কাচশিল্পী, দন্তব্যবসায়ী, চুনকাম করার মিস্ত্রি, গন্ধবণিক, প্রখ্যাত স্বর্ণকার, কম্বল তৈরির শিল্পী, যারা স্নান করাতে পারে এমন স্নাপক, জল গরম করার লোক, চিকিৎসক, ধূপব্যবসায়ী, মদ্যব্যবসায়ী, রজক, তন্তুবায় তথা সেলাই করার শিল্পী, গাঁয়ের মোড়ল, স্ত্রীদের নিয়ে অভিনেতারা, জেলে, সমাহিতচিত্ত বেদজ্ঞ পূতচরিত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি।[১]

ভরতের নির্দেশে অযোধ্যা থেকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিভিন্ন দক্ষ শিল্পী রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা পূর্তবিদ্যা ও বাস্তুশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। যেমন– মৃত্তিকাপরীক্ষক, সূত্র দিয়ে পরিমাপকারী, খনন-পটু শক্তিশালী খনক এবং যন্ত্রপরিচালনায় বিশেষজ্ঞ কর্মীরা।[২] রাজপথ নির্মাণে বিভিন্ন শ্রেণির দক্ষ কর্মীদের উল্লেখ এখানে লক্ষণীয়। এছাড়া রাজপথ নির্মাণে আরও যারা সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরা হলেন– দিনমজুর, স্থপতি, যন্ত্রনির্মাণকুশলী, বর্ধক তথা গর্ত ভরাটকর্মের কর্মী, পথের পাহারাদার, গাছ কাটার লোক, পাচক, চুনকাম করার লোক, বাঁশের ও চামড়ার কাজ জানে এমন লোক।[৩] বড়শি দিয়ে মাছ ধরারও উল্লেখ রয়েছে।[৪]

মূলত সমাজের মানুষের বৃত্তি যত বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়, সমাজ তত স্বনির্ভর হয়। তখন বেকার সমস্যাও অনেকটা দূরীভূত হয়। নিষাদরাজ গুহ স্থাপত্যবিদ্যায় অর্থাৎ সায়েন্স অব আর্কিটেক্টে পারদর্শী ছিলেন।[৫] নিষাদরাজ গুহের শক্তিশালী নদীরক্ষাবাহিনী ছিল। তাঁরা ছিলেন মূলত নৌবাহিনীর সৈনিক। গঙ্গা নদীর তীরে ভরতের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে নিষাদরাজ গুহ আশঙ্কা করেছিলেন, ভরত রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য এসেছেন। রামচন্দ্রের বন্ধু গুহ তাই তাঁর নৌবাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গঙ্গাতীরে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৬] নৌকায় নদী পার হওয়ার জন্য মাঝিরা কাজ করতেন। মাঝিকে বলা হতো কর্ণাগ্রহ।[৭] ক্ষৌরকর্মে পারদর্শী নাপিতের উল্লেখও আছে। রামচন্দ্রের

রাজ্যাভিষেকের পূর্বে শত্রুঘ্নের আজ্ঞায় দক্ষ নাপিতেরা নিপুণ হস্তে রামচন্দ্রের ক্ষৌর কর্ম সম্পাদন করেছিলেন।[৮]

বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে সাধারণত সমাজে মানুষের বৃত্তি নির্ধারিত হতো। যেমন– ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল যজন-যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয়রা ছিল দেশ শাসনে নিযুক্ত। বৈশ্যরা কৃষি ও বাণিজ্যকর্মে নিযুক্ত থাকত। শূদ্রদের কাজ ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেবা করা। বর্ণভেদের ব্যাপারে কিছুটা ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন– ঋষি বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েও অযোধ্যায় রাজা দশরথের মন্ত্রিসভার একজন অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। তিনি অযোধ্যার রাজপরিবারের প্রধান পুরোহিতেরও দায়িত্ব পালন করতেন। আবার ক্ষত্রিয় হয়েও বিশ্বামিত্র সাধনা ও কর্মগুণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ হয়েও পরশুরাম অস্ত্রধারণ করে ক্ষত্রিয় নিধন করেন। দেখা যাচ্ছে, সে যুগে কর্মগুণে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৃত্তি পরিবর্তিত হতে পারত।

তথ্যসূত্র:

১. মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ।
সূত্রকর্মবিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ ॥
মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা।
দন্তকারাঃ সুধাকার যে চ গন্ধোপজীবিনঃ ॥
সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কম্বলকারকাঃ।
স্নাপকোচ্ছোদকা বৈদ্যা ধূপকাঃ শৌণ্ডিকাস্তথা ॥
রজকাস্তন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ।
শৈলুষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্তকাস্তথা ॥
সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণা বৃত্তসম্মতাঃ ।
গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৩/১২-১৬

২. অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্মবিশারদাঃ।
স্বকর্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৮০/১

৩. কর্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথা বর্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ ॥
সূপাকারাঃ সুধাকারা বংশচর্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতস্থিরে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৮০/২-৩

৪. ঋষবদ্বড়িশং গৃহ্য ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬৮/১৩

৫. তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা।
নিষাদজাত্যো বলবান্ স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০/৩৩

৬. তিষ্ঠন্তু সর্বদাসাশ্চ গঙ্গামন্বাশ্রিতা নদীম্ ।
বলযুক্তা নদীরক্ষা মাংস-মূল-ফলাশনাঃ ॥
নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাং শতং শতম্ ।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৪/৭-৮

৭. অস্য বাহনসংযুক্তাং কর্ণগ্রাহবতীং শুভাম্ ।
সুপ্রতারাং দৃঢ়াং তীর্থে শীঘ্রং নাবমুপাহর ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫২/৬

৮. ততঃ শত্রুঘ্নবচনান্নিপুণাঃ শ্মশ্রুবর্ধনাঃ।
সুখহস্তাঃ সুশীঘ্রাশ্চ রাঘবং পর্যবারয়ন্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১২৮/১৩

আহার ও আহার্য

প্রত্যেক সমাজের মানুষের আহার-আহার্য একটি প্রধান আলোচ্য এবং আকর্ষণীয় বিষয়। আহার-আহার্যের মধ্য দিয়ে মানুষের রুচিরও প্রকাশ ঘটে। রামায়ণের যুগের সমাজের মানুষের আহার-আহার্যের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়।

ছয় রকম রসের খাবার

বিশ্বামিত্র তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে বসিষ্ঠ মুনির আশ্রমে এলে বসিষ্ঠ কামধেনুর মাধ্যমে তাঁদের ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। কামধেনু ছয় রকম রসযুক্ত খাদ্যবস্তু সৃষ্টি করেছিল। রসযুক্ত অন্ন অর্থাৎ পায়স, ইক্ষু, মধু, খৈ, মৈরেয় নামক মদ্য, নানা ভোজ্যদ্রব্য, দই, নানা রকমের সুস্বাদু খাজা, মিছরি, গুড়ের তৈরি নানাবিধ খাদ্য দ্বারা ঋষি বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সৈনিকদের সন্তৃপ্ত ও হৃষ্ট করেছিলেন।[১]

গুণিজনকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে বিশেষভাবে খাবার পরিবেশন

গুণিজন অতিথি হলে তাঁকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করা হতো। ঋষি বসিষ্ঠের কাছে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এলে বসিষ্ঠ তখন ব্রাহ্মণ, পুরোহিতবর্গ, অমাত্য, মন্ত্রী এবং কর্মচারীসহ অন্তঃপুরবাসীদের নিয়ে বিশ্বামিত্রকে খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন।[২]

সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত পরিবেশকবৃন্দ

সে সময় কোনো রাজকীয় ভোজ উৎসবে পরিবেশকবৃন্দ সুন্দর পোশাক পরিধান করত, নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত হতো। রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে আমন্ত্রিত অতিথিদের যাঁরা খাদ্য পবিবেশন করেছিল, তাঁরা ছিল সুন্দর অলঙ্কারে সুশোভিত। পরিবেশকগণ ছিল সমুজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডলধারী।[৩] বর্তমানেও দেখা যায়, রাজকীয় বা বিশেষ কোনো ভোজ-উৎসবে পরিবেশকগণ সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়।

মাংস ভক্ষণ

খাদ্য হিসেবে মাংসের প্রচলন ছিল। রামচন্দ্রের বনবাস জীবনকালে বিভিন্ন বন্য ফলমূলের সঙ্গে মাংস ছিল অন্যতম খাদ্য। হরিণ, গোসাপ, শূকরের মাংস খাওয়ার দৃষ্টান্ত মেলে রামচন্দ্রের বনবাস জীবনের

সময়। কিন্তু অযোধ্যায় অবস্থানকালে রামচন্দ্রের গোসাপ, শূকরের মাংস খাওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মনে হয়, বনবাসকালে জীবন রক্ষার জন্য রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে গোসাপ, শূকরের মাংস খেতে হয়েছিল। রাম-লক্ষ্মণ বনবাসের প্রথম দিনে বরাহ, ঋষ্য, পৃষত এবং মহারুরু নামক চারটি বিরাট হরিণ খাওয়ার জন্য হত্যা করেছিলেন।[৪] মারীচকে বধ করার পর রামচন্দ্র কয়েকটি চিত্রা হরিণ হত্যা করে মাংস নিয়ে জনস্থানে তাঁর পর্ণকুটিরে রওনা হয়েছিলেন।[৫] ব্রাহ্মণরূপী রাবণকে সীতাদেবী অতিথি সৎকার করে বলেছেন– আপনি যদি এখানে থাকতে চান, তাহলে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করে আশ্বস্ত হোন। আমার স্বামী প্রচুর বন্য ফলমূল এবং হরিণ, গোসাপ আর শূকর হত্যা করে তাদের মাংস নিয়ে চলে আসবেন।[৬]

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভোজ্য মাংস

পাঁচটি করে নখ আছে এমন সব প্রাণীই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ভোজন করতে পারে। সেই পাঁচটি প্রাণী হলো– শল্যক, শজারু, গোসাপ, খরগোস এবং কচ্ছপ।[৭]

খাদ্যশস্য

যব ও গমের প্রাচুর্য বেশি ছিল। হেমন্তকালে যব ও গমের সমারোহ থাকত মাঠে মাঠে। সোনালি শালিধানের সমৃদ্ধির কথারও উল্লেখ রয়েছে।[৮]

মদ্যপান

বিভিন্ন প্রকার মদের প্রচলন ছিল। উৎকৃষ্ট মদ্য ছিল দ্রাক্ষাজাত। কুলের তৈরি সৌবীরক মদ্য ছিল নিম্নমানের।[৯] রাবণের অশোক বনে বিরহী রামের বর্ণনাকালে হনুমান বলেছেন– রাম মাংস ভোজন করেন না, মদ্যও সেবন করেন না। সন্ধ্যাকালে শুধু অরণ্যজাত ফলমূলাদি ভোজন করেন। তিনি শুধু আপনার ধ্যানেই নিত্য শোকাকুল।[১০] হনুমানের এই উক্তির মাধ্যমে রামের মদ্যপানের কথা জানা যায়। উল্লেখ্য, সে সময় ক্ষত্রিয়ের এবং রাক্ষস-রাক্ষসীদের মধ্যে মদ্যপানের উদাহরণ পাওয়া যায়। রাক্ষসী শূর্পণখা ছিল মদ্যপায়ী। পঞ্চবটীতে রামাশ্রমে সে এসেছিল মদ্যপানে ঢুলুঢুলু নয়নে।[১১] কিষ্কিন্ধার দ্বারদেশে লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, তখন সুগ্রীব ছিলেন মদ্যপানে মত্ত।[১২]

সস্ত্রীক বিদ্যাধর নামক উপদেবতারা পানভূমিতে সোনার আসনে বসে স্বর্ণপাত্রে মদ্যপান করতেন।[১৩] লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসপত্নীরা মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন।[১৪] হনুমান রাবণের গৃহে প্রভূত মণিময় পাত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। সেগুলি সব মধু ও মদ্যে পূর্ণ ছিল।[১৫] মদ্যপানের ফলে রাবণের শয়নকক্ষে নারীরা ঘুমে অচেতন ছিলেন।[১৬] রাবণ প্রচুর মদ্যপান করতেন। হনুমান তাঁর শয়নগৃহে তাঁকে মদ্যপ ও অচেতন অবস্থায় দেখেছিলেন। রাবণের নিঃশ্বাসে হনুমান মদের গন্ধ পেয়েছিলেন। আম্র, পুন্নাগ আর উত্তম বকুল ফুলের গন্ধযুক্ত এবং মর্দিত অন্ন হতে তৈরি হতো সেই মদ।[১৭] রাবণের পানশালায় মণিময় ও সুবর্ণময় সব কলস মদে পূর্ণ থাকত।[১৮] কুম্ভকর্ণ ঘুম থেকে উঠে দুহাজার কলস মদ্যপান করেছিলেন।[১৯] কুম্ভকর্ণ রাবণকে দুঃখ দূর করার জন্য বারুণি মদ্যপান করতে বলেছেন।[২০] মহারুণপর্বতে বসবাসকারী বানরেরা মৈরেয় মধু পান করত।[২১]

পূজার্চনায় সুরা

পূজার্চনায়, যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশে সুরা অর্পণের উল্লেখ আছে। বনবাসে যাত্রাকালে সীতাদেবী গঙ্গানদী পার হওয়ার সময় গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে স্তুতি করে বলেন– হে শোভনে, আমরা অযোধ্যাপুরীতে ফিরে এলে এক সহস্র ঘট সুরা, মাংসমিশ্রিত অন্ন তথা পলান্ন দিয়ে তোমায় অর্চনা করব। দেবী, তুমি প্রসন্ন হও।[২২] যমুনা নদী পার হওয়ার সময় সীতাদেবী যমুনা নদীর উদ্দেশে স্তুতি করে বলেন– ইক্ষ্বাকু বংশের দ্বারা পরিপালিত অযোধ্যাপুরীতে আমরা ভালোভাবে ফিরে এলে সহস্র গাভী এবং একশত সুরাপূর্ণ কলসের দ্বারা তোমায় অর্চনা করব।[২৩]

মাছ ও পাখি

দিব্যরূপধারী কবন্ধ রাম-লক্ষ্মণকে পম্পা সরোবরের বর্ণনা করতে গিয়ে খাদ্য হিসেবে পাখি ও বিভিন্ন মাছের উল্লেখ করেছেন। কবন্ধ রামচন্দ্রকে বলেছেন– হে রাঘব, ঘৃতের ঢ্যালার মতো বড় বড় পাখিদের, রুইমাছ, চক্রতুণ্ড ও নলমীন নামক মাছ আপনারা ভোজন করবেন। হে রাম, পম্পায় বাণের দ্বারা বড় বড় মাছ মেরে তাদের পাখনা, আঁশ ও কাঁটা ছাড়িয়ে আগুনে ছেঁকে এবং রান্না করে আপনারা খাবেন।[২৪]

রাবণের পানশালায় ভোজ্যদ্রব্যের বর্ণনা

রাবণের পানশালা সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুতে পূর্ণ ছিল। পানভূমিতে হনুমান দেখেছিলেন, হরিণ আর মহিষের মাংস থরে থরে সাজানো। বড় বড় সোনার থালায় ময়ূর আর মুরগীর মাংস পড়ে ছিল। সেখানে ছিল শূকরের আর বার্ধীনসের মাংস দৈ আর লবণ দিয়ে মাখানো। শজারু, হরিণ আর ময়ূরের মাংস সেখানে ছিল। হনুমান আরও দেখেন– অর্ধেকটা খাওয়া হয়েছে এমন সব গিরগিটি, নানা ধরনের দাঁতাল এবং খরগোশের মাংস। সেখানে আরও ছিল ভালোভাবে রান্না করা মহিষ, শজারু আর ভেড়ার মাংস। ভালো-মন্দ সব রকমের খাবার– যা চেটে খাওয়া যায়, পান করা যায় এবং চিবিয়েও খাওয়া যায়। সেগুলির কতগুলি বেশ টকটক ও নোনতা। আবার নানা রকমের মিছরির দ্বারা মিষ্টি তৈরিও ছিল। নানা রকমের ঝোলের মাংসও সেখানে রান্না করা ছিল। সেখানে পৃথক্‌ভাবে তৈরি বহুরকমের সুরা ছিল। চিনির তৈরি, মধু দিয়ে তৈরি, ফুল ও ফল হতে তৈরি বহু প্রকার মদ্য সেখানে সাজানো ছিল।[২৫]

রাবণের পানশালার সাজ-সজ্জা

রাবণের পানভূমিতে ছড়িয়ে থাকত অত্যন্ত দামী সব নূপুর ও কেয়ূর। চারদিক ফুল দিয়ে সাজানো। মধ্যে মধ্যে সজ্জা ও প্রসারিত আসন। আগুন না থাকলেও নানা রত্নের ঔজ্জ্বল্যে সে পানভূমি ছিল সুদৃষ্ট। নানাপাত্রে প্রভূত ফুলের মালা সেখানে থাকত। সোনার কলস ও স্ফটিকের পাত্রও থাকত। সোনা ও রূপার তৈরি পানপাত্রে পরিপূর্ণ সে পানশালা।[২৬]

নিরামিষ ,আমিষ, মদ্য ও সুরাজাতীয় পানীয় সবই সে যুগে খাদ্য হিসেবে গৃহীত ছিল। সে সকল খাদ্যের সঙ্গে এ যুগের খাদ্যের খুব একটা অমিল নেই।

তথ্যসূত্র:

১. ইক্ষূন্ মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্ ।
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি ॥

উষ্ণাঢ্যস্যৌদনস্যাত্র রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ।
মৃষ্টান্যন্নানি সূপাংশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ ॥
নানাস্বাদুরসানাঞ্চ খাণ্ডবানাং তথৈব চ।
ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ ॥
সর্বমাসীৎ সুসন্তুষ্টং হৃষ্ট-পুষ্টজনাযুতম্ ।
বিশ্বামিত্রবলং রাম বসিষ্ঠেন সুতর্পিতম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৫৩/২-৫

২. বিশ্বামিত্রো হি রাজর্ষির্হৃষ্ট-পুষ্টস্তদাভবৎ।
সান্তঃপুরবরো রাজা সব্রাহ্মণ-পুরোহিতঃ ॥
সামাত্যো মন্ত্রিসহিতঃ সভৃত্যঃ পূজিতস্তদা। আদিকাণ্ড, ৫৩/৬-৭

৩. স্বলঙ্কৃতাশ্চ পুরুষা ব্রাহ্মণান্ পর্যবেষয়ন্ ।
উপাসতে চ তানন্যে সমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১৪/১৮

৪. তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্ বরাহমৃষ্যং পৃষতং মহারুরুম্ ।
আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ বাসায় কালে যযতুর্বনস্পতিম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫২/১০২

৫. নিহত্য পৃষতং চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ।
ত্বরমাণো জনস্থানং সসারাভিমুখং তদা ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৪/২৭

৬. বিচরাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ বনং গম্ভীরমোজসা।
সমাশ্বস মুহূর্তং তু শক্যং বস্তুমিহ ত্বয়া ॥
আগমিষ্যতি মে ভর্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্ ।
রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহু ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৭/২২-২৩

৭. পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্মশ্চ পঞ্চমঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/৩৯

৮. বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যব-গোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ ॥
খর্জুর-পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কণকপ্রভাঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১৬/১৬-১৭

৯. যদন্তরং সিংহ-শৃগালয়োর্বনে যদন্তরং স্যন্দনিকাসমুদ্রয়োঃ।
সুরাগ্র্য-সৌবীরকয়োর্যদন্তরং তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৭/ ৪৫

১০. ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।
বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৩৬/৪১

১১. ইত্যেবমুক্তঃ কাকুৎস্থঃ প্রহস্য মদিরেক্ষণাম্ ।
ইদং বচনমারেভে বক্তুং বাক্যবিশারদঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১৭/২৯

১২. স নিদ্রাক্লান্তসংবীতো বানরো ন বিবুদ্ধবান্ ।
বভূব মদমত্তশ্চ মদনেন চ মোহিতঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩১/৩৮

Dhaka University Institutional Repository

১৩. পানভূমিগতং হিত্বা হৈমমাসনভাজনম্ ।
পাত্রাণি চ মহার্হাণি করকাংশ্চ হিরণ্ময়ান্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১/২৩

১৪. ততো বরার্হাঃ সুবিশুদ্ধভাবাস্তেষাং স্ত্রিয়স্তত্র মহানুভাবাঃ।
প্রিয়েষু পানেষু চ সক্তভাবা দদর্শ তারা ইব সুস্বভাবাঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৫/১৭

১৫. মধ্বাসবকৃতক্লেদং মণিভাজনসঙ্কুলম্ ।
মনোরমমসংবাধং কুবেরভবনং যথা ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৬/৪২

১৬. ব্যাবৃত্তকচপীনস্রক্ প্রকীর্ণবরভূষণাঃ।
পানব্যায়ামকালেষু নিদ্রোপহতচেতসঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৯/৪৪

১৭. চূত-পুন্নাগসুরভির্বকুলোত্তমসংযুতঃ।
মৃষ্টান্নরসসংযুক্তঃ পানগন্ধপুরঃসরঃ ॥
তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ।
শয়ানস্য বিনিঃশ্বাসঃ পুরয়ন্নিব তদ্ গৃহম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১০/২৩-২৪

১৮. পানশ্রেষ্ঠাং তথা ভূমিং কপিস্তত্র দদর্শ সঃ।
সোঽপশ্যাচ্ছাতকুম্ভানি সীধোর্মণিয়ানি চ ॥
তানি তানি চ পূর্ণানি ভাজনানি মহাকপিঃ।
ক্বচিদর্ধাবশেষাণি ক্বচিৎ পীতান্যশেষতঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১১/২৬-২৭

১৯. পীত্বা ঘটসহস্রে দ্বে গমনায়োপচক্রমে।
ঈষৎ সমুৎকটো মত্তস্তেজোবলসমন্বিতঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬০/৯৩

২০. রমস্ব রাজন্ পিব চাদ্য বারুণীং
কুরুষ্ব কৃত্যানি বিনীয় দুঃখম্ ।
ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৬৩/৫৮

২১. তরুণাদিত্যবর্ণাশ্চা পর্বতে যে মহারুণে।
পিবন্তো মধু মৈরেয়ং ভীমাবেগাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৭/৭

২২. সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫২/৮৯

২৩. যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ।
স্বস্তি প্রত্যাগতে রামে পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৫/২০

২৪. ঘৃতপিণ্ডোপমান্ স্থূলাংস্তান্ দ্বিজান্ ভক্ষয়িষ্যথঃ।
রোহিতাংশ্চক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব ॥
পম্পায়ামিষুভির্মৎস্যাংস্তত্র রাম বরান্ হতান্ ।
নিস্ত্বক্পক্ষানয়স্তপান্ কৃশানৈককণ্টকান্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৭৩/১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

২৫. মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ ভাগশঃ।
তত্র ন্যস্তানি মাংসানি পানভূমৌ দদর্শ সঃ ॥
রৌক্মেষু চ বিশালেষু ভাজনেষ্বপ্যভক্ষিতান্ ।
দদর্শ কপিশার্দূলো ময়ূরান্ কুক্কুটাংস্থথা ॥
বরাহ-বাধ্রীণসকান্ দধিসৌবর্চলাযুতান্ ।
শল্যান্ মৃগময়ূরাংশ্চ হনুমানম্ববৈক্ষত ॥
কৃকলান্ বিবিধাংশ্ছাগাঞ্ছশকানর্ধভক্ষিতান্ ।
মহিষানেকশল্যাংশ্চ মেষাংশ্চ কৃতনিষ্ঠিতান্ ॥
লেহ্যানুচ্চাবচান্ পেয়ান্ ভোজ্যান্যুচ্চাবচানি চ।
তথাম্লবণোত্তংসৈর্বিবিধে রাগখাণ্ডবৈঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১১/১৪-১৮

২৬. মহানূপুরকেয়ূরৈরপবিদ্ধৈর্মহাধনৈঃ।
পানভাজনবিক্ষিপ্তৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥
কৃতপুষ্পোপহারা ভূরধিকাং পুষ্যতি শ্রিয়ম্ ।
তত্র তত্র চ বিন্যস্তৈঃ সুশ্লিষ্টশয়নাসনৈঃ ॥
পানভূমির্বিনা বহ্নিং প্রদীপ্তেবোপলক্ষ্যতে।
বহু প্রকারৈর্বিবিধৈর্বরসংস্কারসংস্কৃতৈঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১১/১৯-২১

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছদ ও প্রসাধন

সকল যুগে নর-নারীর মধ্যে বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদে নিজেকে সজ্জিত করার প্রয়াস দেখা যায়। নিজের নিরাবরণ দেহকে আবরণ দেওয়া পোশাক-পরিচ্ছদের যেমন প্রাথমিক প্রয়োজন, তেমনি নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাও এর একটা বড় প্রয়োজন। পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে আছে প্রসাধনও। সেই আদিম যুগে গুহামানব অথবা অরণ্যমানব তার প্রিয় মানবীকে বৃক্ষের বল্কলে পল্লবে পুষ্পে সজ্জিত করেছে। এর মধ্যে প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যীকরণ দুইই ছিল। যুগে যুগে মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন ঘটেছে। এ পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটেও চলেছে। এ পরিবর্তনের পেছনে আছে অবস্থানুযায়ী কিছু অবশ্য প্রয়োজন, কিছু রুচি এবং প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন করে উপস্থাপন করার প্রবণতাও। স্থান, কাল অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন ঘটে। কোনো বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে একটা যুগকেও নির্ণয় করা যায়। এখানে রামায়ণের যুগে কিছু পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ দেওয়া হলো।

দশরথের শাসনামলে অযোধ্যার সাজ-সজ্জা

অযোধ্যাবাসী কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তকে মুকুট ধারণ করত। তারা সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ করে চন্দনাদির প্রলেপ দিত। সবাই বাহুতে অঙ্গদ ধারণ করত।[১]

সীতার সাজ-সজ্জা

সীতাদেবী ছিলেন রাজকন্যা ও রাজবধূ। রাজর্ষি জনক সালঙ্কৃতা সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের হাতে সম্প্রদান করেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমনকালে রাজা দশরথ সীতাদেবীকে চৌদ্দ বছরের ব্যবহার উপযোগী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দান করেছিলেন।[২] বনবাসকালে সীতাদেবী অত্রিমুনির আশ্রমে গেলে অনসূয়াদেবী (অত্রিমুনির স্ত্রী) তাঁকে সুন্দর স্বর্গীয় মালা, বস্ত্র, অলঙ্কার, অঙ্গরাগ এবং বহুমূল্য অনুলেপন দান করেছিলেন। মূলত রাজবধূ সীতা এরূপ সাজসজ্জায় অভ্যস্ত ছিলেন। মমতাময়ী অনসূয়া সীতাদেবীকে অলঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন– হে সীতা, আমার দেওয়া এই অলঙ্কারগুলো তোমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শোভিত করবে। এগুলো সব সময় অম্লানই থাকবে। হে জানকী, দেবী লক্ষ্মী দিব্য-

অঙ্গরাগে শরীর লিপ্ত করে অব্যয় বিষ্ণুকে শোভিত করেন, অর্থাৎ সুসজ্জিতা লক্ষ্মীর পাশে বিষ্ণুকেও তখন সুন্দর দেখায়। তেমনি তুমিও সুসজ্জিতা হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে তোমার পতিকে শোভিত করো।[৩] বনে বসবাসকারী ও সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত অনসূয়া দেবী উৎকৃষ্ট বস্ত্র, মহামূল্য অলঙ্কার, বিলেপন, অঙ্গরাগ ইত্যাদি কীভাবে পেলেন এ প্রশ্ন জাগে মনে। তাহলে কি ঋষিপত্নীরা বিবাহের প্রথম জীবনে মূল্যবান অলঙ্কারে নিজেদের সজ্জিত করতেন? আর বৃদ্ধবয়সে এগুলি সংরক্ষণ করতেন? শূর্পণখা বনবাসী সীতাদেবীর বর্ণনা করেছে সর্বালঙ্কারে ভূষিতা রূপবতী এক সুন্দরী নারীরূপে।[৪] সন্ন্যাসীর রূপ ধরে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করতে এসেছিলেন, তখন সীতার পরিধানে ছিল হলুদ পট্টবস্ত্র।[৫] এবং তিনি ছিলেন মাল্যভূষিতা।[৬] সীতার গলায় ছিল পদ্মের মালা।[৭] তাঁর চরণে ছিল রত্নশোভিত নূপুর।[৮] সোনার মতো উজ্জ্বল তাঁর রেশমি ওড়না। তাঁর কানে ছিল সুন্দর কুণ্ডল। তাঁর গ্রীবার বর্ণ ছিল চাঁপা ফুলের মতো। সেখানে ছিল সুন্দর হার। হাতদুটিতে ছিল অঙ্গদাদি অলঙ্কার।[৯] সীতাহরণের পর রামচন্দ্র দুঃখ করে বলেছেন– আমার প্রিয়া সুব্রতা সীতার গ্রীবাদেশে সর্বদাই হার শোভা পেত।[১০] অশোকবনে হনুমান সীতাকে যখন দেখেন, তখন সীতার কানে ছিল 'শ্বদংষ্ট্র' নামক কানের অলঙ্কার। অর্থাৎ কুকুরের দাঁতের মতো সুবিন্যস্ত। মণি ও প্রবালযুক্ত গয়না ছিল তাঁর হাতে।[১১]

কাকপক্ষধারী রামচন্দ্র

রামচন্দ্রের মাথায় কাকপক্ষ ছিল।[১২] প্রাচীনকালে কেউ কেউ মাথায় পাঁচটি শিখা রাখতেন, তারই নাম কাকপক্ষ। আবার কারও মতে কাকের পালকের মতো কুচকুচে কালো কেশগুচ্ছ সমন্বিত জুলফিকে বলা হয় কাকপক্ষ।

তপোবনবাসীদের পোশাক

তপোবনবাসী ঋষিরা কৌপিন পরিধান করতেন। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে অসংখ্য কৌপিনের কাপড় মালার মতো ঝুলতে দেখেছিলেন। সেখানে তাঁরা সুতীক্ষ্ণ মুনিকে পদ্মমালা পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলেন।[১৩]

রাবণের সাজসজ্জা

রাক্ষসরাজ রাবণ সুদৃশ্য পোশাক পরিধান করতেন। তিনি ছিলেন তপ্তস্বর্ণের ভূষণে ভূষিত। দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে শোভিত, দিব্যমাল্য পরিহিত।[১৪] সীতাহরণকালে ছদ্মরূপ ত্যাগ করে রাবণ যখন নিজের রূপ

ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁর পরিধানে ছিল রক্তবসন।[১৫] রাবণের কর্ণে উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল শোভিত হতো।[১৬] রাবণের শয়নগৃহে হনুমান সুপ্ত রাবণকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত অবস্থায় দেখেছিলেন। শশকের রক্তের মতো রক্তবর্ণ, শীতল, সুগন্ধি ভালো চন্দনের দ্বারা অনুলিপ্ত ও অলঙ্কৃত ছিল তাঁর বাহুদুটি। তাঁর ছিল মুক্তা ও মণিখচিত সোনার মুকুট। কর্ণে শোভিত কুণ্ডল। বিশাল তাঁর বক্ষ। রক্তচন্দনে সেটি অনুলিপ্ত ও হারে শোভিত। শুভ্র রেশমি বস্ত্র পরিধানে। অত্যন্ত মূল্যবান পীতবর্ণের উত্তরীয় তাঁর অঙ্গে।[১৭]

সিংহাসনে আসীন রাবণের সাজ-সজ্জার বিবরণ

রাবণের সিংহাসন ছিল বিরাট বিরাট স্ফটিকে নির্মিত। সুন্দর রত্ন খচিত ও উত্তম চাদরে ঢাকা ছিল সেই আসন।[১৮] সিংহাসনে আসীন রাবণের মাথায় শোভিত ছিল মহামূল্য সোনার মুকুট। তাতে মুক্তাজাল খচিত। ঠিকরে পড়া মুকুটের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। হীরের আর মহামূল্য মণিরাজির অলঙ্কার পরিহিত তিনি। মহামূল্য পট্টবস্ত্র তাঁর পরিধানে। রক্তচন্দনে তাঁর দেহ লিপ্ত। গায়ে আঁকা আছে বিচিত্র সব চিত্রলেখা। বুকে বিরাজিত নীল কাজলের মতো হারলতা। বাহুতে বাঁধা কেয়ূর।[১৯]

রাবণপত্নীদের সাজসজ্জা

রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নীরা কর্ণে কুণ্ডল পরতেন। তাঁরা যে মালা দিয়ে সাজতেন তা কখনও ম্লান হতো না। তাঁদের কর্ণে শোভিত হতো হীরে আর বৈদূর্যমণির দুল। বাহুতে পরতেন তপ্ত সোনার মতো উজ্জ্বল অঙ্গদ।

বিদ্যাধর নামক উপদেবতার পত্নীদের সাজসজ্জা

বিদ্যাধর নামক উপদেবতাদের পত্নীরা হার, নূপুর, কেয়ূর ও বালা পরতেন।[২০]

মারীচের সাজসজ্জা

মারীচের কানের কুণ্ডল ছিল উজ্জ্বল স্বর্ণের। মাথায় ছিল মুকুট।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের বস্ত্র

অযোধ্যার রাজপরিবারের নববধূগণ বিবাহের সময় ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করেছেন। বিবাহের পর তাঁদের যখন রাজান্তঃপুরিকারা বরণ করেন, তখন নববধূগণ ক্ষৌমবস্ত্রে সুশোভিত ছিলেন।[২২]

রামায়ণ পড়ে বোঝা যায়, সে যুগের নর-নারীরা পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনে খুবই যত্নশীল ছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাস্রগ্বী নাল্পভোগবান্ ।
নামৃষ্টো ন নলিপ্তাঙ্গো নাসুগন্ধশ্চ বিদ্যতে ॥ আদিকাণ্ড, ৬/১০

২. তং রথং সূর্যসঙ্কাশং সীতা হৃষ্টেন চেতসা।
আরুরোহ বরারোহা কৃত্বালঙ্কারমাত্মনঃ ॥
বনবাসং হি সংখ্যায় বাসাংস্যাভরণানি চ।
ভর্তারমনুগচ্ছন্ত্যৈ সীতায়ৈ শ্বশুরো দদৌ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০/১৩-১৪

৩. ইদং দিব্যং বরং মাল্যং বস্ত্রমাভরণানি চ।
অঙ্গরাগঞ্চ বৈদেহি মহার্হমনুলেপনম্ ॥
ময়া দত্তমিদং সীতে তব গাত্রাণি শোভয়েৎ।
অনুরূপমসংক্লিষ্টং নিত্যমেব ভবিষ্যতি ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৮/১৮-১৯

৪. তরুণী রূপসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা। অরণ্যকাণ্ড, ১৯/১৭

৫. স তাং পদ্মপলাশাক্ষীং পীত-কৌশেয়বাসিনীম্ । অরণ্যকাণ্ড, ৪৬/১৩

৬. তাং ক্লিষ্টমাল্যাভরণাং বিলপন্তীমনাথবৎ। অরণ্যকাণ্ড, ৫২/৬

৭. তস্যাঃ পরমকল্যাণ্যাস্তাম্রাণি সুরভীণি চ।
পদ্মপত্রাণি বৈদেহ্যা অভ্যকীর্যন্ত রাবণম্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৫২/১৬

৮. চরণান্নুপুরং ভ্রষ্টং বৈদেহ্যা রত্নভূষিতম্ ।
বিদ্যুন্মণ্ডলসংঙ্কাশং পপাত ধরণীতলে ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৫২/২৯

৯. কৌশেয়ং কনকপ্রভম্ । অরণ্যকাণ্ড, ৫৪/২
সা হি চম্পকবর্ণাভা গ্রীবা গ্রৈবেয়কোচিতা।
কোমলা বিলপন্ত্যাস্তু কান্তায়া ভক্ষিতা শুভা ॥
নূনং বিক্ষিপ্যমাণৌ তৌ বাহূ পল্লবকোমলৌ।
ভক্ষিতৌ বেপমানাগ্রৌ সহস্তাভরণাঙ্গদৌ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬০/৩২-৩৩

১০. তাং হারপাশস্য সদোচিতান্তাং গ্রীবাং প্রিয়ায়া মম সুব্রতায়াঃ। অরণ্যকাণ্ড, ৬৩/১০

১১. সুকৃতৌ কর্ণবেষ্টৌ চ শ্বদংষ্ট্রৌ চ সুসংস্থিতৌ।
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি হস্তেষ্বাভরণানি চ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১৫/৪২

১২. কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি। আদিকাণ্ড, ১৯/৯

১৩. প্রবিষ্ট তু বনং ঘোরং বহুপুষ্পফলদ্রুমম্ ।
দদর্শাশ্রমমেকান্তে চীরমালাপরিষ্কৃতম্ ॥
তত্র তাপসমাসীনং মলপঙ্কজধারিণম্ ।
রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবত্তপোধনমভাষত ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৭/৪-৫

১৪. তং দিব্যবস্ত্রাভরণং দিব্যমাল্যোপশোভিতম্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৩২/২২

১৫. প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
রক্তাম্বরধরস্তস্থৌ স্ত্রীরত্নং প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৯/৯

১৬. ইত্যুক্তঃ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
রাক্ষসেন্দ্রাভিদুদ্রাব পতগেন্দ্রমমর্ষণঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৫১/১

১৭. শশক্ষতজকল্পেন সুশীতেন সুগন্ধিনা।
চন্দনেন পরার্ধেন স্বনুলিপ্তৌ স্বলঙ্কৃতৌ ॥
মুক্তামণিবিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজিতা।
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্ ॥
রক্তচন্দনদিগ্ধেন তথা হারেণ শোভিনা।
পীনায়তবিশালেন বক্ষসাভিবিরাজিতা ॥
পাণ্ডুরেণাপবিদ্ধেন ক্ষৌমেণ ক্ষতজেক্ষণম্ ।
মহার্হেণ সুসংবীতং পীতেনোত্তরবাসসা ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১০/১৯, ২৫-২৭

১৮. মহতি স্ফাটিকে চিত্রে রত্নসংযোগচিত্রিতে।
উত্তমাস্তরণাস্তীর্ণে সূপবিষ্টং বরাসনে ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৪৯/৯

১৯. ভ্রাজমানং মহার্হেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা।
মুক্তাজালবৃতেনাথ মুকুটেন মহাদ্যুতিম্ ॥
বজ্রসংযোগসংযুক্তৈর্মহার্হমণিবিগ্রহৈঃ।
হৈমৈরাভরণৈশ্চিত্রৈর্মনসেব প্রকল্পিতৈঃ ॥
মহার্হক্ষৌমসংবীতং রক্তচন্দনরূষিতম্ ।
স্বনুলিপ্তং বিচিত্রাভিবিবিধাভিশ্চ ভক্তিভিঃ ॥
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং হারেণোরসি রাজতা।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৪৯/২-৪,৭

২০. হার-নূপুর-কেয়ূর-পারিহার্যধরাস্ত্রিয়ঃ।
বিস্মিতাঃ সস্মিতাস্তস্থুরাকাশে রমণৈঃ সহ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১/২৬

Dhaka University Institutional Repository

২১. নীল-জীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
ভয়ং লোকস্য জনয়ন্ কিরীটি পরিঘায়ুধঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৩৮/২

২২. মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৭৭/১২

Dhaka University Institutional Repository

যজ্ঞ

'যজ্' ধাতু থেকে যজ্ঞ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। [যজ্ + ন (নঞ্)], শব্দটির অন্য অর্থ হলো অধ্বর/ ক্রতু/যাগ। পারিভাষিক অর্থে যাগ হলো বিশেষ কোনো দেবতা বা দেবগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁদের উদ্দেশে কোনো দ্রব্যের আহুতি প্রদান অনুষ্ঠান। যজ্ঞানুষ্ঠান মূলত ছিল ধর্মানুষ্ঠান। দেবলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের যোগস্থাপনের একটি উপায় হলো যজ্ঞ। যজ্ঞকারিগণ তাঁদের শ্রেষ্ঠবস্তু দেবতাকে সমর্পণ করতেন, আর দেবতার কাছে তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় এবং দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। রামায়ণে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়। আলোচ্য অধ্যায়ে রামায়ণে উল্লিখিত যজ্ঞ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করার প্রয়াস করা হয়েছে।

পুত্রকামনায় যজ্ঞ

সেকালে পুত্রকামনায় যজ্ঞ করা হতো। দীর্ঘ তপস্যা করেও যখন রাজা দশরথ অপুত্রক ছিলেন, তখন তাঁর মনে হলো পুত্রের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছি না কেন ? মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের আগে অশ্বকে যথেচ্ছ ভ্রমণের জন্য মুক্ত করে দিতে হতো। কোনো রাজ্যে অশ্বের গতি কেউ রোধ করলে তখন সেই অশ্বের অনুসরণকারী সৈন্যরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে মুক্ত করত। এভাবে বহু রাজ্য ঘুরে বিজয়ীর বেশে অশ্ব স্বরাজ্যে ফিরে এলে তার মাংস দিয়ে যজ্ঞ করা হতো। শাস্ত্রবিধি অনুসারে এ যজ্ঞ পালিত হতো। বিদ্বান ব্রহ্মরাক্ষসেরা সব সময় এ যজ্ঞের ত্রুটি অন্বেষণ করে। নিয়ম অনুসারে যজ্ঞ না হলে তখনই যজ্ঞকর্তাকে তারা বিনাশ করে।[১] পুত্রকামনায় যজ্ঞ করলেও কন্যা কামনায় কোনো যজ্ঞ, তপস্যা কিংবা ব্রতপালনের দৃষ্টান্ত রামায়ণে পাওয়া যায় না।

যজ্ঞ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মীদের কর্মে নিয়োগ

যজ্ঞের কাজ করার জন্য বিভিন্ন কর্মী নিয়োগ করা হতো। রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে বিভিন্ন কর্মে পারদর্শী যোগ্য কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন কেউ স্থাপত্যবিজ্ঞানে দক্ষ, কেউ শিল্পী, ছেদক, খননকারী, গণক, ললিতকলায় অভিজ্ঞ নট, নর্তকী, কেউ দক্ষ অস্ত্রবিজ্ঞানী এমন বিশেষ বিদ্যায় বিদগ্ধ ব্যক্তি।[২]

যজ্ঞ ছিল মূলত কর্মযজ্ঞেরই আয়োজন

যজ্ঞ উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের নিমন্ত্রণ করা হতো। নিমন্ত্রিতদের জন্য মনোরম গৃহ নির্মাণ করা হতো। পুরবাসীদের ও দূর থেকে আসা রাজাদের জন্য নির্মাণ করা হতো পৃথক পৃথক গৃহ। নির্মাণ করা হতো হস্তিশালা, অশ্বশালা।[৩]

অবজ্ঞা করে দান করলে ঐ দান দাতাকেই ধ্বংস করে

যজ্ঞে বিনম্র হয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে দান করা হতো। রাজা দশরথের কুলপুরোহিত এ সম্পর্কে বলেছেন: অবজ্ঞা করে কিংবা হালকাভাবে কাউকে কিছু দিবে না। অবজ্ঞা করে দান করলে ঐ দান দাতাকেই ধ্বংস করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।[৪]

যজ্ঞে সকল দেশের সকল বর্ণের মানুষ নিমন্ত্রিত ও সমাদৃত হতো

যজ্ঞে শুধু বিভিন্ন রাজ্যের রাজা নয়– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে নিমন্ত্রণ করা হতো। সকলকে সমাদর করে নিয়ে আসা হতো।[৫]

যজ্ঞসভায় নিমন্ত্রিত রাজাদের উপহারসামগ্রী নিয়ে আগমন

যজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজারা উপহার নিয়ে আসতেন। রাজাদেরও সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা জানানো হতো। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত রাজারা অনেক উপঢৌকন ও রত্নসম্ভার নিয়ে রাজা দশরথের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।[৬]

যজ্ঞকালে কাউকে অভিশাপ দেওয়া বা ক্রোধপ্রকাশ করা অনুচিত

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞপালনকালে মারীচ ও সুবাহু নামে মায়াবী রাক্ষসদ্বয় তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বিশ্বামিত্র ইচ্ছা করলে তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে বিনাশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যজ্ঞপালনকালে ক্রোধ প্রকাশ করতে চান নি। তাই তিনি যজ্ঞ রক্ষার্থে দশটি রাতের জন্য রাজা দশরথের কাছে রামচন্দ্রকে চেয়েছিলেন।[৭]

যজ্ঞীয় দ্রব্য নিয়ে ঋষিদের বিভিন্ন স্থানে গমন

ঋষিরা কোথাও যাত্রা করলে তাঁদের সঙ্গে যজ্ঞীয় দ্রব্য থাকত। ঋষি বিশ্বামিত্র যখন রাম-লক্ষ্মণ এবং অন্য ঋষিদের নিয়ে মিথিলায় যাত্রা করেছিলেন, তখন তাঁদের পেছনে পেছনে চলেছিল যজ্ঞীয় দ্রব্য ও দানাদিতে পরিপূর্ণ একশত শকট।[৮]

যজ্ঞ উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের নিমন্ত্রিত অভ্যাগত গুণীদের সংবর্ধনা

রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের গুণী ব্যক্তি ও ধার্মিক রাজাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। অযোধ্যার কুলপুরোহিত বসিষ্ঠ সুমন্ত্রকে বলেছিলেন: পৃথিবীতে যে সমস্ত ধার্মিক রাজা আছেন, তাঁদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে, সমাদর করে রাজ্যে নিয়ে আসুন। মিথিলারাজ জনক, কাশীরাজ, কেকয়রাজ, অঙ্গরাজ রোমপাদ, কোশলরাজ ভানুমান, সর্বশাস্ত্রবিশারদ মগধরাজ, সৌবীরদেশীয়, সৌরাষ্ট্রদেশীয়, দাক্ষিণাত্যের রাজাদের নিমন্ত্রণ করে তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে সংবর্ধনা করেছিলেন রাজা দশরথ।[৯]

যজ্ঞের পশু অপহৃত হলে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নরবলী

রাজা অম্বরীষ যজ্ঞের উদ্যোগ নিলে ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞের অশ্বকে অপহৃত করেন। তখন যজ্ঞের পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজাকে এর প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে পশুর বিকল্পে নরবলী দিতে বলেন।[১০]

রক্তবস্ত্রপরিহিত ও পবিত্রচিহ্নে ভূষিত করে নরবলী দেওয়া হতো

রাজা অম্বরীষ যজ্ঞীয় পুরোহিতবর্গের অনুমতি নিয়ে শুনঃশেফকে যখন যজ্ঞস্থলীর পশুবন্ধনের যূপকাষ্ঠে বেঁধে দেন, তখন শুনঃশেফ ছিলেন রক্তবস্ত্রপরিহিত ও পবিত্রচিহ্নে ভূষিত।[১১]

ব্রহ্মযজ্ঞ

ঋষিগণ জ্ঞানের প্রচারক। তাঁরা স্বাধ্যায়বান ও ব্রতপরায়ণ। প্রতিটি গৃহস্থের নিজ নিজ লৌকিক ধারায় নিত্য বেদপাঠ কর্তব্য। প্রত্যহ এই বেদপাঠকে বলা হয় স্বাধ্যায়। বেদের জ্ঞানে নিজেকে আলোকিত করে শিষ্যের মধ্যে সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার নামই ব্রহ্মযজ্ঞ। গৃহস্থের নিত্য অবশ্য করণীয়

পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম এই ব্রহ্মযজ্ঞ। দশরথ পরশুরামকে শান্ত করতে গিয়ে বিনীতভাবে বলেছিলেন, মহর্ষি ভৃগুর বংশধরেরা স্বাধ্যায়বান ও ব্রতপরায়ণ। তাঁদের বংশে আপনার জন্ম।[১২]

অগ্নিহোত্র যজ্ঞ

ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। অযোধ্যা নগরীতে নিত্য হোমনিরত অগ্নিহোত্রী গুণবান বহু উত্তম ব্রাহ্মণ বাস করতেন।[১৩]

রামায়ণের যুগে সমাজে ধর্মকর্ম তথা যাগযজ্ঞের সঙ্গে মানুষের পরিপূর্ণ সম্পৃক্ততা পরিদৃষ্ট।

তথ্যসূত্র :

১. ছিদ্রং হি মৃগয়ন্ত্যেতে বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্ত্তা বিনশ্যতি ॥ আদিকাণ্ড, ১২/১৮

২. ততোঽব্রবীদ্দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ যজ্ঞকর্মসু নিষ্ঠিতান্ ।
স্থাপত্যে নিষ্ঠিতাংশ্চৈব বৃদ্ধান্ পরমধার্মিকান্ ॥
কর্মান্তিকান্ শিল্পকরান্ বর্ধকীন্ খনকানপি।
গণকাঞ্ছিল্পিনশ্চৈব তথৈব নটনর্তকান্ ॥
তথা শুচীঞ্ছাস্ত্রবিদঃ পুরুষান্ সুবহুশ্রুতান্ ।
যজ্ঞকর্ম সমীহন্তাং ভবন্তো রাজশাসনাৎ ॥ আদিকাণ্ড, ১৩/৬-৮

৩. ইষ্টকা বহুসাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি ।
ঔপকার্যাঃ ক্রিয়ন্তাঞ্চ রাজ্ঞো বহুগুণান্বিতাঃ ॥
ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব কর্তব্যাঃ শতশঃ শুভাঃ।
ভক্ষ্যান্নপানৈর্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ ॥
তথা পৌরজনস্যাপি কর্তব্যাশ্চ সুবিস্তরাঃ।
আগতানাং সুদূরাচ্চ পার্থিবানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥
বাজি-বারণশালাশ্চ তথা শয্যাগৃহাণি চ ।
ভট্টানাং মহদাবাসা বৈদেশিকনিবাসিনাম্ ॥
আবাসা বহুভক্ষ্যা বৈ সর্বকামৈরুপস্থিতাঃ।
তথা পৌরজনস্যাপি জনস্য বহুশোভনম্ ॥ আদিকাণ্ড, ১৩/৯-১৩

৪. ততঃ প্রীতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তান্ সর্বান্ মুনিরব্রবীৎ।
অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিল্লীলয়াপি বা ॥
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ।
ততঃ কৈশ্চদহোরাত্রৈরুপযাতা মহীক্ষিতঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১৩/৩৩-৩৪

৫. নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্ ।
মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্ ।
নিষ্ঠিতং সর্বশাস্ত্রেষু তথা বেদেষু নিষ্ঠিতম্ ॥ আদিকাণ্ড, ১৩/২০-২১

৬. বহূনি রত্নান্যাদায় রাজ্ঞো দশরথস্য হ।
ততো বসিষ্ঠঃ সুপ্রীতো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ আদিকাণ্ড, ১৩/৩৫

৭. কৃতশ্রমো নিরুৎসাহস্তস্মাদ্ দেশাদপাক্রমে।
ন চ মে ক্রোধমুৎসৃষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব ॥
তথাভূতা হি সা চর্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে।
স্বপুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥
কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি।
শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তেজসা ॥ আদিকাণ্ড, ১৯/৭-৯

৮. তং ব্রজন্তং মুনিবরমন্বগাদনুসারিণাম্ ।
শকটীশতমাত্রন্তু প্রয়াণে ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৩১/১৭

৯. নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্ ।
মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্ ।
নিষ্ঠিতং সর্বশাস্ত্রেষু তথা বেদেষু নিষ্ঠিতম্ ॥
তমানয় মহাভাগঃ স্বয়মেব সুসৎকৃতম্ ।
পূর্বং সম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা ততঃ পূর্বং ব্রবীমি তে ॥
তথা কাশীপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্ ।
সদ্‌বৃত্তং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ ॥
তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্মিকম্ ।
শ্বশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয় ॥ আদিকাণ্ড, ১৩/২০-২৫

১০. প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতন্নরং বা পুরুষর্ষভ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম প্রবর্ততে ॥ আদিকাণ্ড, ৬১/৮

১১. সদস্যানুমতে রাজা পবিত্রকৃতলক্ষণম্ ।
পশুং রক্তাম্বরং কৃত্বা যূপে তং সমবন্ধয়ৎ ॥ আদিকাণ্ড, ৬২/২৪

১২. ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্বাধ্যায়ব্রতশালিনাম্ ।
সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শাস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবানসি ॥ আদিকাণ্ড, ৭৫/৭

১৩. তামগ্নিমদ্ভির্গুণবদ্ভিরাবৃতাং দ্বিজোত্তমৈর্বেদ-ষড়ঙ্গপারগৈঃ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্মহাত্মভির্মহর্ষিকল্পৈর্ঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৫/২৩

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার ও বিশ্বাস

সকল সমাজেই নানাবিধ সংস্কার বা বিশ্বাস থাকে। এর কিছু ভালো কিছু মন্দ। যুগপরম্পরায় এগুলো লালিত-পালিত হয়। রামায়ণের যুগেও নানা ধরণের সংস্কার ও বিশ্বাস ছিল। দুঃস্বপ্ন, শকুনিদেখা ও তার শব্দ শোনা এসব নিমিত্ত লক্ষণ বা ঘটনা মানুষের আসন্ন সুখ-দুঃখকে সূচিত করে।[১] রাবণের সীতাহরণকালে রাবণকর্তৃক গৃধ্ররাজকে নিহত হতে দেখে সীতা বিলাপ করে এ কথাগুলো বলেছিলেন।

শৃগালের বিকৃতস্বরে ডেকে ওঠা অমঙ্গলের পূর্বাভাস

রাক্ষস মারীচকে হত্যা করে রামচন্দ্র যখন আশ্রমের পথে রওনা হন, তখন তাঁর পেছন থেকে একটি শৃগাল বিকৃত স্বরে ডেকে উঠেছিল। শৃগালের শব্দে রামচন্দ্র অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে রোমহর্ষক ভীষণ শব্দের পরিণতি চিন্তা করলেন: শৃগাল যেভাবে শব্দ করছে, তাতে আমার অমঙ্গলই মনে হচ্ছে।[২]

মৃগ, পাখি কাউকে বামে রেখে বিকট চিৎকার করলে অমঙ্গল

রাক্ষস মারীচকে হত্যা করে পর্ণকুটিরে যাওয়ার পথে রামচন্দ্র দেখলেন, মৃগ ও পাখিরা রামচন্দ্রকে বামে রেখে বিকট চীৎকার করছে। এসব অমঙ্গলের চিহ্ন দেখে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেন: যেভাবে হরিণের দল, শৃগালগুলি আর পাখিরা একসঙ্গে চীৎকার করছে, দিকগুলি আমাদের দিকে হঠাৎ ঝলসে উঠছে, তাতে কি সীতার মঙ্গল হবে ?[৩]

পুরুষের জন্য বাম চোখ, বাম বাহু আর বুক কাঁপাতে আসন্ন বিপদের আশঙ্কা

মারীচকে হত্যার পর রামচন্দ্র দূর থেকে যখন শুধু সীতা ছাড়া লক্ষ্মণকে দেখলেন, তখন তাঁর বাম চোখ, বাম বাহু ও বুক কেঁপেছিল।[৪] সীতার সন্ধানে রাম যখন ছুটে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর বাম চোখের নীচে কাঁপছিল। চলতে গিয়ে তিনি হোঁচট খাচ্ছিলেন, তাঁর শরীর কাঁপছিল। বার বার এই দুর্লক্ষণগুলি দেখে রামচন্দ্র ভাবলেন : সীতার মঙ্গল তো ?[৫]

দিনের মধ্যহ্নভাগ বিজয়মুহূর্ত

দিনের মধ্যাহ্ন তথা দ্বিপ্রহরকে অভিজিৎ বা বিজয়মুহূর্ত বলা হয়। রামচন্দ্র তাই সুগ্রীবকে বলেন: সুগ্রীব, এই মুহূর্তে যাত্রার জন্য তৈরি হও। সূর্য মধ্যগগনে এসে গেছে। এটি বিজয়যাত্রার মুহূর্ত। তাই এখনই যাত্রা করতে হবে।[৬]

উত্তর ফাল্গুনি নক্ষত্র যাত্রার জন্য শুভ

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলেন: আজ উত্তর ফাল্গুনি নক্ষত্র। কাল হস্তা নক্ষত্রের সাথে যুক্ত হবে। সুগ্রীব, আজই এই শুভদিনে সৈন্যসকল সঙ্গে নিয়ে চলো। আজই আমরা যাত্রা করব।[৭]

চোখের ওপরের দিক স্পন্দিত হওয়া শুভ লক্ষণ

হনুমান লঙ্কা হতে ফিরে এসে রামচন্দ্রের কাছে সীতাদেবীর বার্তা পৌঁছে দিলে রামচন্দ্রের চোখের ওপরের দিক স্পন্দিত হয়। তখন তিনি সুগ্রীবকে বলেন: আমার চোখের ওপরের দিক স্পন্দিত হচ্ছে। তাতে আমার বিজয়প্রাপ্তি এবং সীতাকে উদ্ধারের অভিলাষের সিদ্ধি সূচিত হচ্ছে।[৮]

রাবণ কর্তৃক সীতাকে লঙ্কায় আনার পর অমঙ্গলসূচক ঘটনা

সীতাকে লঙ্কায় আনার পর লঙ্কায় অনেক অমঙ্গলসূচক ঘটনা ঘটতে থাকে। অগ্নিকে মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত করা হলেও স্ফুলিঙ্গ এবং শিখার সঙ্গে তা প্রভূত ধূম উদ্‌গিরণ করল। মন্ত্রের দ্বারা আহূত হয়েও অগ্নি বিশেষ বর্ধিত হলো না। উনুনে, অগ্নিহোত্রশালায় এবং বেদপাঠ স্থানগুলিতে সাপেরা কিলবিল করা শুরু করল। আহুতি দেবার দ্রব্যসমূহে পিঁপড়ে ধরল। গাভীর বাঁটে দুধ অদৃশ্য হলো, ভালো ভালো হস্তীগুলি হলো মত্ততাহীন। ভালো ঘাস খেয়েও অশ্বগুলি আরও খাবার জন্য করুণভাবে শব্দ করতে লাগল। গাধা, উট আর খরগুলির রোম খাড়া হয়ে উঠল। তারা চোখের জল ফেলতে থাকল। চিকিৎসা করলেও তারা স্বাভাবিক হলো না। কাকগুলি দলবেঁধে চারদিকে কর্কশ শব্দ করল। শকুনিগুলি উড়ে এসে পীড়িত হয়ে পুরীর ওপরে বসে পড়ল। শেয়ালগুলি প্রাতঃ ও সায়ংকালে অশুভ চীৎকার শুরু করল। কাঁচামাংসভোজী হিংস্র পশুদের সম্মিলিত ঘোর গর্জন নগরীর দ্বারদেশে শোনা যেতে লাগল।[৯]

রামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমণের পূর্বে লঙ্কায় অশুভ ঘটনা

লঙ্কার আকাশে মেঘগুলি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। উষ্ণ রক্ত ভীষণভাবে বর্ষিত হচ্ছিল। অশ্বাদি বাহনেরা ছিল ক্রন্দনরত। তাদের চোখে অশ্রুধারা। পতাকাগুলি বিধ্বস্ত, বিবর্ণ। আগের মতো আর শোভিত ছিল না সেগুলি। হিংস্র পশু, শৃগাল, শকুনিরা লঙ্কার উদ্যানে ঢুকে সমবেতভাবে ভীষণ শব্দ করছিল। গৃহে পূজার জন্য নিবেদিত বস্তু কুকুরগুলি এসে খাচ্ছিল। গাধা গাভীর গর্ভে এবং মুষিক নকুলের গর্ভে

জন্মেছিল। বিড়াল ব্যাঘ্রের সঙ্গে এবং শূকরগুলি কুকুরের সঙ্গে সঙ্গমে মেতেছিল। গৃহপালিত সারিকারা পরস্পর কলহ করে দুর্বল হয়ে একসঙ্গে ঘরের মধ্যে পড়ে গিয়ে 'চী-চী-কু-চী' প্রভৃতি অস্ফুট শব্দ করছিল। পশু-পাখিরা সূর্যের দিকে তাকিয়ে কাঁদছিল।[১০]

রাবণের জন্মক্ষণ ছিল অশুভ

রাবণের জন্মগ্রহণের পর উলকামুখ শিবা তথা স্ত্রী শৃগালেরা এবং মাংসাহারী শকুনপক্ষীরা দক্ষিণদিকে মণ্ডলাকারে পরিক্রম করতে থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র শোণিতধারা বর্ষণ করতে থাকেন। ভয়াল শব্দে মেঘ গর্জন করছিল। সূর্যের প্রভা হয়েছিল মালিন্যপ্রাপ্ত। পৃথিবীতে উল্কাপাত হচ্ছিল। কেঁপে উঠেছিল ধরণী। চতুর্দিকে দেখা দিয়েছিল ভয়ঙ্কর বাত্যাপ্রবাহ। অক্ষোভ্য সরিৎপতি সাগরও হয়েছিল ক্ষুব্ধ।[১১]

ধর্মাত্মা বিভীষণের জন্মক্ষণ ছিল শুভ

কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা বিভীষণের জন্মমুহূর্তে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল। আকাশস্থলীতে দেবগণ দুন্দুভিবাদন শুরু করেছিলেন। নভোমণ্ডলে 'সাধু-সাধু' ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল।[১২]

সত্যোপযাচন বৃক্ষকে প্রণাম

সত্যোপযাচন শব্দের অর্থ যার কাছে প্রার্থনা করলে ব্যর্থ হতে হয় না, সত্য হয়। সত্যোপযাচন বৃক্ষ অর্থাৎ যে বৃক্ষের কাছে যা কামনা করা হয়, তা পূরণ হয়। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর পাঁচজন দূত কেকয়দেশে যাওয়ার পথে সত্যোপযাচন নামক পবিত্র স্বর্গীয়বৃক্ষকে দেখে প্রণাম করেছিলেন।[১৩]

শ্যাম নামক বটবৃক্ষের কাছে সীতাদেবীর প্রার্থনা

বনবাসকালে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ যমুনার তীরে এক বটবৃক্ষ দেখেন। সবুজ পাতায় ভরা বিশাল এই বটবৃক্ষের নাম শ্যাম। সিদ্ধ নামক উপদেবতারা ঐ বৃক্ষের অর্চনা করেন। ঋষি ভরদ্বাজের পূর্ব নির্দেশ মতো সীতাদেবী সেই বৃক্ষকে বন্দনা করে তার কাছে প্রার্থনা করেন।[১৪]

পুত্রের বিদেশ গমনের সময় পিতার মঙ্গলানুষ্ঠান

পুত্রের কল্যাণ কামনায় পিতা স্বস্ত্যয়ন করতেন। পুত্রের বিদেশ গমনের সময় পিতার পুত্রের মঙ্গল কামনায় স্বস্ত্যয়ন করার নিদর্শন পাওয়া যায়।[১৫] ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রম থেকে বিদায় নেয়ার সময় রাম-সীতা-লক্ষ্মণের প্রতি ভরদ্বাজের স্বস্ত্যয়ন বিষয়ে এ প্রসঙ্গটি এসেছে।

নানাবিধ সংস্কার-বিশ্বাস সে যুগে যেমন ছিল, এ যুগেও তার অনেক কিছু দৃশ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১. নিমিত্তং লক্ষণং স্বপ্নং শকুনিস্বরদর্শনম্ ।
অবশ্যং সুখ-দুঃখেষু নরাণাং পরিদৃশ্যতে ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৫২/২

২. তস্য সন্ত্বরমাণস্য দ্রষ্টুকামস্য মৈথিলীম্ ।
ক্রূরস্বনোঽথ গোমায়ুর্বিননাদাস্য পৃষ্ঠতঃ ॥
স তস্য স্বরমাজ্ঞায় দারুণং রোমহর্ষণম্ ।
চিন্তয়ামাস গোমায়োঃ স্বরেণ পরিশঙ্কিতঃ ॥
অশুভং বত মনেঽহং গোমায়ুর্বাশ্যতে যথা ।
স্বস্তি স্যাদপি বৈদেহ্যা রাক্ষসৈর্ভক্ষণং বিনা ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৫৭/২-৪

৩. আজগাম জনস্থানং রাঘবঃ পরিশঙ্কিতঃ।
তং দীনমানসং দীনমাসেদুর্মৃগপক্ষিণঃ ॥
সব্যং কৃত্বা মহাত্মানং ঘোরাংশ্চ সসৃজুঃ স্বরান্ ।
তানি দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি মহাঘোরাণি রাঘবঃ ॥
যথা বৈ মৃগসঙ্ঘাশ্চ গোমায়ুশ্চৈব ভৈরবম্ ।
বাশ্যন্তে শকুনাশ্চাপি প্রদীপ্তামভিতো দিশম্ ।
অপি স্বস্তি ভবেত্তস্যা রাজপুত্র্যা মহাবল ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৫৭/১২-১৩, ২১

৪. স্ফুরতে নয়নং সব্যং বাহুশ্চ হৃদয়ঞ্চ মে।
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণ দূরে ত্বাং সীতাবিরহিতং পথি ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৫৯/৪

৫. ভৃশমাব্রজমানস্য তস্যাধো বামলোচনম্ ।
প্রাস্ফুরচ্চাস্খলদ্ রামো বেপথুশ্চাস্য জায়তে ॥
উপালক্ষ্য নিমিত্তানি সোঽশুভানি মুহুর্মুহুঃ ।
অপি ক্ষেমং তু সীতয়া ইতি বৈ ব্যাজহার হ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬০/১-২

৬. অস্মিন্ মুহূর্তে সুগ্রীব প্রয়াণমভিরোচয়।
যুক্তো মুহূর্তে বিজয়ে প্রাপ্তো মধ্যং দিবাকরঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৪/৩

৭. উত্তরাফাল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে।
অভিপ্রয়াম সুগ্রীব সর্বানীকসমাবৃতাঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৪/৫

৮. উপরিষ্টাদ্ধি নয়নং স্ফুরমাণমিদং মম।
বিজয়ং সমনুপ্রাপ্তং শংসতীব মনোরথম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৪/৭

৯. সস্ফুলিঙ্গঃ সধূমার্চিঃ সধূম-কলুষোদয়ঃ।
মন্ত্রসঙ্ঘ হুতেঽপ্যগ্নির্ন সম্যগভিবর্ধতে ॥
অগ্নিষ্টেষ্বগ্নিশালাসু তথা ব্রহ্মস্থলীষু চ।
সরীসৃপাণি দৃশ্যন্তে হব্যেষু চ পিপীলিকাঃ ॥
গবাং পয়াংসি স্কন্নানি বিমদা বরকুঞ্জরাঃ।
দীনমশ্বাঃ প্রহ্রেষন্তে নবগ্রাসাভিনন্দিনঃ ॥

খরোষ্ট্রাশ্বতরা রাজন্ ভিন্নরোমাঃ স্রবন্তি চ।
ন স্বভাবেঽবতিষ্ঠন্তে বিধানৈরপি চিন্তিতাঃ ॥
বায়সাঃ সঙ্ঘশঃ ক্রূরা ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
সমবেতাশ্চ দৃশ্যন্তে বিমানাগ্রেষু সঙ্ঘশঃ ॥
গৃধ্রাশ্চ পরিলীয়ন্তে পুরীমুপরি পীড়িতাঃ।
উপপন্নাশ্চ সন্ধ্যে দ্বে ব্যাহরন্ত্যশিবং শিবাঃ ॥
ক্রব্যাদানং মৃগাণাঞ্চ পুরীদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ।
শ্রূয়ন্তে বিপুলা ঘোষাঃ সবিস্ফূর্জিতনিঃস্বনাঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০/১৫-২১

১০. রুদতাং বাহনানাঞ্চ প্রপতন্ত্যশ্রুবিন্দবঃ।
রজোধ্বস্তা বিবর্ণাশ্চ ন প্রভান্তি যথাপুরম্ ॥
ব্যালা গোমায়বো গৃধা বাশ্যন্তি চ সুভৈরবম্ ।
প্রবিশ্য লঙ্কামারামে সমবায়াংশ্চ কুর্বতে ॥
কালিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নেষু মুষ্ণন্ত্যো গৃহাণি প্রতিভাষ্য চ ॥
গৃহাণাং বলিকর্মাণি শ্বানঃ পর্যুপভুঞ্জতে।
খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষিকা নকুলেষু চ ॥
মার্জারা দ্বীপিভিঃ সার্ধং শূকরাঃ শুনকৈঃ সহ।
কিন্নরা রাক্ষসৈশ্চাপি সমেয়ুর্মানুষৈঃ সহ ॥
পাণ্ডুরা রক্তপাদাশ্চ বিহগাঃ কালচোদিতাঃ।
রাক্ষসানাং বিনাশায় কপোতা বিচরন্তি চ ॥
চীচীকূচীতি বাশন্ত্যঃ শারিকা বেশ্মসু স্থিতাঃ।
পতন্তি গ্রথিতাশ্চাপি নির্জিতাঃ কালহৈষিভিঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩৫/২৬-৩২

১১. তস্মিন্ জাতে ততস্তস্মিন্ সজ্বালকবলাঃ শিবাঃ।
ক্রব্যাদাশ্চাপসব্যানি মণ্ডলানি প্রচক্রমুঃ ॥
ববর্ষ রুধিরং দেবো মেঘাশ্চ খরনিঃশ্বনা।
প্রবভৌ ন চ সূর্যো বৈ মহোল্কাশ্চাপতন্ ভুবি ॥
চকম্পে জগতী চৈব ববুর্বাতাঃ সুদারুণাঃ।
অক্ষোভ্যঃ ক্ষুভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ উত্তরকাণ্ড, ৯/৩০-৩২

১২. তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ।
নভঃস্থানে দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংস্তথা ।
বাক্যং চৈবান্তরিক্ষে চ সাধু সাধ্বিতি তত্তদা ॥ উত্তরকাণ্ড, ৯/৩৬

১৩. নিকূলবৃক্ষমাসাদ্য দিব্যং সত্যোপযাচনম্ ।
অভিগম্যাভিবাদ্যং তং কুলিঙ্গাং প্রাবিশন্ পুরীম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৮/১৬

১৪. তে তীর্ণাঃ প্লবমুৎসৃজ্য প্রস্থায় যমুনাবনাৎ।
শ্যামং ন্যগ্রোধমাসেদুঃ শীতলং হরিতচ্ছদম্ ॥
ন্যগ্রোধং সমুপাগম্য বৈদেহী চাভ্যবন্দত।
নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতিব্রতম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৫/২৩-২৪

১৫. তেষাং স্বস্ত্যয়নং চৈব মহর্ষিঃ স চকার হ।
প্রস্থিতান্ প্রেক্ষ্যতাংশ্চৈব পিতাপুত্রানিবৌরসান্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৫/২

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি

সংস্কৃতির ধারণাটি বহু বিস্তৃত। দীর্ঘ দিনের নিরন্তর অনুশীলনে একটি সংস্কৃতি পূর্ণতা পায়। সংস্কৃতির ধারণার মধ্যে নান্দনিকতাও আছে। একটি মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, একটি সমাজের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে একটি সমাজের সুস্থতা ও ঋদ্ধি নির্ভর করে।

সংস্কৃতিচর্চায় অযোধ্যা নগরী

যে-কোনো সমাজের সমৃদ্ধি, সুস্থতা, মননশীলতার প্রসারতা প্রভৃতি নির্ভর করে তার উন্নত সংস্কৃতিচর্চার ওপর। এদিক দিয়ে রামায়ণের যুগ বা সমাজ অনেক অগ্রসর ছিল বলে ধারণা করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় অযোধ্যার কথা। অযোধ্যার জনগণ ছিল সংস্কৃতি সচেতন এবং সঙ্গীত পিপাসু। সংস্কৃতিচর্চার একটা পরিপূর্ণ বাতাবরণ ছিল অযোধ্যায়। রাজস্তুতি পাঠক বৈতালিক এবং সঙ্গীতবৃত্তিধারী মাগধেরা অযোধ্যায় আশ্রয় পেয়েছিলেন।[১] অযোধ্যা নগরীতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা,পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনি শোনা যেত।[২] রাজা দশরথের ভবনটি মুরজ, পণব এবং মেঘ নামক বাদ্যযন্ত্রাদির ধ্বনিতে মুখরিত থাকত।[৩] মঙ্গল অনুষ্ঠানে শিল্পীদের নিমন্ত্রণ করা হতো। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তালাপচরা অর্থাৎ তালবাদ্যজীবী এবং মহিলা শিল্পীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অযোধ্যায় বহু নাট্যগৃহ ছিল। সেখানে নিয়মিত নাট্যচর্চা হতো।

রাজভবনে বৈতালিকের গানের মাধ্যমে রাজসেবা শুরু

রাজভবনে সুনিপুণ গায়কেরা রাজার গুণকীর্তন করে তাঁকে ঘুম থেকে ওঠাতেন। রাজা দশরথের রাজভবনের এমন বিবরণ পাওয়া যায়। রাজা দশরথকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য রাজভবনে বৈতালিকেরা গানের মাধ্যমে রাজস্তুতি করতেন। সুশিক্ষিত সূতেরা, উত্তমভাবে পরিশীলিত মাগধেরা, সুনিপুণ গায়কেরা রাজার গুণকীর্তন করে রাজসেবা করতেন।[৪] সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনি এবং ভালো মৃদঙ্গের শব্দে অযোধ্যার রাজকুমারদের ঘুম থেকে জাগানো হতো। সূত, মাগধ এবং বৈতালিকেরা সুমধুর স্তুতি করে রাজপুত্র রামচন্দ্রকে ঘুম থেকে জাগাতেন।[৫]

সংগীত চর্চায় লঙ্কা নগরী

হনুমান লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বরের শ্রুতি সুখকর গান শুনতে পেয়েছিলেন। এ সংগীত এতই মধুর ছিল যে, এটা যেন স্বর্গের কামমুগ্ধা অপ্সরাদের কাঞ্চী আর নূপুরের শিঞ্জন।[৬]

রাবণের রাজভবনে সংগীত চর্চা

রাবণের রাজপ্রাসাদে শোনা যেত নূপুরের নিক্বণ, কাঞ্চীর শিঞ্জন, মৃদঙ্গের বোল।[৭] রাবণের শয়নগৃহের নারীরা সঙ্গীত-বাদ্য ও নৃত্যকলায় পারদর্শিনী ছিলেন। মনোহরণকারী মঙ্গলবাদ্যের ধ্বনিতে রাবণকে ঘুম থেকে জাগানো হতো।[৮] শঙ্খধ্বনির মতো সমুচ্চধ্বনিতে পূর্ণ ছিল রাবণের প্রাসাদ। তূর্যধ্বনিতে নিনাদিত ছিল সেই ভবন।[৯]

তপোবনে সঙ্গীতচর্চা

তপোবনেও সঙ্গীতচর্চা ছিল। বাল্মীকির তপোবনে লালিত বর্ধিত লব-কুশ রামায়ণ গান করত। তারা সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। তারা মহর্ষি বাল্মীকির কাছ থেকে রামায়ণ গান শিখে তপোবনে, রাজপথে, রাজসভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেছে। ব্রাহ্মণ, ঋষি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সাধু ব্যক্তিদের আগমনে লব-কুশ রামায়ণ গান করত। একদিন সমবেত আত্মজ্ঞানী ঋষিদের সভায় দুইভাই সম্মিলিতভাবে রামায়ণ গান পরিবেশন করে। তাদের গান শুনে ঋষিরা খুবই প্রশংসা করেন । ঋষিরা সন্তুষ্ট হয়ে কেউ তাদের দিলেন কলম, কেউ বা বল্কল, কেউ বা কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম, উপবীত, কমণ্ডলু, মঞ্জু নামক তৃণে নির্মিত ব্রহ্মচারীর পরিধেয় মেখলা, কেউ দিলেন কুঠার, কেউ বা গেরুয়া বসন, কেউ বস্ত্রখণ্ড, কেউ বা জটা বাঁধবার সূত্র, কেউ যজ্ঞপাত্র, কেউ বা যজ্ঞডুমুরের কাষ্ঠ নির্মিত পিঁড়ি দিলেন। কেউ বললেন– মঙ্গল হোক, আয়ু বৃদ্ধি হোক। এভাবে ঋষিরা তাদের দু'জনকে আশীর্বাদসহ তপোবনোচিত ভালো ভালো দ্রব্যাদি দান করেন।[১০]

সংগীত চর্চায় কিষ্কিন্ধা নগরী

সংগীত চর্চায় কিষ্কিন্ধা নগরী উৎকর্ষ লাভ করেছিল। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধার রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করে সুমধুর সংগীতের ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। সে সংগীত ছিল সমতাল, পদ ও অক্ষরযুক্ত। অনুষঙ্গ ছিল বীণাদি যন্ত্রের তন্ত্রীধ্বনি।[১১]

নবশস্য নিমিতক যজ্ঞ সম্পাদন

হেমন্ত ঋতুর আগমনে অগ্রহায়ণ মাসে মানুষের ঘরে নতুন ফসলে ভরে যেত। এ সময় মানুষ নতুন শস্যদ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে অর্চনা করতেন। এটাই নবশস্য নিমিতক যজ্ঞ। নতুন শস্য দ্বারা এ যজ্ঞ করলে মানুষ পাপমুক্ত হয়।[১২] নবশস্য নিমিতক যজ্ঞের বর্তমান রূপ অগ্রহায়ণের নবান্ন উৎসবে পরিলক্ষিত। নবশস্যকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানকে সংস্কৃতির অঙ্গ বলা যায়।

স্বস্তিবাচনের মাধ্যমে 'পুণ্যাহ' ঘোষণা

যে-কোনো ধর্মানুষ্ঠানে স্বস্তিবাচন করার বিধি আছে। রাবণের প্রাসাদে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবাচন করে পুণ্যাহ ঘোষণা করতেন। পুণ্যাহ অর্থ পবিত্র দিন। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা দিনটি পবিত্র হোক এই প্রার্থনা করা হতো।[১৩] পুণ্যাহ অনুষ্ঠানও সংস্কৃতির অঙ্গ। রাবণের বিজয়ের জন্য পুণ্যাহ ঘোষণা করা হয়েছে। পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের ঘোষক মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দৈ-ভরা পাত্র, ঘৃত, ফুল এবং আতপ চাউল দিয়ে অর্চনা করা হতো।[১৪]

রামায়ণের যুগে গান-বাজনা, নৃত্যগীত, বিবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানের সুন্দর বাতাবরণ ছিল। রামায়ণে সংস্কৃতি-ঋদ্ধ একটি সুন্দর যুগের পরিচয় পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র :

১. সূত-মাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্ । আদিকাণ্ড, ৫/১১

২. দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৫/১৮

৩. মুরজপণবমেঘঘোষবদ্ দশরথবেশ্ম বভূব যৎ পুরা। অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯/৪১

৪. অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরেবাপরেহ্নি।
বন্দিনঃ পর্যুপাতিষ্ঠংস্তৎ পার্থিবনিবেশনম্ ॥
সূতাঃ পরমসংস্কারা মাগধাশ্চোত্তমশ্রুতাঃ।
গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
রাজানং স্তুবতাং তেষামুদাত্তাভিহিতাশিষাম্ ।

প্রাসাদাভোগবিস্তীর্ণঃ স্তুতিশব্দো হ্যবর্তত ॥
ততস্তু স্তুবতাং তেষাং সূতানাং পাণিবাদকাঃ।
অপদানান্যুদাহৃত্য পাণিবাদান্যবাদয়ন্ ॥অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৫/১-৪

৫. গীত-বাদিত্রনির্ঘোষৈর্বরাভরণনিঃস্বনৈঃ।
মৃদঙ্গবরশব্দৈশ্চ সততং প্রতিবোধিতঃ ॥
বন্দিভির্বন্দিতঃ কালে বহুভিঃ সূত-মাগধৈঃ।
গাথাভিরনুরূপাভিঃ স্তুতিভিশ্চ পরন্তপঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৮/৮-৯

৬. বিবিধাকৃতিরূপাণি ভবনানি ততস্ততঃ।
শুশ্রাব রুচিরং গীতং ত্রিস্থানস্বরভূষিতম্ ॥
স্ত্রীণাং মদনবিদ্ধানাং দিবি চাপ্সরসামিব।
শুশ্রাব কাঞ্চীনিনদং নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৪/১০-১১

৭. নূপুরাণাঞ্চ ঘোষেণ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনেন চ।
মৃদঙ্গতলনির্ঘোষৈর্ঘোষবদ্ভির্বিনাদিতম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৬/৪৩

৮. অথ মঙ্গলবাদিত্রৈঃ শব্দৈঃ শোত্রমনোহরৈঃ।
প্রাবোধ্যত মহাবাহুর্দশগ্রীবো মহাবলঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১৮/৩

৯. শঙ্খঘোষমহাঘোষং তূর্যসম্বাধনাদিতম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০/৪

১০. প্রশশংসুঃ প্রশস্তব্যৌ গায়মানৌ কুশী-লবৌ।
অহো গীতস্য মাধুর্যং শ্লোকানাঞ্চ বিশেষতঃ॥
চিরনির্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্ ।
প্রবিশ্য তাবুভৌ সুষ্ঠু তথা ভাবমগায়তাম্ ॥
সহিতৌ মধুরং রক্তং সম্পন্নং স্বরসম্পদা।
এবং প্রশস্যমানৌ তৌ তপঃশ্লাঘ্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥
সংরক্ততরমত্যর্থং মধুরং তাবগায়তাম্ ।
প্রীতঃ কশ্চিন্মুনিস্তাভ্যাং সংস্থিতঃ কলসং দদৌ ॥
প্রসন্নো বল্কলং কশ্চিদ্দদৌ তাভ্যাং মহাযশাঃ।
অন্যঃ কৃষ্ণাজিনমদাদ্ যজ্ঞসূত্রন্তথাপরঃ ॥
কশ্চিৎ কমণ্ডলুং প্রাদান্মৌঞ্জীমন্যে মহামুনিঃ।
বৃসীমন্যস্তদা প্রাদাৎ কৌপীনমপরো মুনিঃ ॥
তাভ্যাং দদৌ তদা হৃষ্টঃ কুঠারমপরো মুনিঃ।
কাষায়মপরো বস্ত্রং চীরমন্যো দদৌ মুনিঃ ॥
জটাবন্ধনমন্যস্তু কাষ্ঠরজ্জুং মুদান্বিতঃ।
যজ্ঞভাণ্ডমৃষিঃ কশ্চিৎ কাষ্ঠভারং তথাপরঃ ॥
ঔদুম্বরীং বৃসীমন্যঃ স্বস্তি কেচিত্তদাবদন্ ।
আয়ুষ্যমপরে প্রাহুর্মুদা তত্র মহর্ষয়ঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৪/১৭-২৫

১১. প্রবিশন্নেব সততং শুশ্রাব মধুরস্বনম্ ।
তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরাম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৩/২১

১২. নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১৬/৬

১৩. পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্ ।
শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০/৮

১৪. পূজিতান্ দধিপাত্রৈশ্চ সর্পিভিঃ সুমনোক্ষতৈঃ।
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০/৯

Dhaka University Institutional Repository

নগরায়ণ

নগর বা নগরায়ণ মূলত সভ্যসমাজের সৃষ্ট। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হয়েছে পরিকল্পিত নগরের। রামায়ণের যুগে সুসমৃদ্ধ সমাজের সঙ্গে আমরা সে যুগের নগরের সঙ্গেও পরিচিত হই। রামায়ণে পরিকল্পিত নগরায়ণের উল্লেখ আছে। অযোধ্যা ও লঙ্কাপুরী এ দুই নগর ছিল যথেষ্ট পরিকল্পিত ও সুসমৃদ্ধ।

অযোধ্যা নগরী

উত্তর ভারতে সরযূ নদীর তীরে কোশল রাজ্য। এর রাজধানী অযোধ্যা পরিকল্পিত নগর ছিল। এর সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়। এ নগরীর দৈর্ঘ্য দ্বাদশ যোজন এবং প্রস্থ ছিল তিন যোজন। রাজপথগুলি ছিল সুপরিকল্পিত ও প্রশস্ত। প্রত্যহ রাজপথ জলসিক্ত করা হতো। তাই রাজপথ ছিল পরিচ্ছন্ন ও ধূলিবিহীন। পথের দুপাশে ছিল কুসুমিত তরুলতা। অযোধ্যার চারদিকে ছিল প্রাচীর। মধ্যে মধ্যে ছিল কপাট ও সুদৃশ্য তোরণ। এ নগরীতে ছিল উচ্চ তলবিশিষ্ট অট্টালিকা। সেগুলির শীর্ষে উড্ডীন থাকত পতাকা। নগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কামান সন্নিবেশিত ছিল। গৃহসমূহের প্রবেশ পথ ছিল সুপরিকল্পিত।[১]

লঙ্কা নগরী

স্থাপত্যবিদ্যায় রাক্ষসগণ যথেষ্ট উন্নত ছিল– যার প্রমাণ লঙ্কা নগরী। রামায়ণে লঙ্কা নগরীর চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। লঙ্কা সোনার তৈরি প্রাচীরে ঘেরা। পরিখার দ্বারা এ নগরী পরিবৃত। প্রশস্ত ঝকঝকে রাজপথ আর পতাকা শোভিত শত শত অট্টালিকা ছিল সেখানে। পতাকাগুলিতে ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকায় তাতে মধুর শব্দ হতো। সোনার তৈরি তোরণ। প্রাচীরের ওপরে সুরক্ষার জন্য শতঘ্নী ও শূল প্রোথিত থাকত। লঙ্কাপুরীর চতুর্দিকেই ছিল প্রাসাদরাজি। তাতে সব স্তম্ভ আর জানালা সোনা দিয়ে তৈরি। এই মহানগরীর ভবনগুলি সাততলা-আটতলা। বিশাল আকারের স্ফটিক এবং সোনায় ভূষিত ছিল ভবনগুলি। ভবনের ভেতরের অঙ্গনগুলি মণি, স্ফটিক এবং মুক্তার তৈরি। সিঁড়িগুলি ছিল বৈদূর্যমণি ও মুক্তামালায় শোভিত। ধূলিহীন সুন্দর সব চৌচলা। উজ্জ্বল প্রদীপের আলোতে এবং উজ্জ্বল বিশাল গৃহগুলির দীপ্তিতে সেখানকার অন্ধকার তিরোহিত ছিল।[২] সেখানে ছিল পানশালা, পুষ্পগৃহ,

চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ প্রভৃতি। সাজানো সুবিভক্ত ভূমিভাগ ও চত্বর। লঙ্কার উপবনগুলির মধ্যবর্তী রাস্তা, প্রাচীরের মধ্যবর্তী রাস্তা, সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ, মন্দিরের বেদিগুলি, গুহা, পুষ্করিণী সবই ছিল সুপরিকল্পিত। লঙ্কার রাস্তাগুলি সমান্তরাল থাকায় সুন্দর সব চৌমাথা ছিল। চারপাশে কিছুটা জমি খালি রেখে বাড়ি করা হতো। এখানে নগরের গৃহ নির্মাণে সুপরিকল্পনার পরিচয় মেলে। মূলত সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যচেতনায় লঙ্কা ছিল উৎকৃষ্ট নগর।

সুরক্ষিত লঙ্কাপুরী

শত্রুদের কাছে দুর্গম ছিল এই লঙ্কা। এর চারদিকে চারটি বিশাল দ্বার ছিল। দৃঢ় কপাটের দ্বারা রুদ্ধ সেই দ্বারগুলি। দরজায় ছিল বিরাট বিরাট অর্গল। দ্বারদেশে ছিল শক্তিশালী ইম্পল যন্ত্র (স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র)। সেখানে শত্রুসৈন্য এলে ঐ যন্ত্রের দ্বারা তাদের প্রতিরোধ করা হতো। দরজায় বীর রাক্ষসেরা শত শত কামান সাজিয়ে রাখত। সেগুলি ছিল ভীষণ দর্শন, লোহার তৈরি, তীক্ষ্ণ অথচ ঝকঝকে। নিয়মিত সেগুলি সংস্কার করা হতো। লঙ্কার সোনার তৈরি সমুচ্চ প্রাচীর সহজে কেউ পার হতে পারত না। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে খচিত ছিল মণি, প্রবাল, বৈদূর্য এবং মুক্তা। অত্যন্ত গভীর পরিখা দ্বারা চারদিক ঘেরা। সেগুলি দেখতে ভীষণ। তার জল অত্যন্ত শীতল। জলজন্তুতে পূর্ণ সেই পরিখা। চারটি দ্বার পারাপারের জন্য চারটি প্রশস্ত সেতু ছিল। তাতে বহু যন্ত্র বসানো ছিল। সারি সারি বিশাল গৃহও ছিল। অর্থাৎ জল নির্গমনের জন্য এখনকার মতো স্লুইস গেট এবং শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সেখানে বসানো ছিল। শত্রুসৈন্য এলে ঐ যন্ত্রসমন্বিত সেতুগুলি লঙ্কাকে রক্ষা করত। সেই যন্ত্রের দ্বারা শত্রুদের চারদিকের পরিখার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হতো। চারটি সেতুর মধ্যে একটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুদৃঢ়। সেটি কিছুতেই কাঁপত না। সোনার তৈরি অনেক স্তম্ভ এবং বেদির দ্বারা সেই সেতুটি শোভিত ছিল। পরিখা, কামান এবং আরও বিবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল লঙ্কা। এর পূর্ব দ্বারে পাহারা দিত অযুত সংখ্যক রাক্ষস। তাদের হাতে ছিল শূল আর খড়্গ। দক্ষিণ দ্বারে পাহারা দিত নিযুত সংখ্যক চতুরঙ্গ বীর যোদ্ধা। পশ্চিম দ্বারে ছিল সর্বশস্ত্রে কুশলী খড়্গ-চর্ম ধারণকারী অযুতসংখ্যক রাক্ষস। উত্তর দ্বারে ছিল দশকোটি রথী আর অশ্বারোহী।[৩]

রাবণের বাসভবন

রাক্ষসরাজ রাবণের বাসগৃহটি ছিল মন্দরপর্বতের মতো দেখতে। তাঁর বাসভবনের ওপরে ছিল অনেক পতাকা দণ্ড। ভেতরে ছিল অনন্ত রত্ন। চারদিকে জানালাগুলিও নানারত্নে তৈরি। ধীর-স্থির রক্ষীদের দ্বারা সুরক্ষিত। সেখানে ছিল সোনার খাট ও আসন। প্রভূত মণিময় পাত্র সেখানে ছড়িয়ে থাকত।[৪] রাবণগৃহের পাশে লতা-পাতাবেষ্টিত কুঞ্জভবন, চিত্রগৃহ এবং জনসাধারণের জন্য রাত্রিবাসের গৃহ ছিল।

রাবণের রাজসভা

সোনা আর রূপায় সজ্জিত রাবণের রাজসভা। তার মধ্যে মধ্যে ছিল বিশুদ্ধ স্ফটিক। সভা ছিল রেশমের চাদরে আচ্ছাদিত এবং তাতে ছিল সোনার ঝালর। সেই সভাগৃহ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে বৈদূর্যমণি নির্মিত এবং প্রিয়ক নামক মৃগচর্মে আবৃত একটি সুন্দর রাজ সিংহাসন ছিল।[৫]

কুম্ভকর্ণের শয়নগৃহ

কুম্ভকর্ণের শয়নগৃহ দৈর্ঘ্যে দু'যোজন এবং বিস্তৃতিতে এক যোজন ছিল। কুম্ভকর্ণের শয়নের জন্য নির্মিত সেই গৃহে কোনোরূপ বাধা অনুভূত হতো না। ভবনটি সর্বত্র স্ফটিক ও সুবর্ণ স্তম্ভে সুশোভিত ছিল। গৃহটি বৈদূর্যমণিময় সোপান শ্রেণিতে ভূষিত। চারদিকে তার শোভা পেত কিঙ্কণীজাল। ভবনের তোরণদ্বার হস্তিদন্তে নির্মিত ছিল। বজ্র ও স্ফটিকে নির্মিত বেদি তার শোভা বিস্তার করত।[৬]

কিষ্কিন্ধা নগরী

বানর সভ্যতা মূলত আরণ্যক সভ্যতা। বানরগোষ্ঠী সাধারণত পর্বতে ও পর্বতগুহায় বাস করত। কিষ্কিন্ধার গিরিগুহা বানররাজ বালীর রাজধানী। রত্নময় ও পুষ্পিতকাননে সুসজ্জিত সেই গুহা। সে স্থান চন্দন, অগুরু ও পদ্মগন্ধে সুবাসিত। প্রকাণ্ড প্রাসাদে পরিপূর্ণ সেই রাজধানী। শীতল ছায়াযুক্ত, দিব্যমাল্যশোভিত, তপ্তকাঞ্চননির্মিত তোরণ সমন্বিত রমণীয় রাজপ্রাসাদের দৃশ্য ছিল অতি মনোহর। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের সুবর্ণ ও রজত নির্মিত মহামূল্য পালঙ্ক ও আসনসমূহের অসাধারণ আভিজাত্য ছিল। এতে মনে হয় তৎকালীন বানরসভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ছিল।[৭]

রামায়ণের যুগে নগরায়ণ বা নগরসভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ছিল বলেই অনুমিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১. অযোধ্যানামনগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্ ॥
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা ॥
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ ॥
কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরায়ণাম্ ।
সর্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ ॥
সূত-মাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্ ।
উচ্চাট্টাল-ধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৫/৬-৮, ১০-১১

২. কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্ ।
গৃহৈশ্চ গিরিসঙ্কাশৈঃ শারদাম্বুদসন্নিভৈঃ ॥
পাণ্ডুরাভিঃ প্রতোলীভিরুচ্চাভিসংবৃতাম্ ।
অট্টালকশতাকীর্ণাং পতাকা ধ্বজশোভিতাম্ ॥
তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্লতাপঙ্‌ক্তিবিরাজিতৈঃ।
দদর্শ হনুমাঁল্লঙ্কাং দেবো দেবপুরীমিব ॥ সুন্দরকাণ্ড,২/১৬-১৮

৩. বাজিভিশ্চ সুসম্পূর্ণা সা পুরী দুর্গমা পরৈঃ।
দৃঢ়বদ্ধকপাটানি মহাপরিঘবন্তি চ ।
চত্বারি বিপুলান্যস্যা দ্বারাণি সুমহান্তি চ ॥
তত্রেষূপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ।
আগতং পরসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্যতে ॥
দ্বারেষু সংস্কৃতা ভীমাঃ কালায়সময়াঃ শিতাঃ।
শতশো রচিতা বীরৈঃ শতঘ্ন্যো রক্ষসাং গণৈঃ ॥
সৌবর্ণস্তু মহাংস্তস্যাঃ প্রাকারো দুষ্প্রধর্ষণঃ
মণি-বিদ্রুম-বৈদূর্য-মুক্তাবিরচিতান্তরঃ ॥
সর্বতশ্চ মহাভীমাঃ শীততোয়া মহাশুভাঃ।
অগাধা গ্রাহসম্পূর্ণাঃ পরিখা মীনসেবিতাঃ ॥
দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ।
যন্ত্রৈরুপেতা বহুভির্মহদ্ভির্গৃহপঙ্‌ক্তিভিঃ॥
ত্রায়ন্তে সংক্রমাস্তত্র পরসৈন্যাগতে সতি।
যন্ত্রৈস্তৈরবকীর্যন্তে পরিখাসু সমন্ততঃ ॥
একস্তৃকম্প্যো বলবান্ সংক্রমঃ সুমহাদৃঢ়ঃ।
কাঞ্চনৈর্বহুভিস্তম্ভৈর্বেদিকাভিশ্চ শোভিতঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩/১১-১৮

৪. দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে।
স মন্দরসমপ্রখ্যং ময়ূরস্থানসঙ্কুলম্ ॥
ধ্বজযষ্ঠিভিরাকীর্ণং দদর্শ ভবনোত্তমম্ ।
অনন্তরত্ননিচয়ং নিধিজালং সমন্ততঃ ।
ধীরনিষ্ঠিতকর্মাঙ্গং গৃহং ভূতপতেরিব

অর্চির্ভিশ্চাপি রত্নানাং তেজসা রাবণস্য চ।
বিররাজ চ তদ্বেশ্ম রশ্মিবানিব রশ্মিভিঃ ॥সুন্দরকাণ্ড, ৬/৩৮-৪০

৫. আসসাদ মহাতেজাঃ সভাং বিরচিতাং তদা।
সুবর্ণরজতাস্তীর্ণাং বিশুদ্ধস্ফটিকান্তরাম্ ॥
বিরাজমানো বপুষা রুক্মপট্টোত্তরচ্ছদাম্ ।
তাং পিশাচশতৈঃ ষড়ভিরভিগুপ্তাং সদাপ্রভাম্ ॥
প্রবিবেশ মহাতেজাঃ সুকৃতাং বিশ্বকর্মণা।
তস্যাং তু বৈদূর্যময়ং প্রিয়কাজিনসংবৃতম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১/১৪-১৬

৬. দর্শনীয়ং নিরাবাধং কুম্ভকর্ণস্য চক্রিরে।
স্ফাটিকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈঃ স্তম্ভৈঃ সর্বত্র শোভিতম্ ॥
বৈদূর্যকৃতসোপানং কিঙ্কিণীজালকং তথা।
দান্ত-তোরণবিন্যস্তং বজ্রস্ফটিকবেদিকম্ ॥ উত্তরকাণ্ড,১৩/৪-৫

৭. স তাং রত্নময়ীং দিব্যাং শ্রীমান্ পুষ্পিতকাননাম্ ।
রম্যাং রত্নসমাকীর্ণাং দদর্শ মহতীং গুহাম্ ॥
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং নানারত্নোপশোভিতাম্ ।
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতাম্ ॥
চন্দনাগুরুপদ্মানাং গন্ধৈঃ সুরভিগন্ধিতাম্ ।
মৈরেয়াণাং মধূনাঞ্চ সম্মোদিতমহাপথাম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৩/৪-৫,৭

Dhaka University Institutional Repository

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান

সুপ্রাচীন কাল থেকে যে-কোনো শুভকার্যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করার রীতি পরিদৃষ্ট। রামাযণের যুগে সমাজে এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

গৃহপ্রবেশের পূর্বে বাস্তুপূজা

গৃহনির্মাণ করে বাস্তুপূজা করে গৃহপ্রবেশের বিধান ছিল তখন। বাস্তুপূজায় দেবতার অর্চনা করে গৃহস্বামীর কল্যাণ কামনা করা হতো। চিত্রকূটে লক্ষ্মণ পর্ণকুটীর নির্মাণ করার পর গৃহপ্রবেশের পূর্বে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা শাস্ত্রবিধি অনুসারে বাস্তুপূজা করেছিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছেন: যারা দীর্ঘজীবী হতে চায়, তাদের বাস্তুশান্তি করা উচিত।[১] রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ধ্রুবনক্ষত্রসমন্বিত দিনে এণ নামক হরিণের মাংস যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন। অভীষ্ট সকল দেবতার পূজা শেষ করে পবিত্রচিত্তে তাঁরা বাসগৃহে প্রবেশ করেন। বাসগৃহে প্রবেশ করার পর তাঁরা বৈশ্বদেবগণকে, রুদ্রকে, বিষ্ণুকে পূজা করে বাস্তুশান্তির মাঙ্গলিক কাজ করেছিলেন।[২] পঞ্চবটীতেও পর্ণশালা নির্মাণ করে তাঁরা বাস্তুপূজা করেছিলেন। লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান করে পদ্মফুল ও ফল নিয়ে এসেছিলেন। তারপর ফুল দিয়ে পূজা করে বিধি অনুসারে বাস্তুশান্তি করেছিলেন।[৩]

যাত্রামঙ্গল অনুষ্ঠান

দূরে কোথাও গমনের পূর্বে যাত্রামঙ্গল অনুষ্ঠান হতো। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর পুরোহিত বসিষ্ঠ মুনির নির্দেশে পাঁচজন দূতের কেকয়দেশে গমনকালে যাত্রামঙ্গল অনুষ্ঠান হয়েছিল।[৪]

মঙ্গলদ্রব্য দিয়ে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের অর্চনা

রাবণের প্রাসাদে প্রবেশ করে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দেখে বিভীষণ তাঁদেরকে দৈ ভরা পাত্র, ঘৃত, ফুল এবং আতপ চাউল দিয়ে অর্চনা করেছিলেন।[৫]

অভিষেকে মঙ্গলদ্রব্যের ব্যবহার

রাজ্যাভিষেকের সময় বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য ব্যবহারের বিধান ছিল। বিভীষণের রাজ্যাভিষেকের পর পুরবাসী রাক্ষসেরা আনন্দের সঙ্গে দৈ, আতপচাল, মোদক, খৈ এবং ফুল নিয়ে এসেছিল। বীর বিভীষণ এ সকল মঙ্গলদ্রবা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নিবেদন করেছিলেন।[৬]

যুদ্ধজয়ের পর বীরযোদ্ধাকে মঙ্গলদ্রব্যে অভিনন্দন

যুদ্ধজয়ী বীরকে মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিনন্দিত করার রীতি ছিল। কার্তবীর্যার্জুন যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করে যখন তাঁর রাজধানী মাহিষ্মতীপুরীতে প্রবেশ করেন, তখন পুরজন রাজা অর্জুনের মাথায় ফুল আর আতপ চাল ছড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।[৭]

সুস্থ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সে যুগের একটা সুস্থ সমাজের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র:

১. ঐণেয়ং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্ ।
কর্তব্যং বাস্তুশমনং সৌমিত্রে চিরজীবিভিঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৬/২২

২. ইষ্ট্বা দেবগণান্ সর্বান্ বিবেশাবসথং শুচিঃ।
বভূব চ মনোহ্লাদো রামস্যামিততেজসঃ ॥
বৈশ্বদেববলিং কৃত্বা রৌদ্রং বৈষ্ণবমেব চ।
বাস্তুসংশমনীয়ানি মঙ্গলানি প্রবর্তয়ন্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৬/৩০-৩১

৩. স গত্বা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্নদীং গোদাবরীং তথা।
স্নাত্বা পদ্মানি চাদায় সফলঃ পুনরাগতঃ ॥
ততঃ পুষ্পবলিং কৃত্বা শান্তিঞ্চ স যথাবিধি।
দর্শয়ামাস রামায় তদাশ্রমপদং কৃতম্ ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১৫/২৪-২৫

৪. ততঃ প্রাস্থানিকং কৃত্বা কার্যশেষমনন্তরম্ ।
বসিষ্ঠেনাভ্যনুজ্ঞাতা দূতাঃ সংত্বরিতং যযুঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৮/১১

৫. পূজিতান্ দধিপাত্রৈশ্চ সর্পিভিঃ সুমনোক্ষতৈঃ।
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১০/৯

৬. দধ্যক্ষতাম্মোদকাংশ্চ লাজাঃ সুমনসস্তথা।
আজহ্রুরথ সংহৃষ্টাঃ পৌরাস্তস্মৈ নিশাচরাঃ ॥
স তান্ গৃহীত্বা দুর্ধর্ষো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ।
মাঙ্গল্যং মঙ্গলং সর্বং লক্ষ্মণায় চ বীর্যবান্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১২/২০-২১

৭. স কীর্যমাণঃ কুসুমাক্ষতোৎকরৈর্দ্বিজৈঃ সপৌরৈঃ পুরুহূতসন্নিভঃ।
ততোঽর্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ তাং পুরীং বালিং নিগৃহ্যেব সহস্রলোচনঃ ॥ উত্তরকাণ্ড, ৩২/৭৩

বিবিধ

সামাজিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কর্মকাণ্ড, লোকাচার বহু ব্যাপক। এ সব বিষয়কে সুনির্দিষ্ট ছকে ফেলে আলোচনা করা সহজ নয়। অনেক বিষয় আলোচনার পর মনে হয় আরও অনেক কিছু অনালোচিত থেকে গেল। আবার কিছু বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্তীকরণে দ্বিধায় পড়তে হয়। এ সব দিক ভেবে বিবিধের মধ্যে রামায়ণের অনেক বিষয়, যা সমাজমধ্যেই গণ্য হতে পারে তা এখানে আলোচিত হলো।

শিষ্টাচার

একটি সুস্থ সুন্দর সমাজের জন্য মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহৃদ্য এবং শিষ্টাচার অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। রামায়ণের যুগের সমাজে এটি বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট।

গুরুজনদের কাছে বিনীতভাবে যাওয়া শিষ্টাচার

রামচন্দ্রকে বন হতে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ভরত তাঁর মাতৃগণ, মন্ত্রিমণ্ডলী, রাজপুরোহিত বসিষ্ঠকে নিয়ে সসৈন্য রামের সন্ধানে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। আশ্রম থেকে ক্রোশ পরিমাণ পূর্বেই ভরত সকল সৈন্যসামন্ত রেখে কেবল মন্ত্রীদের নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করেন। ধর্মজ্ঞ রাজপুত্র ভরত তাঁর শস্ত্র ও রাজকীয় পোশাক ত্যাগ করেন। পরিধান করেন উত্তরীয়। সম্মুখে পুরোহিত বসিষ্ঠকে নিয়ে পায়ে হেঁটে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে তাঁরা পৌঁছেছিলেন।[১] এখানে লক্ষণীয়, রাজপুত্র ভরত অতি সাধারণ বেশে, শুধু রাজপুরোহিতকে নিয়ে বিনীতভাবে আশ্রমে পৌঁছেছিলেন। মুনি-ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এবং আশ্রমের শান্ত পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা, এটা শিষ্টাচার হিসেবেই পরিগণিত।

অযোধ্যার রাজ্যলাভের পর রামচন্দ্র মুনি-ঋষিদের আগমন বার্তা শুনে দ্বারপালকে জানালেন, তুমি গিয়ে তাঁদের এখানে নিয়ে এস। দেখ, তাঁদের যেন কোনো কষ্ট না হয়। তাঁরা রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হলে রামচন্দ্র করজোড়ে দণ্ডায়মান হন। তাঁদের যথাবিধি পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিয়ে অর্চনা করেন। এবং অর্চনা করার আগেই উপস্থিত প্রত্যেক মুনিকে তিনি একটা করে গাভী দান করেন।

পরিচয়পর্বে শ্রদ্ধেয়জনের সম্মুখে নিজের নাম উচ্চারণ করে প্রণাম করা শিষ্টাচার

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অত্রিমুনির আশ্রমে আগমন করলে মুনি তাঁদের অভিনন্দন জানান। রাম-লক্ষ্মণ নিজেদের নাম উচ্চারণ করে ঋষিবরকে বন্দনা করেন। সীতাদেবী ঋষিপত্নী অনসূয়া দেবীকে নিজের

নাম উচ্চারণ করে প্রণাম করেছিলেন।[২] শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে বিভীষণ, শুক ও প্রহস্ত রাজসভায় প্রথমে নিজের নাম উচ্চারণ করে পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের চরণ বন্দনা করেছিলেন।[৩] রাম-সীতা অযোধ্যায় ফিরে আসার পর ভরত নিজের নাম উচ্চারণ করে সীতাদেবীকে প্রণাম করেছিলেন।[৪]

দশবিধ সংস্কার

প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সমাজে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন এবং বিবাহ এই দশবিধ সংস্কার ধর্মের প্রধান অঙ্গরূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। রামায়ণে বিস্তৃতভাবে সকল সংস্কারের বর্ণনা পাওয়া যায় না। বিবাহ, নামকরণ, জাতকর্ম এগুলির বর্ণনা রামায়ণে আছে। এখানে শুধু নামকরণ ও জাতকর্ম সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দেয়া হলো। বিবাহ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

নামকরণ অনুষ্ঠান

নবজাতকের নামকরণ একটি বৈদিক সংস্কার। জন্মের একাদশ বা দ্বাদশ দিনে ঐ সংস্কার করার বিধান। নবজাত সন্তানের কল্যাণ কামনায় এ অনুষ্ঠানে অনেক দান-দক্ষিণা করা হতো। রাজা দশরথ তাঁর পুত্রদের জন্মের এগার দিন অতিবাহিত হলে নামকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানটি ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। রাজা দশরথের কুলপুরোহিত, কুলগুরু এবং প্রধানমন্ত্রী মহর্ষি বসিষ্ঠ রাজপুত্রদের নামকরণ করেছিলেন। এ অনুষ্ঠানে নৃপতি দশরথ ব্রাহ্মণ,নাগরিক ও পল্লীবাসীদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের তিনি বহু উৎকৃষ্ট রত্ন দান করেছিলেন।[৫] ঋষি বিশ্রবার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণের পর নবজাতকের পিতামহ ঋষি পুলস্ত্য অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দেবর্ষিগণের সঙ্গে বসে তার নামকরণ অনুষ্ঠান করেছিলেন।[৬]

জাতকর্মাদি সংস্কার

সন্তান জন্মের পর যে বৈদিক সংস্কার করবার নিয়ম, তার নাম জাতকর্ম। রাজা দশরথ তাঁর পুত্রদের জাতকর্মাদি সকল সংস্কার সম্পাদন করেছিলেন।[৭]

পারলৌকিক সংস্কার

মৃত্যুর পর মৃতদেহকে কেন্দ্র করে এবং মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য যে কৃত্য তা পারলৌকিক সংস্কার নামে অভিহিত। রামায়ণের যুগে সমাজে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা সংস্কার ছিল।

তৈলপাত্রে মৃতদেহ সংরক্ষণ

বর্তমানে মৃতদেহ কয়েকদিনের জন্য সংরক্ষণের জন্য হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়। রামায়ণের যুগে মৃতদেহকে সংরক্ষণের জন্য বিরাট তৈলযুক্ত পাত্রে রাখা হতো। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর কুলগুরু এবং প্রধানমন্ত্রী বসিষ্ঠ অন্যান্য অমাত্যদের পরামর্শ অনুসারে রাজার মৃতদেহ তেলভরা এক বিরাট পাত্রে রাখা হয়েছিল। রাজা দশরথের মৃত্যুর সময় তাঁর কোনো পুত্র অযোধ্যায় উপস্থিত ছিল না বলে রাজদেহ তৈলপাত্রে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।[৮]

এক ব্রাহ্মণ বালক অকালে মারা গেলে তার পিতা রাজা রামচন্দ্রের কাছে পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর পুত্রের অকাল মৃত্যুর জন্য রাজাকে দোষী করে বিলাপ করেন। রামচন্দ্র বালক ব্রাহ্মণের অকাল মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের পূর্বে লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন: হে সৌম্য, তুমি এই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে উত্তম সান্ত্বনা দান করো। বালকের দেহ তৈলদ্রোণীর মধ্যে সংরক্ষিত করো। বালকের শরীর যাতে বিকৃত অথবা নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য তুমি উত্তম গন্ধদ্রব্যে ও সুগন্ধি তেল দিয়ে তার রক্ষার ব্যবস্থা করো। শুভাচারসম্পন্ন বালকের শরীর যাতে সুরক্ষিত থাকে, বিকৃত বা খণ্ডিত না হয়, তুমি তার উপায় নির্ধারণ করো।[৯]

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দশরথের উদ্দেশে তর্পণ ও পিণ্ডদান

ভরতের কাছে দশরথের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা নতুন বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করে তাঁর উদ্দেশে মন্দাকিনীর জল দ্বারা তর্পণ করেছিলেন। তাঁরা তর্পণের জল সিঞ্চন করে বলেছিলেন: রাজন্, এই জল আপনি গ্রহণ করুন। রামচন্দ্র জলপূর্ণ অঞ্জলি গ্রহণ করে দক্ষিণ মুখ হয়ে ক্রন্দন করে বলেছিলেন: হে রাজশ্রেষ্ঠ, আমার প্রদত্ত এই নির্মল জল পিতৃলোকগত আপনার কাছে অক্ষয় হয়ে পৌঁছে যাক।[১০] এরপর তাঁরা মন্দাকিনীতীরে উঠে আসেন। তখন কুশের আস্তরণের ওপর বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদি এবং তিলবাটার পিণ্ড দিয়ে ক্রন্দনরত রামচন্দ্র বলেন: মহারাজ, এই ভোজ্য গ্রহণ করে আপনি প্রীত হোন। বনে এই আমাদের আহার্য। রাজন্, মানুষ যে অন্ন গ্রহণ করে, পিতৃগণ ও দেবগণও তাই গ্রহণ করেন।[১১] রাজপুত্র রামচন্দ্র রাজধানীতে থাকলে রাজকীয়ভাবে পিতার উদ্দেশে

পিণ্ডদানসহ পারলৌকিক কৃত্য করতে পারতেন। কিন্তু রামচন্দ্র বনবাসী। তাই পিতার উদ্দেশে সামান্য ইঙ্গুদি ও তিলবাটা দিয়ে পিণ্ড দেওয়ায় তাঁর মনে দুঃখ হয়েছিল।

রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক পক্ষীরাজ জটায়ুর পারলৌকিক সংস্কার

পক্ষীরাজ জটায়ু ছিলেন রাজা দশরথের বন্ধু। রাম-লক্ষ্মণ তাঁকে পিতৃসম সম্মান করেছেন। সীতাহরণকালে জটায়ু রাবণকে বাধা দিলে রাবণ তার পাখা কেটে দিয়ে তাঁকে মৃতপ্রায় করে রেখে যান। রাম-লক্ষ্মণকে সীতাহরণের সংবাদ দিয়ে জটায়ু তাঁদের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন। তখন পুত্রের ন্যায় রামচন্দ্র পক্ষীরাজ জটায়ুকে প্রদীপ্ত চিতায় তুলে দিয়ে তাঁর সৎকার করেন। রাম-লক্ষ্মণ বিরাট হরিণ মেরে মাংসখণ্ডকে পিণ্ড করে কুশের আস্তরণের ওপর রেখে জটায়ুর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। ব্রাহ্মণগণ মৃতজনের ঊর্ধ্বগতির জন্য যে সকল মন্ত্র জপ করেন, রামচন্দ্র জটায়ুর স্বর্গগমনের জন্য সেই পিতৃকামোচিত মন্ত্র জপ করেছিলেন। এরপর রাম-লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান করে শাস্ত্রীয় বিধিতে জটায়ুর জন্য জল নিয়ে তর্পণ করেন। তাঁরা পক্ষীরাজের প্রতি পিতৃজনোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করে পারলৌকিক সংস্কার সম্পন্ন করেছিলেন।[১২]

বানররাজ বালীর পারলৌকিক সংস্কার

বানররাজ বালীর মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শিবিকাতে বহন করা হয়েছিল। সুন্দর আসনযুক্ত সেই শিবিকাটি ছিল স্বর্গীয় রথের মতো। তাতে আঁকা ছিল নানা পাখি আর গাছপালা। চারদিকে নানাচিত্র তাতে সুন্দরভাবে চিত্রিত ছিল। জাল দেওয়া জানালাযুক্ত সেই শিবিকাকে স্বর্গীয় বিমানের মতোই মনে হয়েছে। শিল্পীদের দ্বারা সুন্দরভাবে নির্মিত সেই শিবিকা। বিশাল আকার তার। বিচিত্র সব কারুকার্য সেই শিবিকার গায়ে। সুন্দর অলঙ্কারে সুসজ্জিত। সুন্দর মালা দিয়ে সাজানো। তাতে ছিল গুহা ও গহন বনের আঁকা ছবি। রক্তচন্দনে ভূষিত, প্রভূত ফুল আর পদ্মমালায় সজ্জিত সেই শিবিকা ছিল নবোদিত সূর্যের মতো উজ্জ্বল। বিবিধ মাল্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত করে বালীকে শিবিকায় স্থাপন করা হয়। বালীকে বহন করা শিবিকার সামনে বানরেরা নানাবিধ রত্ন ছড়াতে ছড়াতে গমন করেছিল। শোকে বিহ্বল অঙ্গদ সুগ্রীবের সাহায্যে বালীকে চিতায় স্থাপন করেন। এরপর বিধি অনুসারে অগ্নি প্রজ্বলিত করে অঙ্গদ চিতা পরিক্রম করেন। বালীর সৎকার করে তুঙ্গভদ্রানদীতে জলসিঞ্চন করে সকল বানর

অঙ্গদকে সম্মুখে রেখে সুগ্রীব ও তারার সঙ্গে তর্পণ করে। শাস্ত্রানুসারেই বালীর দাহকার্য রাজকীয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।[১৩]

রাক্ষসরাজ রাবণের দাহসংস্কার

রাক্ষসরাজ রাবণের দাহসংস্কার রাজকীয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। রাবণের মৃত্যুর পর তাঁর অগ্নিহোত্র সংস্কারের জন্য বিভীষণ শকট, দারুপত্র, অগ্নি এবং যাজকদের সংগ্রহ করেন। রাবণের দেহটিকে পট্টবস্ত্র পরিয়ে সোনার তৈরি সুন্দর শিবিকাতে তোলা হয়। রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা অশ্রুসিক্ত চোখে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় জানান। তূর্যধ্বনি ও বিবিধ স্তবের দ্বারা রাজকীয় মর্যাদায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পতাকা ও সুন্দর ফুল দিয়ে সাজানো শিবিকা এবং কাষ্ঠরাশি বাহকেরা কাঁধে তুলে নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। অধ্বর্যুদের হাতে ছিল প্রদীপ্ত অগ্নি । রঙ্কুমৃগ চর্মের আস্তরণের ওপর চন্দন কাঠ, পদ্ম, উশীর এবং চন্দনের দ্বারা বৈদিক বিধিতে চিতা তৈরি করা হয়। রাক্ষসরাজের পিতৃমেধযজ্ঞ নামক এই শ্রেষ্ঠ দাহসংস্কারটি ঋত্বিকেরা সম্পন্ন করেন। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বেদি নির্মাণ করে যথাস্থানে অগ্নিস্থাপন করা হয়েছিল। রাবণের স্কন্ধদেশে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব রাখা হয়েছিল। মহর্ষিদের দেওয়া বিধানে শাস্ত্রীয় পন্থায় মেধ্য পশুকে হত্যা করে তার চর্মের দ্বারা রাক্ষসেরা রাবণের মুখ ঢেকে দিয়েছিল। তাঁর মুখাবরণটি ঘৃতে সিক্ত করা হয়েছিল। প্রবল দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরা রাক্ষসরাজকে গন্ধদ্রব্য এবং মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত করেছিল। নানা রকম বস্ত্র ও খৈ তাঁর দেহের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর বিভীষণ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁর দেহে অগ্নি প্রদান করেন। সৎকারের পর স্নানান্তে বিভীষণ সিক্ত বস্ত্রেই তিল এবং কুশমিশ্রিত জল দিয়ে রাবণের উদ্দেশে তর্পণ করেন।[১৪]

সম্পাতির জটায়ুর উদ্দেশে তর্পণ

পক্ষীরাজ জটায়ুর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি সাগরের জলে জটায়ুর উদ্দেশে তর্পণ করেছিলেন।[১৫]

সগর সন্তানদের উদ্দেশে ভগীরথের তর্পণ

ব্রহ্মার আদেশে রাজর্ষি ভগীরথ শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর পিতামহদের (সগরসন্তানদের) উদ্দেশে তর্পণ করেছিলেন।[১৬]

মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির স্পর্শযুক্ত কোনো কিছু রাখতে নেই

মৃত্যুপথযাত্রী বালী মৃত্যুর পূর্বে সুগ্রীবকে তাঁর গলার স্বর্গীয় মালাটি গ্রহণ করতে বলেন। বালী চেয়েছিলেন, জীবিতাবস্থাতেই সুগ্রীব মালাটি গ্রহণ করুক। কেননা বালী মারা গেলে তাঁর মৃতদেহের স্পর্শে মালা থেকেও চলে যাবে।[১৭]

আত্মহত্যা

মানুষের আত্মহত্যার প্রবণতা চিরকালীন। নানা কারণেই এই আত্মহত্যার ব্যাপারটি দেখা যায়। একালের মতো রামায়ণের যুগেও মানুষের আত্মহত্যার অনেক নিদর্শন আছে। জলে ডোবা, অগ্নিপ্রবেশ, বিষভক্ষণ ও উদ্বন্ধন এ কয়টি আত্মহত্যার উপায় লোকসমাজে জানা ছিল। মারীচ মৃত্যুর সময় রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে লক্ষ্মণ ও সীতার নাম বলে আর্তনাদ করেছিল। তখন সীতার কাছে তা রামচন্দ্রেরই কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের কাছে দ্রুত যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ বুঝতে পেরেছিলেন, এটা মারীচের ছলনাপূর্ণ কণ্ঠস্বর। তিনি রামচন্দ্রের পূর্বনির্দেশের কথা মনে করে সীতার কাছেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। উদ্বিগ্ন সীতা তখন ভুল বুঝে ক্ষোভে দুঃখে নিষ্ঠুর হয়ে লক্ষ্মণকে বলেন: লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র না এলে আমি গোদাবরীর জলে ডুবে মরব। অথবা গলায় দড়ি দেব। নিজের দেহ ত্যাগ করব। উগ্র বিষ পান করব। কিংবা আগুনে ঝাঁপ দেব। তবুও রাম ছাড়া কখনও আর কোনও পুরুষকে স্পর্শ করব না।[১৮]

আত্মহত্যার আরও কয়েকটি উপায় জানা যায় সীতার খোঁজ না পেয়ে বিষাদগ্রস্ত হনুমানের বক্তব্যে। হনুমান ভাবলেন: সীতার খোঁজ না পাওয়ার সংবাদ রামচন্দ্রকে জানালে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি উত্তেজিত হবে এবং এই উত্তেজনায় তিনি আর বাঁচবেন না।[১৯] ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়ে মারা যাওয়াকে বর্তমানে স্ট্রোক করে মারা যাওয়া বলা যেতে পারে। একে অবশ্য আত্মহত্যার মধ্যে গণ্য করা যাবে না। তরে এ মৃত্যু স্বাভাবিকও নয়। পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার উপায় জানা যায় হনুমানের কথায়: প্রভুর দুঃখে পীড়িত হয়ে বানরেরা পুত্র,পত্নী এবং অমাত্যদের নিয়ে পাহাড়ের উঁচু থেকে সমান এবং উঁচু-নিচু জায়গায় লাফিয়ে মারা যাবে। তারা বিষপান করে কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করে নতুবা অনশনে নয়তো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে প্রাণত্যাগ করবে।[২০]

সীতাদেবী অশোকবনে বিলাপ করে বলেছিলেন: আমি এখন জীবন ত্যাগ করব। বিষপান করে অথবা তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে এখনই আমি জীবন বিসর্জন দেব। কিন্তু এই রাক্ষসের গৃহে কে আমায় বিষ দেবে বা অস্ত্র এনে দেবে ? শোকে অত্যন্ত আর্ত হয়ে সীতা বহুরকম চিন্তা করে চুল বাঁধা বেণী গ্রহণ করেন। ভাবলেন, এই বেণী গলায় বেঁধে উদ্বন্ধনে তিনি শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবেন।[২১]

লঙ্কাপুরীর অনেকাংশ দগ্ধ করে হনুমান ভীষণ ভীত হয়ে চিন্তা করলেন: দেবী সীতা মনে হয় দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। বুদ্ধি বিপর্যয়ে আমি যদি সীতা-উদ্ধার কাজ বিনষ্ট করে থাকি, তাহলে এখনই এখানে প্রাণত্যাগ করা আমার পক্ষে ভালো মনে হচ্ছে। আমি কি এই আগুনে ঝাঁপ দেব, না সমুদ্রের মধ্যে যে আগুন জ্বলে সেই বাড়বানলে আত্মসমর্পণ করব, না সাগরে যারা বাস করে সেই কুম্ভীরাদি জীবদের কাছে আমার শরীরকে তুলে দেব ? [২২]

নরকগামী ব্যক্তি

রাজঘাতী, ব্রাহ্মণঘাতী, গো-হত্যাকারী, চোর, জীবহত্যাকারী, আত্মা ও পরলোকে অবিশ্বাসী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহের পূর্বে যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করে, তারা সবাই নরকগামী হয়। খল, কৃপণ, বন্ধুহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী এদেরও নরকগমন ঘটে।[২৩] রামের বাণাঘাতে মৃত্যুপথযাত্রী বালী রামকে তিরস্কার করে এ কথাগুলি বলেছিলেন।

চতুরাশ্রম

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস মানবজীবনকে এই চার স্তরে বিভাজন করা হয়েছে। ব্রহ্মচর্য মূলত ছাত্রজীবন। ব্রহ্মচর্য্য জীবনের ধর্ম মূলত বিদ্যাশিক্ষা ও সংযমব্রত পালন করা। গার্হস্থ্য মূলত সংসার জীবন। গার্হস্থ্যের শেষে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান বাণপ্রস্থ জীবনের উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস আশ্রমে মুক্তির চেষ্টা। চতুরাশ্রম সে যুগে রাজারাও রক্ষা করতেন। রাজর্ষি জনক তাঁর কন্যার বিবাহসভায় নিজ বংশপরিচয় বলার সময় বলেন যে তাঁর পিতা হ্রস্বরোমা তাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনগমন করেন।[২৪]

চাতুর্বর্ণ্য

রামায়ণের সমাজে চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ। ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছিল জ্ঞানচর্চা করা। তাঁরা সমাজের জ্ঞানশক্তির ধারক। ক্ষত্রিয়ের কাজ ছিল সামরিক শক্তির লালন-পালন, রাজ্যপালন। বৈশ্য ধনশক্তির সঙ্গে যুক্ত এবং শূদ্রের কাজ ছিল শ্রমশক্তির সংরক্ষণ। প্রত্যেকের বৃত্তি ছিল জন্মগত। তবে কর্মের কারণে অনেকে বর্ণান্তর গ্রহণ করতে পারত। সাধারণত কেউ অন্যবর্ণের বৃত্তিকে গ্রহণ করত না। রামচন্দ্র সমাজের চাতুর্বর্ণ্যকে রক্ষা করতেন। লঙ্কায় সীতার কাছে রামচন্দ্রের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে হনুমান বলেন: রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে কিনা রামচন্দ্র তা দেখতেন। জনগণকে তিনি সম্মান করতেন।[২৫]

রামচন্দ্রের যুগে শূদ্রের তপস্যাচরণকে অসহনীয় পাপকর্ম হিসেবে গণ্য করা হতো। তাই স্বর্গলাভে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তপস্যারত শূদ্র শম্বুকবধে রামচন্দ্রের কোনো দ্বিধা হয়নি। বর্ণের সুবিধা না পেলেও কেবল যোগ্যতা বলে যে-কোনো উচ্চতায় পৌঁছানোর সুযোগ ঐ যুগে দেওয়া হতো না। যুগধর্মের বিচারে রামচন্দ্র শম্বুকবধ করেছিলেন, কিন্তু আধুনিক যুগের বিচারে এই শম্বুকবধ গ্রহণযোগ্য নয়। রামচন্দ্রের শাসনব্যবস্থায় শম্বুকবধ একটি মসীলিপ্ত অধ্যায় হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে।

জ্যোতিষচর্চা

রামায়ণে জ্যোতিষ সংক্রান্ত যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে প্রমাণিত হয়, সে যুগে জ্যোতিষচর্চায় অনেক উন্নতি হয়েছিল। অযোধ্যার রাজকুমারদের জন্মের লগ্ন, তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতি রামায়ণে উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র চৈত্রমাসের নবমী তিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে, কর্কট লগ্নে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬] ভরত মীনলগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কট লগ্নে অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২৭]
পুষ্যানক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেকের লগ্ন স্থির হয়েছিল– তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি।[২৮]

রামচন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র দেখে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। চন্দ্র উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থান করলে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি সুগ্রীবকে বলেন, সূর্য মধ্যগামী হওয়ায় বিজয়প্রদ অভিজিৎ নামক

মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রা করা বিধেয়। রাবণ বিন্দ নামক লগ্নে সীতাকে হরণ করেন। সংস্কারানুযায়ী বিন্দ লগ্নে অপহৃত ধন অচিরে ফেরত আসে।

সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কথা রামায়ণে উল্লেখ আছে। মকরক্রান্তি রেখা থেকে সূর্যের ক্রমশ উত্তরে সরে যাওয়াকে উত্তরায়ণ বলে। কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সূর্যের ক্রমশ দক্ষিণে সরে যাওয়াকে দক্ষিণায়ন বলে। রামায়ণে উল্লেখ আছে ছয়মাস সূর্যের উত্তরায়ণ ও ছয়মাস সূর্যের দক্ষিণায়ন হয়। হেমন্ত ও শীতকালে সূর্যের দক্ষিণায়ন চলে। হেমন্তকালের পূর্ণিমার জ্যোৎস্না সম্বন্ধে রামচন্দ্র বলেছেন:

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুষারমলিন হয়ে যাওয়ায় তাপে বিবর্ণা সীতার মতো শুধু দেখাই যাচ্ছে, শোভা পাচ্ছে না। [২৯]

চিকিৎসা

উন্নত চিকিৎসার নিদর্শন পাওয়া যায় রামায়ণে। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে রাম-লক্ষ্মণ অচেতন হলে সুষেণের ভেষজ চিকিৎসায় তাঁরা সুস্থ হন। জাম্ববান হনুমানের কাছে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী এই চারটি ওষধিবৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। [৩০] সে যুগে শল্য চিকিৎসার প্রচলনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বানর সেনাবাহিনীর মধ্যে সুষেণ ছিলেন একজন শল্য চিকিৎসক। তিনি লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের তাঁর চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করে তুলেছেন। শল্য চিকিৎসক প্রয়োজন হলে প্রসূতিকে রক্ষা করার জন্য শাণিত অস্ত্র দ্বারা তার গর্ভস্থ ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করতেন। লঙ্কার অশোকবনে বন্দিনী সীতা মনের দুঃখে ভেবেছিলেন যে রাবণের নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে রামচন্দ্র না এলে অনার্য রাবণ শাণিত অস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয়ই তাকে ছিন্নভিন্ন করবে। যেমন শল্য চিকিৎসক প্রসূতির জীবন রক্ষার জন্য গর্ভস্থ শিশুকে ছেদন করে, অনুরূপভাবে তাকেও তেমনি ছেদন করবে।[৩১] তিন রাত ও তিন দিন ধরে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। একটানা যুদ্ধের কারণে লক্ষ্মণ ছিলেন অনেকটা অসুস্থ ও শল্যযুক্ত। তখন সুষেণ লক্ষ্মণের নাসিকায় একটি ঔষধ প্রয়োগ করলে, সেই ঔষধ আঘ্রাণ করে লক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হয়েছিলেন।

শিল্পচর্চা

ধনীর গৃহে তখন চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারি থাকত। রাবণের রাজপ্রাসাদে ছিল সুন্দর চিত্রশালা। সেখানে চিত্রপ্রদর্শন করা হতো।[৩২] অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে অন্তঃপুরে কৈকেয়ীর বাসভবনের পাশে চিত্রশালা ছিল। নানা লতাকুঞ্জে মণ্ডিত, চাঁপা ও অশোকপুষ্পতরু দ্বারা আবৃত অত্যন্ত রমণীয় ছিল সেই চিত্রশালা।[৩৩]

খেলাধুলা

আনন্দের অনুষঙ্গ হিসেবে কিংবা অবসর সময়ে খেলাধুলা অন্যতম মাধ্যম ছিল। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হবে, এই বার্তা শুনে অযোধ্যার ছেলেরা দলে দলে আনন্দে খেলা করেছিল।[৩৪] হনুমান লঙ্কায় ক্রীড়াঙ্গন দেখেছিলেন, যেখানে রাক্ষসেরা খেলাধুলা করত।[৩৫] পাশাখেলারও উল্লেখ রয়েছে। হনুমান সীতার খোঁজে লঙ্কায় রাবণের গৃহে গোপনে প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে সোনার পিলসুজে নিষ্কম্পভাবে প্রদীপ জ্বলতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল: পাশাখেলায় ধূর্তেরা তার চেয়েও বেশি ধূর্তের দ্বারা পরাজিত হলে যেমন একেবারে অচঞ্চল হয়ে যায়, তেমনি অচঞ্চল হয়ে যেন ধ্যান করছে ঐ প্রদীপরাজি।[৩৬]

যাতায়াত ব্যবস্থা

সে সময় যানবাহনের মধ্যে শিবিকা, হস্তী, অশ্ব, রথ, নৌকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাক্ষসরাজ রাবণের রাজপ্রাসাদে ছিল হাজার হাজার স্বর্ণোজ্জ্বল শিবিকা বা পালকি। নবোদিত সূর্যের কিরণের মতো তাদের দীপ্তি। সেগুলির আকার ছিল বিভিন্ন রকম।[৩৭] রাজপরিবারে যানবাহন হিসেবে হস্তী, অশ্ব ও রথের প্রচলন ছিল। রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গের সংবাদ শুনে রাজা দশরথ হস্তী-অশ্ব-রথ ও পদাতিক সৈন্য অর্থাৎ চতুরঙ্গ বাহিনীসহ মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। তাদের সঙ্গে উত্তম শিবিকাও ছিল।[৩৮] মিথিলাতে যানবাহন হিসেবে দ্রুতগামী অশ্ব ব্যবহৃত হতো। রাজা জনকের নির্দেশে দ্রুতগামী অশ্বে চালিত হয়ে দূতেরা সাঙ্কাশ্যনগরী হতে জনক-অনুজ কুশধ্বজকে মিথিলায় এনেছিলেন।[৩৯] তাড়কা ও মারীচের নিবাসস্থলে যাওয়ার পথে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে নৌকায় গঙ্গা পার হয়েছিলেন। সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত আশ্রমের মুনিগণ তাঁদের নদী পার হওয়ার জন্য একটি ভালো নৌকা দিয়েছিলেন।[৪০] বনগমনের পথে নিষাদরাজ গুহ প্রদত্ত শক্তপোক্ত নৌকা ও মাঝির সাহায্যে রামচন্দ্ররা

গঙ্গানদী পার হয়েছিলেন। গুহশাসিত শৃঙ্গবেরপুর রাজ্যে পাঁচশত কৈবর্ত বহনকারী সমর্থ অনেক নৌকা ছিল।[৪১]

পুষ্পক রথ বা বিমানের কথা উল্লেখ আছে রামায়ণে। এর অধিকারী ছিলেন কুবের। রক্ষরাজ রাবণ ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করে বিজয়ের স্মারকচিহ্ন হিসেবে পুষ্পক রথটি অধিকার করেন। সে বিমানে ছিল স্বর্ণময় স্তম্ভ এবং বৈদূর্যমণিখচিত তোরণদ্বার। বিমানটির চতুর্দিক ছিল মুক্তাজালে আবৃত। বিমানটির বেগ ছিল মনের গতির তুল্য ক্ষিপ্র। রথচালকের ইচ্ছানুসারে এটি সর্বত্র গমন করত। ইচ্ছানুযায়ী এটি ছোট কিংবা বড় রূপ ধারণ করতে পারত। এটি ছিল আকাশচারী পাখির মতো। এর সোপানগুলি ছিল মণি ও কাঞ্চনময়। এর বেদি ছিল তপ্তকাঞ্চন নির্মিত। এটি সর্বদা অভঙ্গুর, নয়নাভিরাম। মনের আনন্দ উৎপাদনকারী। এতে অঙ্কিত ছিল বিস্ময়কর নানাবর্ণের চিত্রমালা। স্বয়ং ব্রহ্মা এই বিমানটি নির্মাণ করেন। সকলপ্রকার মনোরম বস্তুরাজি দ্বারা পুষ্পক বিমান নির্মিত হয়েছিল। তাই এটি ছিল সুন্দর ও মনোরম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সেজন্য সব ঋতুতেই আরামদায়ক ও মঙ্গলদায়ী।[৪২]

ভ্রূণহত্যা মহাপাপ

তৎকালীন সমাজে ভ্রূণহত্যাকে গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। ভ্রূণহত্যা ছিল মহাপাপ। ভরত তাঁর মাতা কৈকেয়ীকে তিরস্কার করে বলেছেন: তোমার কারণেই আমার নির্দোষ পিতার মৃত্যু ও ধার্মিক ভ্রাতার বনবাস হয়েছে। এই বংশকে ধ্বংস করার জন্য তোমার ভ্রূণহত্যাসম পাপ হয়েছে। তুমি নরকগামী হবে।[৪৩]

অপুত্রকের দুঃখ

পুত্র না থাকলে মাতা-পিতা আনন্দ পান না। সেকালে তো অবশ্যই, একালেও এটা পরিদৃষ্ট। রাজা দশরথের রাজ্যে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি বিরাজ করলেও অপুত্রক থাকা পর্যন্ত তাঁর মনে সুখ ছিল না।[৪৪]

পুত্রজন্মে আনন্দোৎসব

পুত্রজন্মে পিতামাতার অশেষ আনন্দ হয় এবং সেজন্য আনন্দানুষ্ঠান পালিত হয়। রাজা দশরথের পুত্রদের জন্ম উপলক্ষে অযোধ্যায় বিপুল জনসমাবেশের মাধ্যমে আনন্দোৎসব পালিত হয়েছিল।

রাজধানীতে বহু নর-নারীর সমাগম হয়েছিল। অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীরা সংগীত, বাদ্য এবং নানাবিধ আনন্দধ্বনিতে সর্বত্র মুখরিত করে তুলেছিল। রাজা দশরথ শিল্পীদের বিবিধ রত্ন দান করেছিলেন। গায়ক, রথচালক ও স্তুতিপাঠকদের পারিতোষিক দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের অর্থ ও হাজার হাজার গো-ধন দান করেছিলেন।[৪৫]

দানকর্ম

ক্ষত্রিয়রা কারো দান গ্রহণ করে না

নিষাদরাজ গুহ তাঁর রাজ্যে রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে পেয়ে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে আহারের জন্য বহুবিধ অন্ন, বিবিধ ফলমূল দিয়েছিলেন। সৌজন্যের কারণে রামচন্দ্র সে সব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বিনীতভাবে সেগুলি গুহকে প্রত্যর্পণ করে বলেন: আমরা ক্ষত্রিয়। তাই আমরা কারো দান গ্রহণ করতে পারি না। হে বন্ধু, ক্ষত্রিয়ের ধর্মানুসারে আমরা সর্বদাই শুধু দান করতে পারি।[৪৬]

দানকর্মে বাধা দেওয়া পাপ

কোনো দনকর্মের বিঘ্ন সৃষ্টি করা পাপ বলে পরিগণিত হতো। রাবণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের মায়ারচিত ছিন্ন মস্তক দেখে সীতাদেবী বিলাপ করে বলেছেন: নিশ্চয়ই আমি পূর্বজন্মে কারো উত্তম দানকর্মে বাধা দিয়েছিলাম। তাই সকল অতিথির প্রতি বৎসল হয়েও তোমার পত্নী আমি এখানে শোক করছি।[৪৭]

গো-দান

গো-দানের গুরুত্ব ছিল অনেক। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে গো-দান করা হতো। অযোধ্যার রাজা দশরথ তাঁর পুত্রদের বিবাহ উপলক্ষে তাঁদের কল্যাণার্থে ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণদের বৎসসহ গাভীদান করেছিলেন।[৪৮]

বনগমনের পূর্বে রামচন্দ্রের দানকর্ম

বনগমনের পূর্বে রামচন্দ্র বসিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞ, ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ব্রহ্মচারিবৃন্দ, সেবকগণ, ত্রিজট নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং বন্ধুবর্গকে ধন, রত্ন, গাভী, মূল্যবান অলঙ্কার প্রভৃতি দান করেছিলেন। দানের দক্ষিণা দিতে

হয়। তা না হলে দান নিষ্ফল হয়। দক্ষিণা অর্থ দাক্ষিণ্যযুক্ত, ঔদার্যযুক্ত দান। রামচন্দ্র দক্ষিণা দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করেছিলেন।[৪৯]

প্রিয় সংবাদ শ্রবণে ধনদান

বার্তাবহ প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপন করলে অনেকে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ধনদান করতেন। মন্থরার কাছ থেকে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শুনে কৈকেয়ী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাকে নিজের কণ্ঠহার উপহার দিয়েছিলেন।[৫০] অবশ্য পরবর্তী সময়ে মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর নির্মলচিত্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল।

এভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপস্থাপনে দেখা যায়, রামায়ণের যুগ সামগ্রিকভাবে একটা পূর্ণতা পেয়েছিল। সেখানে ভালো-মন্দ, আনন্দ-বেদনা, উৎসব-ব্যসন, সংস্কার-কুসংস্কার, উদারতা-অনুদারতা প্রভৃতি এবং লোকবিশ্বাসের বহুমাত্রিকতা ছিল।

তথ্যসূত্র:

১. ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা ক্রোশাদেব নরর্ষভ।
জনং সর্বমবস্থাপ্য জগাম সহ মন্ত্রিভিঃ॥
পদ্ভ্যামেব তু ধর্মজ্ঞো ন্যস্তশস্ত্রপরিচ্ছদঃ।
বসানো বাসসী ক্ষৌমে পুরোধায় পুরোহিতম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৯০/১-২

২. তাং তু সীতা মহাভাগামানসূয়াং পতিব্রতাম্ ।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রা স্বং নাম সমুদাহরৎ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৭/১৯

৩. স পূর্বজায়াবরজঃ শশংস নামাথ পশ্চাচ্চরণৌ ববন্দে।
শুকঃ প্রহস্তশ্চ তথৈব তেভ্যো দদৌ যথার্হং পৃথগাসনানি ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১/২৮

৪. ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীঞ্চ পরন্তপঃ।
অথাভ্যবাদয়ৎ প্রীতো ভরতো নাম চাব্রবীৎ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১২৭/৪১

৫. অতীত্যৈকাদশাহং তু নামকর্ম তথাকরোৎ।
জ্যেষ্ঠং রামং মহাত্মানং ভরতং কৈকেয়ীসুতম্ ॥
সৌমিত্রিং লক্ষ্মণমিতি শত্রুঘ্নমপরন্তথা।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতো নামানি কুরুতে তদা ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পৌর-জানপদানপি।
অদদদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ রত্নৌঘমমলং বহু ॥ আদিকাণ্ড, ১৮/২০-২৩

৬. দৃষ্ট্বা শ্রেয়স্করীং বুদ্ধিং ধনাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি।
নাম চাস্যাকরোৎ প্রীতঃ সার্ধং দেবর্ষিভিস্তদা ॥

যস্মাদ্ বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্ বিশ্রবা ইব।
তস্মাদ্ বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ ॥ উত্তরকাণ্ড, ৩/৭-৮

৭. তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্বকর্মাণ্যকারয়ৎ। আদিকাণ্ড, ১৮/২৪

৮. তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিম্ ।
রাজ্ঞঃ সর্বাণ্যথাদিষ্টাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যনন্তরম্ ॥
ন তু সঙ্কালনং রাজ্ঞো বিনা পুত্রেণ মন্ত্রিণঃ।
সর্বজ্ঞাঃ কর্তুমীষুস্তে ততো রক্ষন্তি ভূমিপম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৬/১৪-১৫

৯. গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাশ্বাসয় সুব্রত।
বালস্য চ শরীরং তত্তৈলদ্রোণ্যাং নিধাপয় ॥
গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
যথা ন ক্ষীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্ ॥
যথা শরীরো বালস্য গুপ্তঃ সন্ ক্লিষ্টকর্মণঃ।
বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্চ তথা কুরু ॥ উত্তরকাণ্ড, ৭৫/২-৪

১০. শীঘ্রস্রোতং সমাসাদ্য তীর্থং শিবমকর্দমম্ ।
সিষিচুস্তূদকং রাজ্ঞে তত এতদ্ ভবত্বিতি ॥
প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলপূরিতমঞ্জিলম্ ।
দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥
এতৎ তে রাজশার্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্ ।
পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৩/২৫-২৭

১১. ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥
ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্ ।
যদন্না পুরুষা রাজন্ ! তদন্না পিতৃদেবতাঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৩/২৯-৩০

১২. এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্ ।
দদাহ রামো ধর্মাত্মা স্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ ॥
রামোঽথ সহসৌমিত্রির্বনং গত্বা স বীর্যবান্ ।
স্থূলান্ হত্বা মহারোহীননুতস্তার তং দ্বিজম্ ॥
রোহিমাংসানি চোদ্ধৃত্য পেশীকৃত্বা মহাযশাঃ।
শকুনায় দদৌ রামো রম্যে হরিতশাদ্বলে ॥
যত্তৎপ্রেতস্য মর্ত্যস্য কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎস্বর্গগমনং পিত্রং তস্য রামো জজাপ হ ॥
ততো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরবরাত্মজৌ।
উদকং চক্রতুস্তস্মৈ গৃধ্ররাজায় তাবুভৌ ॥
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধ্রায় রাঘবৌ।
স্নাত্বা তৌ গৃধ্ররাজায় উদকং চক্রতুস্তদা ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৬৮/৩১-৩৬

১৩. দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্ ।

পাক্ষিকর্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্মবিভূষিতাম্ ॥
আচিতাং চিত্রপত্তীভিঃ সুনিবিষ্টাং সমন্ততঃ।
বিমানমিব সিদ্ধানাং জালবাতায়নাযুতাম্ ॥
সুনিযুক্তাং বিশালাঞ্চ সুকৃতাং শিল্পিভিঃ কৃতাম্।
দারুপর্বতকোপেতাং চারুকর্মপরিষ্কৃতাম্ ॥
বরাভরণহারৈশ্চ চিত্রমাল্যোপশোভিতাম্।
গুহাগহনসঙ্ঘুন্নাং রক্তচন্দনভূষিতাম্ ॥
পুষ্পৌঘৈঃ সমভিচ্ছন্নাং পদ্মমালাভিরেব চ।
তরুণাদিত্যবর্ণাভির্ভ্রাজমানাভিরাবৃতাম্ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৫/২২-২৬

১৪. যুদ্ধকাণ্ড, ১১১/১০৪-১২১

১৫. সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বরুণালয়ম্ ।
প্রদাস্যাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ ॥
ততো নীত্বা তু তং দেশং তীরে নদনদীপতেঃ।
নির্দগ্ধপক্ষং সম্পাতিং বানরাঃ সুমহৌজসঃ ॥
তং পুনঃ প্রাপয়িত্বা চ তং দেশং পতগেশ্বরম্ । কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৫৮/৩৫-৩৭

১৬. ভগীরথস্তু রাজর্ষিঃ কৃত্বা সলিলমুত্তমম্ ।
যথাক্রমং যথান্যায়ং সাগরাণাং মহাযশাঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৪৪/১৭

১৭. ইমাঞ্চ মালামাধৎস্ব দিব্যাং সুগ্রীব কাঞ্চনীম্ ।
উদারা শ্রীঃ স্থিতা হ্যস্যাং সম্প্রজহ্যান্মৃতে ময়ি ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২২/১৬

১৮. গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষ্মণ।
আবন্ধিষেঽথবা ত্যক্ষ্যে বিষমে দেহমাত্মনঃ ॥
পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ।
ন ত্বহং রাঘবাদন্যং কদাপি পুরুষং স্পৃশে ॥ অরণ্যকাণ্ড, ৪৫/৩৬-৩৭

১৯. পরুষং দারুণং তীক্ষ্ণং ক্রূরমিন্দ্রিয়তাপনম্ ।
সীতানিমিত্তং দুর্বাক্যং শ্রুত্বা স ন ভবিষ্যতি ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১৩/২৪

২০. সপুত্রদারাঃ সামাত্যা ভর্তৃব্যসনপীড়িতাঃ।
শৈলাগ্রেভ্যঃ পতিষ্যন্তি সমেষু বিষমেষু চ ॥
বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং জ্বলনস্য বা।
উপবাসমথো শস্ত্রং প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ১৩/৩৫-৩৬

২১. সঞ্জীবিতং ক্ষিপ্রমহং ত্যজেয়ং বিষেণ শস্ত্রেণ শিতেন বাপি।
বিষস্য দাতা ন তু মেঽস্তি কশ্চিচ্ছস্ত্রস্য বা বেশ্মনি রাক্ষসস্য ॥
ইতীব দেবী বহুধা বিলপ্য সর্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী।
প্রবেপমানা পরিশুষ্কবক্ত্রা নগোত্তমং পুষ্পিতমাসসাদ ॥
শোকাভিতপ্তা বহুধা বিচিন্ত্য সীতাথ বেণীগ্রথনং গৃহীত্বা।
উদ্বন্ধ্য বেণ্যুদ্গ্রথনেন শীঘ্রমহং গমিষ্যামি যমস্য মূলম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ২৮/১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

২২. যদি তদ্বিহতং কার্যং ময়া প্রজ্ঞাবিপর্যয়াৎ।
ইহৈব প্রাণসন্ন্যাসো মমাপি হ্যদ্য রোচতে ॥
কিমগ্নৌ নিপতাম্যদ্য আহোস্বিদ্ বড়বামুখে।
শরীরমিহ সত্ত্বানাং দদ্মি সাগরবাসিনাম্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৫৫/১২-১৩

২৩. হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্ ।
কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্ ॥
রাজহা ব্রহ্মহা গোঘ্নশ্চোরঃ প্রাণিবধে রতঃ।
নাস্তিকঃ পরিবেত্তা চ সর্বে নিরয়গামিনঃ ॥ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৭/৩৫-৩৬

২৪. মান্তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্যে সোঽভিষিচ্য পিতা মম।
কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতঃ ॥ আদিকাণ্ড, ৭১/১৪

২৫. রামো ভামিনি লোকস্য চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
মর্যাদানাঞ্চ লোকস্য কর্তা কারয়িতা চ সঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৩৫/১১

২৬. ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবতো স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ ॥
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্।
কৌসল্যাজনয়দ্ রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্ ॥ আদিকাণ্ড, ১৮/৮-১০

২৭. পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ ॥ আদিকাণ্ড, ১৮/১৫

২৮. অযোধ্যাকাণ্ড, ৩/৪১

২৯. জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে,
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে ॥ অরণ্যকাণ্ড, ১৬/১৪

৩০. তস্য বানরশার্দূল চতস্রো মূর্ধ্নি সম্ভবাঃ।
দ্রক্ষস্যোষধয়ো দীপ্তা দীপয়ন্তীর্দিশো দশ॥
মৃতসঞ্জীবনীঞ্চৈব বিশল্যকরণীমপি ।
সুবর্ণকরণীঞ্চৈব সন্ধানীঞ্চ মহৌষধীম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৭৪/৩২-৩৩
লক্ষ্মণায় দদৌ নস্তঃ সুষেণঃ পরমৌষধম্ ॥
স তস্য গন্ধমাঘ্রায় বিশল্যঃ সমপদ্যত।
তদা নির্বেদনশ্চৈব সংরূঢ়ব্রণ এব চ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৯১/২৪-২৫

৩১. তস্মিন্ননাগচ্ছতি লোকনাথে গর্ভস্থজন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্যচিরাদনার্যঃ শস্ত্রৈঃ শিতৈশ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ২৮/৬

৩২. লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালাগৃহাণি চ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৬/৩৬

৩৩. লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০/১৩

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. বালা অপি ক্রীড়মানা গৃহদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ।
রামাভিষবসংযুক্তাশ্চক্রুরেব কথা মিথঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬/১৬

৩৫. ক্রীড়াগৃহাণি চান্যানি দারুপর্বতকানি চ। সুন্দরকাণ্ড, ৬/৩৭

৩৬. প্রধ্যায়ত ইবাপশ্যৎ প্রদীপাংস্তত্র কাঞ্চনান্ ।
ধূর্তানিব মহাধূর্তৈর্দেবনেন পরাজিতান্ ॥ সুন্দরকাণ্ড, ৯/৩১

৩৭. শিবিকা বিবিধাকারাঃ স কপির্মারুতাত্মজঃ। সুন্দরকাণ্ড, ৬/৩৬

৩৮. চতুরঙ্গবলঞ্চাপি শীঘ্রং নির্যাতু সর্বশঃ।
মমাজ্ঞাসমকালঞ্চ যানং যুগ্যমনুত্তমম্ ॥ আদিকাণ্ড, ৬৯/৩

৩৯. শাসনাত্তু নরেন্দ্রস্য প্রযযুঃ শীঘ্রবাজিভিঃ।
সমানেতুং নরব্যাঘ্রং বিষ্ণুমিন্দ্রাজ্ঞয়া যথা ॥ আদিকাণ্ড, ৭০/৬

৪০. তে চ সর্বে মহাত্মানো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
উপস্থাপ্য শুভাং নাবং বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্ ॥
আরোহতু ভবান্নাবং রাজপুত্রপুরস্কৃতঃ।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ ॥ আদিকাণ্ড,২৪/২-৩

৪১. নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাং শতং শতম্ ।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৪/৮

৪২. পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্ ।
কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতং বৈদূর্যমণিতোরণম্ ॥
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং সর্বকালফলদ্রুমম্ ।
মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্ ॥
মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্ ।
দেবোপবাহ্যমক্ষয্যং সদা দৃষ্টিমনঃ সুখম্ ॥
বহ্বাশ্চর্য্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্মিতম্ ।
নির্মিতং সর্বকামৈস্তু মনোহরমনুত্তমম্ ॥
ন তু শীতং ন চোষ্ণঞ্চ সর্বর্তুসুখদং শুভম্ ।
স তং রাজা সমারুহ্য কামগং বীর্যনির্জিতম্ ॥ উত্তরকাণ্ড, ১৫/৩৮-৪২

৪৩. ভ্রূণহত্যামসি প্রাপ্তা কুলস্যাস্য বিনাশনাৎ।
কৈকেয়ী নরকং গচ্ছ মা চ তাতসলোকতাম্ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৪/৪

৪৪. মম লালপ্যমানস্য সুতার্থং নাস্তি বৈ সুখম্ ।
তদর্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম ॥ আদিকাণ্ড, ৮/৮

৪৫. উৎসবশ্চ মহানাসীদযোধ্যায়াং জনাকুলঃ।
রথ্যাশ্চ জনসম্বাধা নট-নর্তকসঙ্কুলাঃ ॥

গায়নৈশ্চ বিরাবিণ্যো বাদনৈশ্চ তথাপরৈঃ।
বিরেজুর্বিপুলাস্তত্র সর্বরত্নসমন্বিতাঃ ॥
প্রদেয়াংশ্চ দদৌ রাজা সূত-মাগধ-বন্দিনাম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং গোধনানি সহস্রশঃ ॥ আদিকাণ্ড, ১৮/১৮-২০

৪৬. ন হ্যস্মাভিঃ প্রতিগ্রাহ্যং সখে দেয়ং তু সর্বদা।
ইতি তেন বয়ং সর্বে অনুনীতা মহাত্মনা ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৭/১৭

৪৭. নূনমন্যাং ময়া জাতিং বারিতং দানমুত্তমম্ ।
যাহমদ্যৈব শোচামি ভার্যা সর্বাতিথেরিহ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ৩২/৩০

৪৮. গবাং শতসহস্রঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো নরাধিপঃ।
একৈকশো দদৌ রাজা পুত্রানুদ্দিশ্য ধর্মতঃ ॥
সুবর্ণশৃঙ্গাঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ ॥ আদিকাণ্ড, ৭২/২২-২৩

৪৯. নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম মাতুলো যং দদৌ মম।
তং তে নিষ্কসহস্রেণ দদামি দ্বিজপুঙ্গব ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩২/১০

৫০. দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা।
কৈকেয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্ ॥
ইদং তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্ ।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে ॥
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।
তথা হ্যবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৭/৩৩-৩৪, ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ঐতিহ্যে পরম্পরায় বিশ্বাসে রামায়ণ ভারতবর্ষে আদিকাব্য এবং প্রথম মানবিক কাব্য হিসেবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য এবং এর দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত। এই অনুপ্রেরণা আমাকে রামায়ণ নিয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। যেহেতু এটি প্রথম মানবিক কাব্য, সে কারণে কেমন ছিল সে যুগের মানুষ, কেমন ছিল সে যুগের শাসনব্যবস্থা, কেমন ছিল সে যুগের সামাজিক অবস্থা তা জানার আগ্রহ স্বভাবত প্রবলভাবে অনুভূত। সে যুগকে জেনে যুগান্তরের সরণি বেয়ে বর্তমানকে তুল্যমানে বিচার করতে পারি। যুগাভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে যা কিছু কল্যাণকর তা আমরা গ্রহণ করতে পারি আর অকল্যাণকে পারি বিসর্জন দিতে। এ দৃষ্টিকোণ গবেষণার একটি বিশাল প্রাসঙ্গিকতা। ফলে 'রামায়ণের রাজনীতি ও সমাজবীক্ষণ' শিরোনামের অভিসন্দর্ভে প্রাপ্ত তথ্যে যথাযথ আলোচনায় প্রধানত সে যুগকে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি। এবং প্রাসঙ্গিকভাবে কখনও এ যুগকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি। আমার বক্তব্য উপস্থাপনের সুবিধার্থে অভিসন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতিরেকে চারটি অধ্যায়ে বিভাজিত করেছি। বাল্মীকির কাল ও পরিচিতি, আদি মহাকাব্য রামায়ণ, রামায়ণের রাজনীতি এবং রামায়ণের সমাজবীক্ষণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

সামগ্রিকভাবে বাল্মীকিসৃষ্ট রামায়ণে একটা আদর্শ এবং নৈতিক মানদণ্ড রক্ষার প্রয়াস পরিলক্ষিত। এই আদর্শ বা নৈতিকতা যেমন রাজনীতিতে এসেছে, তেমনি এসেছে সমাজ কাঠামো বিনির্মাণেও। দুক্ষেত্রেই ভালো এবং মন্দ দুই-ই আছে। আছে প্রত্যাশা এবং হতাশাও। মহাকবির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ভালোকে গ্রহণ করা। আদর্শ এবং নৈতিকতা রক্ষার সংগ্রামে আনন্দ এবং বেদনা দুই-ই আছে। তবে বেদনার ভাগটাই যেন বেশি। পাঠকের কাছে বেদনার স্থায়িত্বই অতি গভীরে। মূলত সত্য ও বাস্তবতা বড় নির্মম। এই সত্যের বা বাস্তবতার সম্মুখীন হতে অবশ্য আদর্শবান কখনও ভীত হননি, পশ্চাদপসারণও করেন নি। সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন। রাজনীতি এবং সমাজনীতির নানা দোলাচলে প্রতিটি চরিত্রই আলোড়িত এবং প্রত্যেকেই সজীব। মানবিক সাহসিকতা এবং দুর্বলতা সকলকে স্পর্শ করেছে। পরিশেষে দেখা যায়, আদর্শের জয় ঘোষিত হয়েছে আর প্রবলের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে।

রামায়ণে আদর্শ রাজনীতি নিয়ে আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে আদর্শ রাজার স্বরূপ। বাল্মীকির প্রদর্শিত দর্শনে শত্রুদমন, আপন চরিত্র গঠন, প্রজাদের সেবা ও মনোরঞ্জন, জীবলোক ও ধর্মের রক্ষা করা রাজার অবশ্য করণীয় কর্ম। লোকহিতব্রতী এরূপ রাজ্যশাসকের অভাবে রাষ্ট্র হয়ে যায় অরণ্যতুল্য। তাই সুশাসকবিহীন রাজ্যে অরাজকতা বিরাজ করে। সুশাসক না থাকার ফলে রাজ্যে শস্যবীজ উপ্ত হয় না। জনগণের সভা বসে না। উদ্যান-পুণ্যগৃহ নির্মিত হয় না। ঠিকমতো সংস্কৃতির চর্চা হয় না। নর-নারীরা স্বাভাবিকভাবে আনন্দ উদ্‌যাপন করতে পারে না। ধন-সম্পদের নিরাপত্তা থাকে না।

রাজ্যশাসনে সে সময় রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। তবে রাজ্যের যে-কোনো ভালো-মন্দ বিষয়ে রাজাকে প্রজাদের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। রাজা ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাজা (রাজন্) শব্দের মধ্যে একটি আদর্শের ব্যাপার আছে। যিনি সর্ব অবস্থাতে প্রজার মনোরঞ্জন অর্থাৎ কল্যাণসাধন করেন, তিনিই রাজা। রামচন্দ্র ছিলেন এমন একজন আদর্শ রাজা। তিনি প্রজানুরঞ্জনে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়তমা পত্নীকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি একজন আদর্শ স্বামীও। কিন্তু তার সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি রাজা, জনগণের সেবক। তাই প্রিয়তমা পত্নীকে বিসর্জন দেওয়া মানে তিনি নিজেকেই জনস্বার্থে বিসর্জন দিয়েছেন। রামের জীবনে সীতাকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ হলো নিজের হৃদয়কে উপড়ে ফেলা। প্রজানুরঞ্জনে রাজ্যশাসনের বেদিমূলে স্বামীসত্তা বা পত্নীপ্রেমকে বলি দেওয়া হয়েছে। এখানে রাজধর্ম বা রাজকর্তব্যকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে।

রাজাকে অবশ্যই একজন নৈতিক গুণসম্পন্ন ও আত্মসংযমী ভালো মানুষ হতে হতো। আত্মসংযম আত্মোন্নয়ন দ্বারা নিজেকে পরিশীলিত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে হতো। এজন্য রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্বরাতে রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে উপবাস থেকে কুশাসনে শয়ন করে সংযম পালন করতে হয়েছে। কেননা রাজদায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে রাজাকে উপলব্ধি করতে হতো, তিনি প্রজার সেবক হিসেবে রাজধর্ম পালন করতে যাচ্ছেন। প্রজার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে রাজার নিজস্ব জীবনও যুক্ত। অন্যায়কারীকে রাজা অবশ্যই দণ্ডবিধান করবেন– এটা রাজকর্তব্য। কিন্তু রাজাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, একজনের পাপের দণ্ড যেন অন্যকে স্পর্শ না করে। রামায়ণে তাই উক্ত হয়েছে: রাজা যদি সত্য

যাচাই না করে মিথ্যা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেন, তাহলে সেই অভিযুক্তের অশ্রুধারায় রাজার পুত্র ও পশুর ধ্বংস ডেকে আনে।

যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রাঘব।

তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/৫৯

রামায়ণের এই রাজনৈতিক আদর্শের উপযোগিতা কেবল সে সময়ের নয়, এর আবেদন বর্তমান বিশ্বেও এবং চিরকালীন। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে দেখা যায়, বিচারপ্রার্থীর বিচার না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস। কখনও বা মিথ্যা অভিযুক্ত ব্যক্তি দিনের পর দিন শাস্তি ভোগ করে চলে। সঠিক বিচার না পেয়ে তাদের অশ্রু ঝরে। "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"। কিন্তু তাদের সেই করুণ অশ্রুধারা কি শাসকের হৃদয়কে স্পর্শ করে ? বর্তমান শাসকেরা কি বিশ্বাস করেন মিথ্যা অভিযুক্তের অশ্রুধারায় তাদের জীবন হবে অভিশপ্ত ? যদি তাঁরা এটি বিশ্বাস করেন, তাহলে তা হবে সবার জন্য মঙ্গলকর।

রামায়ণে অযোধ্যা, মিথিলা, লঙ্কা, কিষ্কিন্ধা, শৃঙ্গবেরপুর প্রভৃতি রাজ্যের শাসনপ্রণালী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। সর্বত্র রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। অযোধ্যার তিনজন নৃপতির শাসন সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা যায়। তাঁরা হলেন: অযোধ্যারাজ দশরথ, রামানুজ ভরত এবং সীতাপতি রামচন্দ্র। দশরথ একজন আদর্শ নৃপতি ছিলেন। ভরতও সুশাসক ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে, ফলমূল খেয়ে, সমস্ত রাজকীয় সুখ ত্যাগ করে রামের অবর্তমানে চৌদ্দ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। তাঁর শাসনকালে সুসমৃদ্ধি এবং প্রশান্তি ছিল সমগ্র রাজ্যে। রামায়ণে এবং পরবর্তিকালে আদর্শ রাজ্য বলতে অবশ্য রামরাজ্যকেই বোঝানো হয়েছে। রামচন্দ্রের রাজ্যশাসন প্রণালীই মূলত রামায়ণের এবং সকলের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ রাজধর্ম। মিথিলারাজ জনক ছিলেন রাজর্ষি। তিনি ভারতবর্ষে কৃষি সম্প্রসারণে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী কিষ্কিন্ধারাজ্যের শাসক ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। রামচন্দ্রের বাণাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার রাজা হন। কিষ্কিন্ধারাজ সুগ্রীব এবং শৃঙ্গবেরপুর রাজ্যের রাজা গুহ রামচন্দ্রের মিত্র ছিলেন। অর্থাৎ প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে অযোধ্যার সুসম্পর্ক বজায় ছিল। এটা রাষ্ট্রের একটা কূটনৈতিক সাফল্য। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্কে কল্যাণ সাধিত হয়।

লঙ্কারাজ রাবণ। তিনি রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ হলেও তাঁর আত্মসংযম ছিল না। তিনি তাঁর মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রণাকে গুরুত্ব দিতেন না। সীতাহরণসহ আরও অনেক নারীহরণের পাপে এবং অতি আত্ম-অহঙ্কারে তাঁর পতন হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও আত্ম-অহঙ্কারের কারণে লঙ্কাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং বহু রাক্ষসসৈন্যের মৃত্যু ঘটেছে। পক্ষান্তরে রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জক। তিনি সব সময় প্রজাদের হিতকামনা করেছেন। তাই রামায়ণের আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্র। বর্তমান আদর্শ প্রশাসকের কাছে তিনি অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। অনেক গুণ এবং দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও দম্ভ ও অহঙ্কার যে পতন ঘটায় রাবণচরিত্র এবং সামগ্রিকভাবে রামায়ণ থেকে তা শিক্ষণীয়।

বিবাহ, নারীর অবস্থান, চাতুর্বর্ণ্য, চতুরাশ্রম, শিক্ষা, বৃত্তিব্যবস্থা, কৃষি, পশুপালন, গো-সেবা, বাণিজ্য, শিল্প, আহার-আহার্য, পরিচ্ছদ-প্রসাধন, সদাচার, মাতা-পিতা ও গুরুজনের প্রতি কর্তব্য, পারিবারিক বিবিধ সম্পর্ক, অতিথি সেবা ও শরণাগতরক্ষণ, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও নৈতিক শিক্ষা প্রভৃতি সমাজের নানাদিক রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এখানে তা আলোচিত হয়েছে।। পতিনিষ্ঠ সতীনারীই রামায়ণের আদর্শ নারী। সতীনারীর কাছে তাঁর পতি দেবতা। আরও বলা হয়েছে, পতিই সতীর ভূষণ। তাই সতীনারীর কাছে অলঙ্কারের চেয়েও অধিক ভূষণ তাঁর পতি। কিন্তু পতির ভূষণও তো সতী হতে পারত। কেননা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের অলঙ্কারস্বরূপ হওয়া দাম্পত্যজীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য। সেটাই সমদর্শন। দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গুরুত্ব সমান। কিন্তু রামায়ণে এই সমদর্শনের কিংবা পতি-পত্নীর সম অধিকারের কথা নেই। পিতা-মাতার কাছে পুত্র-কন্যার অবস্থান সমান ছিল না। পুত্র ছিল মাতা-পিতার বহু কাঙ্ক্ষিত সন্তান। পুত্র কামনায় রাজা দশরথ যজ্ঞ করেছিলেন। পুত্রজন্মের পর তিনি আনন্দোৎসব করেছিলেন। কিন্তু কন্যার মাতা-পিতা এমন আনন্দোৎসব করতেন না। কন্যার মাতা-পিতা হওয়া যেন দুঃখের কারণ ছিল। তাই দেখা যায়, মন্দোদরীর পিতা তাঁর কন্যাকে নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত ও দুঃখিত ছিলেন এই ভেবে যে, কোথায় তিনি কন্যাকে পাত্রস্থ করবেন। কন্যাকে শিক্ষিত ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার চেয়ে পিতা-মাতার প্রধান চিন্তা ছিল কন্যাকে পাত্রস্থ করা। বিবাহই ছিল যেন নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে সময় নারী তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। ছিল না আত্মনির্ভরশীল। তাকে পরনির্ভরশীল হয়ে জীবন-যাপন করতে হতো। এমন পরনির্ভরশীল জীবন-যাপনে নারী এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়ত যে, তারা সেই পরনির্ভরশীল

জীবনটাকে স্বাভাবিক বলে মনে করত। আর এমন জীবন থেকে মুক্তির কোনো প্রশ্ন তাদের মনে উত্থাপিত হয়নি। যেমন কৌশল্যা রাজা দশরথকে বলেছেন, পতিই নারীদের প্রথম গতি। দ্বিতীয় গতি পুত্র। তৃতীয় জ্ঞাতি। চতুর্থ বলতে আর কিছু নেই।

গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৬১/২৪

কৌশল্যার এই উক্তিতে নারীর আত্মসত্তার বিলোপ ঘটেছে। তবে সে সমাজের নারী-স্বাধীনতার কিছু ইতিবাচক দিক হলো নারীরা অভিনয়, নৃত্যকলাবিদ্যায় অংশগ্রহণ করতে পারত। কুমারী কন্যারা বৈকালিক ভ্রমণে বের হয়ে খেলাধুলা করত। কিন্তু ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধ সে সময়েও হতো। ধর্ষণকে সে সময়ে মহাপাপ বলা হয়েছে। যারা নারীর ওপর বলাৎকার করেছে, তাদের সবার জীবনে নেমে এসেছে অভিশাপ। এ অভিশাপ অবশ্য কখনও জাগতিক এবং কখনও অতিলৌকিক বিশ্বাসের মানদণ্ডে বিচার্য। কিন্তু বর্তমান সমাজে ধর্ষক তার পাপকর্মের যথেষ্ট শাস্তি পায় না। বিশেষত ধর্ষক যদি হয় বিত্তবান কিংবা ক্ষমতাবান অথবা ক্ষমতাবলয়ের কাছে হয় তার অবস্থান, তাহলে তার শাস্তি হওয়া কঠিন। এর ফলে সমাজে ধর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ধর্ষকের জীবনে কোনো দৃশ্যমান অভিশাপ নেমে আসে না। বরং ধর্ষিতা নিজেই অভিশপ্ত জীবন-যাপন করে। কখনও বা অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

রাম-সীতাকে আদর্শ দম্পতী হিসেবে দেখানো হয়েছে। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামের ব্যাকুলতা একজন আদর্শ স্বামীর পরিচায়ক। কিন্তু সীতা উদ্ধারের পর সবার সম্মুখে সীতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহপ্রকাশ ও তাঁকে গ্রহণ করতে রামের অসম্মতি সত্যিই বিস্ময়কর। বিশেষ করে রাম যখন সীতাকে বলেন, নেত্ররোগীর সামনে প্রদীপের মতো তোমার উপস্থিতি আমার নিকট অসহ্য মনে হচ্ছে।

প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৫/১৭

এখানেও রামচন্দ্র থেমে থাকেননি। তিনি প্রাকৃতজনের মতো সীতাকে বলেন, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তুমি ইচ্ছামতো যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিংবা বিভীষণ যাকে তোমার মন চায়, তাকে বেছে নাও।

তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা। লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্ ॥
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে। নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনা ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৫/২২-২৩

রামচন্দ্রের এরূপ আচরণে কীভাবে তাঁকে আদর্শ স্বামী অথবা আদর্শ মানুষ বলা যায়? রামের আচরণ নারীত্বের প্রতি যেমন চরম অবমাননা তেমনি চরম অমানবিকও। নিষ্পাপ নিরপরাধ সীতাকে রামচন্দ্র অপমান করেছেন, কোনো প্রজার মিথ্যাপবাদে সীতাকে নির্বাসন দিয়েছেন। আবার নির্বাসন অথবা বিসর্জন দিয়ে সহধর্মিণীর প্রতীকে স্বর্ণসীতা নির্মাণ করে রামচন্দ্র যজ্ঞ করেছেন। সীতার জন্য আকুল হয়ে কেঁদেছেন। প্রতি মুহূর্তে সীতাকে হৃদয়ে লালন করেছেন। সীতার প্রতি রামচন্দ্রের এমন আচরণ আমাদের বিস্মিত করে, বিমূঢ় করে, মেনে নিতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। রামচন্দ্রের এখানে বিপরীতমুখী দুটি প্রবল পৃথক সত্তা প্রদর্শিত। এটাই আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, রামচন্দ্র সে সমাজের একজন পুরুষের প্রতিনিধি। অসাধারণ গুণের অধিকারী হয়েও রামের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় কোথায় যেন এক অপরিশীলিত পুরুষ বাস করে। তাই বিশেষ ক্ষণে সমাজের সেই পুরুষ জেগে ওঠে। ঐ ক্ষণে রামচন্দ্র স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না। কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ছিলেন তিনি। হিতাহিত কোনো বিবেচনা তাঁর মধ্যে কাজ করছিল না। তাঁকে যেন দেখাচ্ছিল এক কালান্তক যম– 'কালান্তকযমোপমম্'। ইচ্ছা করলেও রাম সমাজকে অতিক্রম করতে পারেননি। রামও যে সে সমাজের তৈরি এবং সমাজের শিকার। সমাজকে, যুগকে অতিক্রম করা মনে হয় সহজ নয়। আর মানুষ মনে হয় কখনও সম্পূর্ণ পরিশীলিত হতে পারে না। কোনো বিশেষ সময়ে আমাদের সকল পরিশীলন ভেঙে পড়ে, বেরিয়ে আসে আদিমতা। রামচন্দ্রের আচরণে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হলেও মহাকবির চিত্রণ মনে হয় ভুল হয়নি। এখানে আর একটা মন্তব্য করতে আমি খুব উৎসাহ বোধ করছি।– রামায়ণকাহিনি কি সত্য? রামকাহিনির সত্যতা অসত্যতা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক বিতর্ক আছে। যুদ্ধকাণ্ডে সীতার অগ্নিপরীক্ষার ঐ দৃশ্য আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছে। কোনো শালীন মানুষ যখন কোনো অশালীন মন্তব্য করে, তখন তার শ্রেণিচরিত্র বা পূর্ব পরিচয়ের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামের মুখ থেকে যখন সীতার উদ্দেশে অশালীন অসঙ্গত মন্তব্য বেরিয়ে আসে তখন আমাদের খুব ভাবায়। যে-বাল্মীকি তাঁর চিন্তা-চেতনায় শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলি দিয়ে রামচরিত্র নির্মাণ করেছেন, সেই তিনিই তাঁর চরিত্রের এত অবনমন ঘটাবেন! ভাবতে কষ্ট হয়। কিন্তু

আমরা জানি, রামায়ণের নির্মাতা বাল্মীকি নিজেও সেখানে একটা চরিত্র। নির্বাসিতা সীতা মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে বার বছর মহর্ষির কন্যারূপে অবস্থান করেছেন। এই তপোবনেই তাঁর যমজ সন্তানের জন্ম হয়েছে। বাল্মীকির স্নেহ-যত্নেই দুই শিশু লব-কুশের শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যা লাভ হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই রামের প্রতি সীতার সকল মান-অভিমানের কথা জানতে পেরেছেন বাল্মীকি। এ কারণে রামের চরিত্রের কিছু অপরিশীলিত দিকের কথা তিনি বলতে পেরেছেন। কবি হিসেবে চরিত্র সৃজনে এখানে তিনে অনেক সৎ। আর এই ছোট দৃশ্যপটের সামগ্রিক পর্যালোচনায় আমাদের মনে হয়েছে রামকাহিনি সত্য।

রামায়ণ পড়তে পড়তে আমার আর একটা অনুধাবন বা উপলব্ধি হয়েছে। আমার মনে হয়েছে সীতা বাল্মীকির মানসকন্যা। সীতার দুঃখ-বেদনা, হতাশা-গ্লানি, অবমাননার মধ্য দিয়ে তিনি সকল নারীর দুঃখ-কষ্ট অনুভব করেছেন। তাই তিনি সেই পুরুষশাসিত সমাজে সীতার মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব নারীর মর্যাদার কথা বলার চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধকাণ্ডের ঐ আলোচিত অংশে রামের নিষ্ঠুর আচরণে আর আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত সীতার সমস্ত শরীর অন্ধ তমিস্রায় আবৃত হচ্ছিল, যেন ক্লেদে লিপ্ত হচ্ছিল, সীতার মনে হচ্ছিল– তাঁর সমস্ত শরীর যেন নিজের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে– "প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বানি"। সীতার প্রতিবাদ এবং আত্মসম্মানবোধের ভাষা প্রণিধানযোগ্য। সীতা অতি শান্ত ভাষায় রামকে বললেন: তুমি একি রুক্ষ, বিসদৃশ এবং শুনতে নির্মম কথা বলছ? প্রাকৃত পুরুষ প্রাকৃত নারীর (নিম্নশ্রেণির পুরুষ নিম্নশ্রেণির নারীর) সঙ্গে যে-ভাষায় কথা বলে তুমি আমার সঙ্গে সে ভাষায় কথা বলছ। জোর করে আমার শরীর যদি কেউ স্পর্শ করে, সে দোষ তো আমার নয়। শারীরিক শক্তিতে পরাজিত আমার শরীর নিশ্চয়ই আমার অধীন নয়। এখানে আমি কী করতে পারি? একে দৈব দুর্বিপাক ছাড়া আর কি বলা যায়? আর আমার একান্ত যে হৃদয়-মন-শরীর সে তা আপনারই। আপনি তা জানেন।

> কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্ । রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥
> যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো। কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি ॥
> মদধীনন্তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে। পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী ॥
>
> যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬/৫, ৮-৯

এখানে সীতার প্রতিবাদের ভাষা এবং তাঁর যে প্রশ্ন, তা খুবই বাস্তবসম্মত। একজন নারী যখন অন্য পুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় তখন সে দোষ তো সেই নারীর নয়। সে নির্জিত বলেই লাঞ্ছিত। তাকে রক্ষার দায়িত্ব যে আত্মীয়, স্বজন পুরুষের ছিল, সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্যই ঐ নারীকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। অথচ সমাজের পুরুষপ্রধানেরা ঐ লাঞ্ছিত অসহায় নারীর দিকেই আঙুল তুলে তার চরিত্রের ওপর দোষারোপ করে। সেকালে যা ঘটেছে, আজও তাই ঘটছে। বরং বাল্মীকির সীতা যে প্রতিবাদ করেছেন এবং যে প্রশ্ন উৎথাপন করেছেন, আজকের কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় তাও বিরল। তারপর অবমানিত সীতা আত্মসম্মান রক্ষায় প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে চাইলেন। লক্ষ্মণকে তিনি চিতা সাজাতে বললেন। রামের মৌন সম্মতি পেয়ে লক্ষ্মণ অগ্নি প্রজ্বালন করলেন। অগ্নিপ্রবেশের পূর্বে সীতা অগ্নিদেব এবং অন্য দেবতাদের সম্বোধন করে বলেন, তিনি যদি কায়মনোবাক্যে রামভিন্ন অন্য কাউকে ভেবে না থাকেন তা হলে তাঁরা যেন তাকে রক্ষা করেন।

কর্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহম্। রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ ॥
আদিত্যো ভগবান্ বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ। অহশ্চাপি তথা সন্ধ্যে রাত্রিশ্চ পৃথিবী তথা।
যথানেছপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম্ ॥ যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬/২৭-২৮

এরপর সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে সীতা অপাপবিদ্ধা এবং সর্বতোভাবে রামানুগতা। রামকে তিনি সীতাকে গ্রহণ করতে বললেন। অগ্নিদেবের কথায় রাম সানন্দে সীতাকে গ্রহণ করলেন এবং বললেন যে সীতার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা নিয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। তবে সীতা রাবণের গৃহে দীর্ঘকাল ছিলেন, এ কারণে লোকাপবাদ দূরীকরণার্থে তিনি সীতার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করেছেন।

আর এক দিনের দৃশ্য। প্রায় অনুরূপ দৃশ্য। কেবল স্থান ভিন্ন। লঙ্কার পরিবর্তে অযোধ্যা। এটাই রামায়ণে সীতার শেষ দৃশ্য। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়েছে। সেই যজ্ঞস্থলে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন মহর্ষি বাল্মীকি। যেন ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতি – 'শ্রুতিমায়ন্তীং ব্রহ্মানুগামিনীম্'। বাল্মীকি নিজেকে প্রচেতার দশমপুত্র বলে ঘোষণা করলেন। তিনি তাঁর তপস্যা এবং সত্যবাদিতার শপথ করে বললেন– সীতা পরিশুদ্ধা এবং লব-কুশ সীতা ও রামের যমজ সন্তান। সেই সীতা এখন প্রত্যয় দেবেন। তিনি রামের অনুমতি চাইলেন। তখন রামচন্দ্র বিনীতভাবে বললেন যে তিনি বাল্মীকির সব

কথা বিশ্বাস করেছেন। সীতা এর আগেও তাঁর বিশুদ্ধতা বিষয়ে প্রত্যয় দিয়েছেন। কিন্তু লোকাপবাদ দূরীকরণে এই অযোধ্যায় তাঁকে পুনরায় বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিতে হবে। নারীত্বের প্রতি সেই একই অবমাননা। আমরা যদি একবার অনুভব করার চেষ্টা করি, যদি একবার সেই দিন সেই ক্ষণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে আমরা ব্যথিত বেদনাবিদ্ধ হব। সহস্র লোকের চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এক নারী। তিনি সাধারণ কোনো নারীও নন। তিনি রাজবধূ। দুই রাজকুমারের জননী। তাঁকে দিতে হবে চারিত্রিক পরিশুদ্ধতার পরীক্ষা। আর তাঁর পরীক্ষার আয়োজন করেছেন তাঁরই স্বামী। তিনি অযোধ্যার রাজা, অশেষ গুণের অধিকারী। লোকমুখে তাঁর জয়ঘোষণার অন্ত নেই। আমরা সীতার মানসিক অবস্থা কি অনুমান করতে পারি? একজন নারী, বিশেষত সীতার জন্য এর থেকে অবমাননাকর মর্যাদাহানিকর আর কিছু হতে পারে না। সীতার মনে কি একবার এই প্রতিবাদের ভাষা আসতে পারে না যে– হে পুরুষেরা, তোমরা কী পেয়েছ? নারী কি তোমাদের হাতের কোনো মাটির পুতুল? তোমাদের যখন যা ইচ্ছা হবে তাকে সেভাবে গড়বে? মহাকবি সীতার মুখে এ ধরণের কোনো ভাষা দেননি। কিন্তু তাঁর সীতা যথার্থ প্রতিবাদ করেছেন। এ চরম অবমাননা তিনি মেনে নেননি। আত্মাহুতি দিয়ে তিনি আত্মমর্যাদা রক্ষা করেছেন। লঙ্কায় পরীক্ষা দেওয়ার সময় সীতা অগ্নিপ্রবেশের পূর্বে অগ্নিদেবকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তিনি যদি পরিশুদ্ধ হন তাহলে অগ্নিদেব যেন তাঁকে রক্ষা করেন। এবার তিনি আর রক্ষা পেতে চাননি। তিনি ধরিত্রী দেবীকে (মাধবী দেবী) সম্বোধন করে বলেন: যদি রামব্যতীত অন্য কাউকে আমি চিন্তা না করে থাকি, তাহলে হে মাধবীদেবী, তুমি আমাকে তোমার মধ্যে (বিবরে) স্থান দাও। কায়মনোবাক্যে আমি যদি কেবল রামকেই অর্চনা করে থাকি, তাহলে হে মাধবীদেবী, তুমি আমাকে বিবর দাও। যদি রামব্যতীত অন্য কাউকে আমি না জেনে থাকি এবং আমার এ সকল কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে হে মাধবীদেবী, আমাকে তোমার বিবর দাও।

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ উত্তরকাণ্ড,৯৭/১৪-১৬

তারপর সেই স্থানে ধরিত্রীতল থেকে উঠে এল এক দিব্য সিংহাসন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ধরিত্রীদেবী পরম মমতায় দুহাত বাড়িয়ে সীতাকে গ্রহণ করলেন এবং মুহূর্তেই অন্তর্হিত হলেন। সীতার পাতালপ্রবেশ ঘটল। রামায়ণ পড়ে আমি গভীরভাবে অনুভব করেছি, এ ছাড়া অন্য কোনোভাবে মনে

হয় সীতার জীবনাবসান হতে পারে না। এটা আত্মাহুতি। এর মধ্য দিয়ে সীতা যেমন নিজেকে পবিত্র পরিশুদ্ধ বলে প্রমাণ দিলেন, তেমনি সকল পুরুষ সমাজের প্রতি প্রতিবাদ জানালেন এবং নারী হিসেবে নিজের আত্মসম্মানবোধ পরিজ্ঞাত করলেন। এখানে আমার আরও উপলব্ধি, বাল্মীকি সীতার মধ্য দিয়ে নারীর হৃদয়-যন্ত্রণা অনুভব করেছেন এবং সেই পুরুষশাসিত সমাজে যতটা সম্ভব নারীর পক্ষে কথা বলতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই আমি বলি, সীতা বাল্মীকির মানস কন্যা আর রামায়ণকাহিনি কোনো কল্পকাহিনি নয়– বাস্তবে দৃষ্ট।

রামায়ণে সমাজ ও পারিবারিক বন্ধনে বিবাহের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে সেখানে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বিবাহকে দুটি মনের পবিত্র বন্ধন এবং দুটি বংশের মধ্যে আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধনের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে। কন্যার পিতা দাতা। তাই বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ সীতার পিতা রাজর্ষি জনককে বলেছিলেন, আপনি কন্যার পিতা। আপনি দাতা। তাই আপনি যা বলবেন, আমরা তা পালন করব। দশরথের এ উক্তিতে কন্যার পিতা রাজর্ষি জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে অধিকাংশ সময়ে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। বিবাহ-আসরে পাত্রের বাবা কিংবা পাত্রপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহের সমস্ত কার্য সাধিত হয়। কন্যাপক্ষের মতামতের মূল্যায়ন খুব কম হয়। কন্যাকে লালন-পালন করে যিনি সম্প্রদান করেন, তিনিই দাতা। আর দাতার মর্যাদা সবার উপরে। বর্তমান সমাজের পাত্রপক্ষ রামায়ণের এ শিক্ষা বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করলে সমাজ অনেক সুখময় হতো। কন্যাকে পিতৃগৃহ থেকে বিবাহের সময় উপহার প্রদান করা হতো। সেটা পিতা আনন্দের সঙ্গে দিতেন। বর্তমানের যৌতুকপ্রথা কিংবা বরপণের মতো কোনো নিষ্ঠুর কিছু নয়।

রামায়ণে অতিথি সেবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গৃহে অতিথি এলে তাঁকে অভিনন্দন ও সংবর্ধনা দেওয়া হতো। অতিথিকে দেবতা মনে করে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করা হতো। রামায়ণে বিচিত্র খাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বসিষ্ঠের কামধেনু বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের বিবিধ প্রকার খাদ্যের সরবরাহ করেছিল। খাদ্য হিসেবে মাছ-মাংস ও মদেরও প্রচলন ছিল। লঙ্কায় মদ্যপানের প্রচলন ছিল বেশি। রাবণের পানশালার সাজ-সজ্জা ছিল দর্শনীয়।

সে সময়ে নারীরা অলঙ্কারে সজ্জিত হতো। পুরুষেরাও অলঙ্কার পরিধান করত। রাজপরিবারে স্বর্ণ এবং মণি-মুক্তা প্রভৃতির অলঙ্কার ব্যবহৃত হতো। রাবণের পোশাক ও অলঙ্কার আভিজাত্যপূর্ণ ছিল। বিবাহের সময় নববধূরা ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করত। ধর্মক্রিয়ারূপে সে সময় যজ্ঞ ধর্মের অঙ্গ হিসেবে গণ্য ছিল। যজ্ঞ ছিল ব্যয়বহুল কর্ম। তাই রাজাদের পক্ষেই কেবল যজ্ঞ করা সম্ভব হতো। রাজা দশরথ পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞ উপলক্ষে বিভিন্ন দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা হতো। বিভিন্ন দেশের রাজাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের, রাজ্যের সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হতো। সংযম পালন করে যজ্ঞ করতে হতো। যজ্ঞকালে ক্রোধপ্রকাশ কিংবা কাউকে অভিশাপ দিলে যজ্ঞের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো না।

রামায়ণের যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির একটা সুন্দর রূপ দেখা যায়। যদিও এ রূপটি অভিজাত শ্রেণির মধ্যে পরিলক্ষিত, সাধারণের মধ্যে নয়। ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের কথা প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণে। ব্রাহ্মণবেশী হনুমান রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছিলেন। সংস্কৃত ছিল শিক্ষিত মানুষের কথ্যভাষা। গৃহীকে অবশ্যই প্রত্যহ বেদপাঠ করতে হতো। অযোধ্যারাজ দশরথ, তাঁর চারপুত্র, মিথিলারাজ জনক, লঙ্কারাজ রাবণ, হনুমানসহ রামায়ণের অধিকাংশ প্রাজ্ঞজন ছিলেন বেদে নিষ্ণাত। এ থেকে অনুমিত যে তখন সমগ্র ভারতবর্ষে বেদচর্চা হতো। শিক্ষাগুরুকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হতো। রামায়ণে জন্মদাতা, বিদ্যাদাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা– এ তিনজনকেই পিতার স্থান দেওয়া হয়েছে। কেবল শাস্ত্র অধ্যয়নকে জ্ঞানার্জনের একমাত্র পথ বলা হয়নি। শাস্ত্র অধ্যয়নের পাশাপাশি গুরুসেবার মাধ্যমেও জ্ঞানার্জন হয়। এ দুটি মিলিয়েই জ্ঞানার্জন পূর্ণতা পায়। নারীদের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে রাজপরিবার কিংবা অভিজাত পরিবারের নারীদের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সীতা, মন্দোদরী, অরুন্ধতী, অনসূয়া, তারা, শূর্পণখার যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। এতে মনে হয়, এঁরা সবাই শিক্ষিত ছিলেন এবং এঁদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাধারণ নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

পরিকল্পিত নগরীর উল্লেখ আছে রামায়ণে। অযোধ্যা ও লঙ্কা নগরীর সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়। অযোধ্যার সুপরিকল্পিত ও প্রশস্ত পথগুলি ছিল ধূলিহীন। কেননা প্রতিদিন সেগুলি জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হতো। এখন অধিকাংশ নগরের অপরিকল্পিত ও ধূলিময় পথে আমাদের নিত্য আসা-

যাওয়ায় এবং অপ্রশস্ত সংকীর্ণ পথে চলতে চলতে মনে হয়, সেই প্রাচীন অযোধ্যাবাসীর চেয়ে আমরা বর্তমানের নগরবাসীরা অনেক বেশি সুবিধাবঞ্চিত। স্বপ্ন দেখি, আমাদের পরিচিত নগরের পথগুলি যদি হতো রামরাজ্যের সেই ধূলিহীন পথ যার দুপাশে কুসুমিত তরুলতায় সজ্জিত।

রামায়ণের সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে মানবজীবনের বহুবিধ দর্শন। বস্তুবাদ, ভাববাদ, আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ সবই রামায়ণে স্থান পেয়েছে। মহর্ষি জাবালির চরিত্রে বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। জাবালির মতে, যা প্রত্যক্ষ তাই গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রামায়ণকার ভাববাদ ও আস্তিক্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রামচন্দ্রের মাধ্যমে। রামায়ণে কঠিন বাস্তবতাও স্বীকৃত। মহর্ষি জাবালির যুক্তিকে খণ্ডন করে রামচন্দ্র যে মত প্রতিষ্ঠা করেন, তা সম্পূর্ণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রামচন্দ্রের মতে, সত্যই ঈশ্বর। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। সব কিছুর মূলে রয়েছে সত্য। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, কর্মানুসারে সবাই ফলভোগ করবে। বলা হয়েছে এ জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী। সুখ-দুঃখ নিয়েই মানবজীবন। তাই দুঃখ পাওয়া মানব জীবনের সাধারণ ঘটনা। এ সংসারে সবাই দৈবের অধীন। তাই দৈবদ্বারা ব্যবস্থাপিত সুখ-দুঃখ মানুষ অতিক্রম করতে পারে না। তবে পুরুষকারের কথাও উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে, বীর্যহীন ক্লীব মানুষেরাই দৈবকে অনুসরণ করে। তাই প্রকৃত বীর দৈবদ্বারা বিপন্ন হলেও কর্মে নিরুৎসাহিত হন না। কেননা উৎসাহই কার্যসাফল্যের পরমশক্তি। তাই নিরুৎসাহী ব্যক্তি কার্যে সাফল্য আনতে অপারগ।

বাস্তবতার দৃষ্টিতে অর্থ যেমন অনর্থের মূল, আবার অর্থই মানুষের সুখের কারণ। এই বাস্তবতা রামায়ণে স্বীকৃত। অর্থ থাকলে মানুষ বন্ধু হয়। ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ অর্থবানের অনুকূলে গড়ে ওঠে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি অর্থদূষক বুদ্ধিকে ত্যাগ করে। মূলত সবই নির্ভর করে বিশেষ সময়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

অনেক আদর্শ, অনেক দর্শন, অনেক নীতিবাক্যের সমন্বয় ঘটেছে এই মহাকাব্যে। রামায়ণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, এক আদর্শবান মানুষের চরিত্রচিত্রণে। বাল্মীকি রামায়ণ লেখার প্রারম্ভে নারদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন বর্তমান সময়ে (সাম্প্রতং লোকে) একজন আদর্শ

মানুষের কথা। সেই সমন্বিত আদর্শগুলোর কথাও বলেছিলেন বাল্মীকি। গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্, দৃঢ়ব্রত, চরিত্রবান, সর্বভূতহিত, বিদ্বান, সমর্থবান, প্রিয়দর্শন, আত্মবান, জিতক্রোধ, দ্যুতিমান, অসূয়াহীন (অনসূয়), যুদ্ধকালে ক্রুদ্ধ যাকে দেখলে দেবতারাও ভয় পান। নারদ বলেছিলেন, এমন একজনই আছেন, যিনি রঘুপতি রাম। এই আদর্শ চরিত্রের বর্ণনায় অনেক আদর্শের কথা যে আসবেই, সেটা স্বাভাবিক। এক সময়ে কাব্যনির্মাণের একটা উদ্দেশ্য ছিল, কাব্যপাঠের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে প্রবর্তিত করা। ধর্মগ্রন্থের ভাষা, তার গভীরার্থ, উপদেশ সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য নয়। কিন্তু সেই একই উদ্দেশ্য, উপদেশ যদি কাব্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় তাহলে সকল মানুষের কাছে তা সহজবোধ্য হবে, মানুষ তা আনন্দে গ্রহণ করবে। রামায়ণ পড়ে মানুষ বুঝতে পারবে রামের মতো আচরণ করতে হবে, রাবণের মতো নয়।

রামায়ণ আমাদের কাছে সেই মহাকাব্য যেখানে মানবিক চরিত্র এবং গার্হস্থ্য ধর্মের মাধ্যমে বহুমুখী দর্শন, বিবিধ উপদেশ ও নানা নৈতিক শিক্ষা প্রতিভাত হয়। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের উন্নত আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে রামায়ণে। যুগ যুগ ধরে রামায়ণের এই নৈতিক শিক্ষার পবিত্র পুণ্যময় অমৃতপ্রবাহ মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়। সেই কতকাল আগে রচিত হয়েছিল রামায়ণ, আজও সমভাবে তার কথা দীপ্যমান। রামায়ণের রাজনৈতিক দর্শন, সমাজবীক্ষণ ও নৈতিক শিক্ষায় জীবনবিমুখতা নেই, বরং তা জীবন ও জগৎ সম্পৃক্ত। সমকালীন বিশ্বে এবং আধুনিক রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে রামায়ণের গুরুত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা পুণ্যতোয়া নদীর মতো বহমান। রামায়ণতুল্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে আমি দেখি, শাখা-প্রশাখায় পত্র-পুষ্পে পূর্ণ কোনো সুবিশাল বৃক্ষের মতো। এই বৃক্ষের সজীবতা নির্ভর করে তার মূলের ওপর। কারণ মূলই মৃত্তিকা থেকে রস সঞ্চয় করে বৃক্ষকে সজীব রাখে এবং তার বিস্তারে সহায়তা করে। কিন্তু অনেক সময় বৃক্ষের উপরিভাগের ব্যাপকতা সৌন্দর্য দেখে আমরা মূলের কথা ভুলে যাই। বৃক্ষ যখন সজীবতা হারায় তখন আমরা মূলের সন্ধান করি। রস সঞ্চিত না হলে কিংবা ছিন্নমূল হলে সেই বৃক্ষ আর বাঁচে না। আমাদের সকল শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-সমাজনীতি, সভ্যতার মূল সেই রামায়ণতুল্য প্রাচীন সাহিত্য। আমাদের সকল অগ্রসরতায় রস সিঞ্চিত হচ্ছে ঐ রামায়ণ-মহাভারতসহ প্রাচীন সাহিত্য

থেকে। আমরা যদি সেই প্রাচীনকে ভুলে যাই, প্রাচীনের চর্চা যদি অব্যাহত না রাখি, তাহলে বর্তমান হঠাৎ করে গতি হারাতে পারে। রামায়ণের পঠন-পাঠন এবং চর্চা ও গবেষণার এখানেই প্রাসঙ্গিকতা।

আমি আমার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় দৃষ্ট তথ্যের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। আমি আমার গবেষণায় তৃপ্ত। তবে একজন গবেষক বিশেষত মানবিক কাব্যের আলোচক মনে হয় কখনও সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেন না। এ অতৃপ্তি আমার আছে। এ মুহূর্তে স্মরণ করছি মহাভারতের উপক্রমণিকায় লোমহর্ষণপুত্র সৌতি উগ্রশ্রবার কথা। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিদের সম্মুখে মহাভারতের কথা শোনাতে গিয়ে তিনি বলেছেন: পৃথিবীতে মহাভারতরূপ এ ইতিহাসের কথা পূর্বে অনেক কবি বলেছেন, এখনও অনেকে বলছেন এবং ভবিষ্যৎকালেও অনেকে বলবেন।

আচখ্যু কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥ মহাভারত, ১/১/২৪

অনুরূপভাবে আমিও বলতে চাই– আমার পূর্বে অনেকে রামায়ণ নিয়ে গবেষণা করেছেন, এখনও আমার মতো অনেকে গবেষণা করছেন এবং ভবিষ্যতেও অনেকে গবেষণা করবেন। এটাই স্বাভাবিক যে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। এভাবেই কোনো বিষয়ের গবেষণা এগিয়ে যায়, পায় বহুমাত্রিকতা। আমি আমার অনুভব, উপলব্ধি ও দর্শনের কথা বলেছি। বিচার ও মূল্যায়নের ভার সুধীজনের, বিদগ্ধ সমালোচকের।

আমার বিশ্বাস, এ অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে ভবিষ্যতের রাজনীতি-বিশ্লেষক, সমাজনিরীক্ষক, নৈতিক আদর্শের সংরক্ষক, অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিশেষভাবে প্রাণিত হবেন। রামায়ণের কাহিনি আমার কাছে অনেক সুদূরের কোনো কাহিনি নয়। রামায়ণের প্রতিটি চরিত্রই আমার কাছে সজীব। রামায়ণের গবেষণা আমার কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং বর্তমান যুগযন্ত্রণা প্রশমনে রামায়ণ আমাদের অনেক প্রশান্তি প্রদান করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

অতুলচন্দ্র গুপ্ত: কাব্যজিজ্ঞাসা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা

শ্রী অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পাদিত ও পরিশোধিত): বাল্মীকি রামায়ণম্ (গৌড়ীয়-পাঠ সম্বলিত, ১৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ), দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, জানুয়ারি ২০১৫, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা

অমলেশ ভট্টাচার্য: রামায়ণ কথা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা

অমিয়শঙ্কর চৌধুরী: কৃত্তিবাস ও বাংলা রামায়ণ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা

আলমগীর জলীল: ইলিয়াডের গল্প, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

করুণাসিন্ধু দাস: সংস্কৃত সাহিত্য পরিক্রমা, তৃতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪১০, রত্নাবলী, ৩৯এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-১৪

কানাই লাল রায়: বাল্মীকি রামায়ণ, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৪, আনন্দ পারলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত): বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত (২ খণ্ড), তুলিকলম, ১৯৮৭, কলকাতা

ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, দেবার্চনা সরকার অনূদিত: মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, কূর্ম পুরাণ, (পুরাণসংগ্রহ–২), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়: কাব্যাদর্শঃ (শ্রীদণ্ড্যাচার্য বিরচিতঃ), ডিসেম্বর ১৯৯৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়: মহাকাব্য ও মৌলবাদ, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৬, প্রকাশক, শ্রী সুনীল সচদেব, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭২

শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক (গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত): সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮২, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮,বিধান সরণী, কলকাতা-৬

দীনেশচন্দ্র সেন: রামায়ণী কথা, ২৫নং রায়বাগান স্ট্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে সান্যাল এন্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯০৪, কলিকাতা

শ্রীদেবেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ও শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত: পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, মহালয়া, ২০০৩, বলরাম প্রকাশনী, ১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা-৬

ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৮, কলকাতা

আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী (অনূদিত ও সম্পাদিত): মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণম্ (২খণ্ডে সম্পূর্ণ), প্রথম সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, দ্বিতীয় খণ্ড জানুয়ারি ১৯৯৭, নিউলাইট, কলকাতা

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত): মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯; অগ্নিপুরাণ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ; স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ খণ্ড-কাশী খণ্ড, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ

পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত): রামায়ণম্-বাল্মীকিবিরচিতম্), চতুর্থ সংস্করণ, ১৩১৫, কলিকাতা

শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য: সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১২, জয়দুর্গা লাইব্রেরী প্রা: লি:, কলকাতা-৯

পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য্য: মেঘদূত পরিচয়, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

পূরবী বসু: প্রাচ্যে পুরাতন নারী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, অবসর, ঢাকা

প্রসূন বসু (সম্পাদিত): সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৮; দশম খণ্ড, ১৯৮১, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা

ড. বাণী দাশ: বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা

বারিদবরণ ঘোষ (সংকলিত ও সম্পাদিত): রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০৮, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পাদিত): শ্রীকর নন্দী, ছুটিখানের মহাভারত (অশ্বমেধপর্ব্ব), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত): বিশ্বনাথ কবিরাজকৃত সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা

ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য: সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, অষ্টম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৪, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

বুদ্ধদেব বসু: কালিদাসের মেঘদূত, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৮০, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি, কলকাতা-১৯৭৩

বুদ্ধদেব বসু: মহাভারতের কথা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, হাসি প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা

স্বামী বেদানন্দ: গুরুমুখী রামায়ণ, নবম সংস্করণ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কোলকাতা-১৯

মিতা চট্টোপাধ্যায়: প্রাচীন ভারতের দেবভাবনা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৮০

শ্রী রনজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য: সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পরিক্রমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১০, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: (তপোবন ,শান্তিনিকেতন) রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে

প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৫, পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা;
রবীন্দ্রসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, আজিজ মার্কেট, ঢাকা

রবের আঁতোয়ান: রাম এবং চারণেরা রামায়ণে এপিক স্মৃতি (সুবীর রায়চৌধুরী অনূদিত), প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পত্রলেখা, ১০বি কলেজ রোড, কলকাতা

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ: রামায়ণ-রহস্যম্, প্রথম সংস্করণ: জুন, ১৯৮১, শ্রীধরনাথ প্রেস, ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত): ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, হরফ প্রকাশনী, এ- ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭, ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, সেপ্টেম্বর,১৯৭৩

রাজশেখর বসু (অনূদিত): বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ), নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

রামজীবন আচার্য: সংস্কৃত সাহিত্যের রূপলোক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫, শ্রী প্রেস, কাঁথি, মেদিনীপুর

রামেন্দ্র চৌধুরী: রামায়ণের নারীগণ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, মৌমিতা প্রিন্টার্স, ২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত, ২০১৩, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

ড. রামেশ্বর শ': সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য, সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ৯ই ফাল্গুন, ১৪১১ বঙ্গাব্দ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত): কৃত্তিবাস রামায়ণ, প্রকাশক, দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা.লি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, পৌষ, ১৪১২, ডিসেম্বর ২০০৫

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত, ২০১৩, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা: রামায়ণচর্চা, নতুন আঙ্গিক ও দৃষ্টি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা- ৯

লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা: রামায়ণিকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯

শশিভূষণ দাশগুপ্ত: ত্রয়ী–বাল্মীকি কালিদাস রবীন্দ্রনাথ, সুপ্রীম পাবলিশার্স (প্রথম সুপ্রীম সংস্করণ), ১লা বৈশাখ, ১৩৯৬, কলিকাতা-৭৩

শিপ্রা দত্ত: চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত, প্রথম প্রকাশ ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩, প্রকাশক, শ্রীগোপাল দাস মজুমদার, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা- ৬

শ্রীশচন্দ্র দাশ: সাহিত্য সন্দর্শন, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৩, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড কোং, কলিকাতা

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা: মহাভারতে অনুশীলনতত্ত্ব, প্রথম সংস্করণ-১৩২৪, প্রকাশক, শ্রীশকুমার কুণ্ডু, বিদ্যাবিনোদ, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-২৯

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী: পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৬

শ্রীসুকুমার সেন: রামকথার প্রাক্-ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ১৪ এপ্রিল ১৯৭৭, প্রকাশক, শ্রী শ্রীকুমার কুণ্ডু, জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা- ২৯

সুকুমারী ভট্টাচার্য: প্রবন্ধসংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২, প্রকাশক, অণিমা ভট্টাচার্য, গাঙচিল, মাটির বাড়ি,ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা-১১

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য: রামায়ণের চরিতাবলী, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, আনন্দ পাবলিসার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-১৪

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ: সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৪

সুধাময় দাস: ইতিহাসের আলোকে রামায়ণ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, দিব্যপ্রকাশ,৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা

সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী (সম্পাদিত): রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত চর্চা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৯, প্রকাশক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬এ বি.টি রোড, কলকাতা- ৫০

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: হোমারের ওডিসি, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, প্রকাশক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ড. স্বস্তিকা দত্ত: রামায়ণ সমীক্ষা, প্রকাশকাল–নভেম্বর, ১৯৭৯, প্রকাশক, শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত, ১১, ধনদেবী খান্না রোড, কলিকাতা–৫৪

শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (অনূদিত ও সম্পাদিত): মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস- মহাভারতম্, দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৪০০ বঙ্গাব্দ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

হাসান হাফিজুর রহমান (অনূদিত): হোমার,ওডেসী, প্রথম সংস্করণ, পৌষ ১৪২১, জানুয়ারি ২০১৫, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত): কৃত্তিবাস রামায়ণ, প্রকাশক, দেবজ্যোতি দত্ত, পঞ্চম মুদ্রণ, পৌষ ১৪১২, ডিসেম্বর ২০০৫, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা- ৯

A B Keith: A History of Sanskrit Literature, Motilal Banarsidass First Indian Edition, Delhi, 1993, Reprint, Delhi, 2001

AA.Macdonell: A History of Sanskrit Literature, First Edition, London, 1900, Reprinted, Delhi, 1997

Asit K. Banerjee (Editor): The Ramayana in Eastern India, First Edition , November,1983, Published by Asoke Ray, Prajna, 77/1, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.

Kumudranjan Ray (ed): Kalidasa's Meghaduta, 6th ed., Calcutta 1968

Maurice Winternitz: A History of Indian Literature, First Edition, Delhi,1981, Reprinted: Delhi, 2003

S.N. Dasgupta and SK Dey: A History of Sanskrit Literature, classical period ,Vol.1, University of Calcutta, 1962

Suniti Kumar Chatterji: The Ramayana - Its character, Genesis, History Expansion and Exodus A Resume, First Edition , 29 May 1978, Published by Asoke Ray, prajna, 77/1 M.G Road, Calcutta-9

অভিধান

শ্রী অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায়: সংস্কৃত বাংলা অভিধান, সদেশ/ শ্রী বলরাম প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪১৮, কোলকাতা

আশুতোষ দেব: শব্দবোধ অভিধান (শব্দাভিধান ও সাইক্লোপিডিয়া), পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮, দেব সাহিত্যকুটীর প্রা. লি., কলিকাতা

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত): বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (১ম ভাগ), সাহিত্যসংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত), ১৯৯১, কলিকাতা; ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলক): সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্যসংসদ, চতুর্থ সংস্করণ (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত), ১৯৯৩, কলিকাতা

সুধীরচন্দ্র সরকার: পৌরাণিক অভিধান, পঞ্চম সংস্করণ: ফাল্গুন, ১৩৯২, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি:, ১০ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

সুবলচন্দ্র মিত্র: সরল বাঙালা অভিধান, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৮৪, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেট, কলিকাতা

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ (২ খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৮, নতুন দিল্লী

Govindagopal Mukhopadhyaya and Gopikamohan Bhattacharya (Compiled): A tri-Lingual Dictionary, Calcutta Sanskrit College Research Series, No. XLVII, Sanskrit College, Calcutta,1966

Sir Monier-Monier Williams: A Sanskrit-English Dictionary,New edition, Greatly enlarged and improved, Motilal Banarsidass, Delhi, First published, Oxford University Press,1899, Corrected ed., 2002

Sailendra Biswas (and others compiled): Samsad Bengali-English Dictionary, Third Edition, Eighth Impression, August, 2005, Sahitya Samsad, Kolkata

Zillur Rahman Siddiqi (Editor): Bangla Academy English-Bengali Dictionary, First Edition, August, 1993, 31st Reprint, January, 2008, Bangla Academy, Dhaka